কতরূপ

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী

B·P

ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর, ১৯৬৪
অগ্রহায়ণ, ১৩৭১

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী মঞ্জু দাশ
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
দেবরঞ্জন চক্রবর্তী

মুদ্রণ :
প্রশান্ত কুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

উৎসর্গ

একদা বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের প্রয়াত দুই প্রাণপুরুষ আমার অগ্রজদ্বয়
গোপালচন্দ্র আর অধ্যাপক মাখনলালের শ্রীচরণেষু—

—গ্রন্থকার

ভূমিকা

"দৈনিক আকর্ষণ" পত্রিকার সাপ্তাহিক সাময়িকীতে এই উপন্যাস দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়, সামান্য হলেও—সংস্কার করা হয়েছে।

এই উপন্যাস রচনায় আমি কিছু কিছু গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। তার মধ্যে প্রধান, শ্রদ্ধেয় শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস"। তা ছাড়াও পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত "বাংলায় ভ্রমণ" আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীসীতেশ সান্যাল তার কৈশোরে মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ এই গ্রন্থখানি পুরস্কার লাভ করেছিল। কিন্তু আমি কোন যোগ্যতার পরিচয় না দিয়েই সেই গ্রন্থ তার কাছ থেকে লাভ করলাম। তারজন্য ধন্যবাদ জানালে প্রতিদানে মিলবে অনুযোগ। তাই তার জন্য কল্যাণ কামনা করি।

পত্রিকায় প্রকাশ কালে একটি প্রশ্ন নিয়ে কিছু চিঠিপত্র পেয়েছি। গ্রন্থপাঠ সময়েও পাঠকের মনে সে প্রশ্ন উদয় হতে পারে। তাই বলে রাখি যে, আমি আরও একখানি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সে গ্রন্থখানিতে শ্রী তারা কুমার মুখোপাধ্যায় রচিত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের সর্বজন-শ্রদ্ধেয় প্রয়াত এক মহান শিল্পী তথা নাট্যাচার্যের জীবনদর্শনের কিছু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। নামোল্লেখ না করে আমি বলি যে, সেই নাট্যাচার্য আমার কাছেও পরম শ্রদ্ধার পাত্র। তারা কুমারবাবুর গ্রন্থানুসারে আমি সেই নাট্যাচার্যের জীবনদর্শনের ছায়া অবলম্বন করে এই উপন্যাসে একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছি। সে চরিত্র অংকনে আমার অজ্ঞাতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি ঘটে থাকলে, আমি মার্জনা ভিক্ষা করি। তাছাড়া উপন্যাসের সকল চরিত্রই কল্পনাপ্রসূত। তা সত্ত্বেও কোন চরিত্রে কিছু সাদৃশ্য থাকলে, তা নিতান্তই কাকতালীয় বা আকস্মিক।

"ভোলানাথ প্রকাশনী" এর আগেও আমার দু'-একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। তখন তাঁদের কর্তব্যে যে নিষ্ঠা দেখেছি, তা এখনও বর্তমান দেখে আমি এই প্রতিষ্ঠানকে আমার অভিনন্দন আর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

সকলের সকল চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ কিছুতেই রোধ করা গেল না। সহৃদয় পাঠকদের কাছে আমাদের মত অকিঞ্চিৎকর লেখকদের আবেদন নিবেদনের অন্ত নেই। সেই সঙ্গে অসহায়ের মত মুদ্রণ-প্রমাদের জন্যও ক্ষমাভিক্ষা থাকল। ইতি—

বিনয়াবনত

মনোরঞ্জন চক্রবর্তী

কতরূপ

চাকরি প্রিয়নাথের পেশা। মুখে অন্ন তুলে দেয়। আর অভিনয় তার নেশা। মাতাল করে দেয়। কোন এক কবি কোন এক প্রেমকে বোঝাতে গিয়ে বলেছিলেন—নিকষিত হেম। আরও বলেছিলেন—কামগন্ধ নাহি তাহে। প্রিয়নাথের থিয়েটারের নেশাকে বোঝাতে গেলেও বলতে হয়, তা ছিল মাদকতার গন্ধ-বিহীন। সেই মাদক-দ্রব্য বর্জিত নেশায় আচ্ছন্ন চোখ দুটি মেলে প্রিয়নাথ একদিন চারুকে দেখেছিল। চারু, চারুশীলা। অভিনয় তার পেশা। চুক্তিমত অর্থের বিনিময়ে মুখে চুনকালি মাখে, রাণী হয়, বেগম হয়, ভিখেরি হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকে, হাসে, কাঁদে, কত রঙ্গরসের কথা কয়। তার কত রূপ। আরও কী করে না-করে তা জানে সে নিজে, আর তার প্রিয়জনেরা। তা সেই চারুকে দেখে প্রিয়নাথ আর চোখ ফেরাতে পারে না। পুরুষদের অমন চোখ মেলে তাকিয়ে থাকা চারু জীবনে অনেক দেখেছে। ওতে আর তার কিছু চিত্ত-বিকার হয় না। তবে মনে মনে একটু প্রসন্ন হয়ে ওঠে। ভাবে, তার রূপ আর যৌবনের জয়-জয়কার। তা রূপ আর যৌবন চারুর ছিল বৈকি আর নারীর রূপ-যৌবনের প্রতি প্রিয়নাথের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই—এমন কথা নয়। কিন্তু সেদিন সে চারুর সে সব উপচার দেখে প্রভাবিত হয় নি। তার সখের অভিনয় জীবনে অমন অনেক রূপবতী আর যৌবনবতী সে দেখেছে। এক আধ দিন নয়। যেদিন থেকে সখের থিয়েটার ক্লাবে অভিনয়ের জন্য এক শ্রেণীর পেশাদার অভিনেত্রী তৈরী হল, সেইদিন থেকে। প্রিয়নাথের বন্ধুস্থানীয় সহকর্মীদের মধ্যে দু-একজন এই অভিনেত্রী সংগ্রহের ব্যাপারে আশাতিরিক্ত উৎসাহী ছিল। অভিনয়ের প্রতি হয়ত তাদের বিন্দুমাত্র আনুগত্য নেই। তবুও সম্ভব-অসম্ভব নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে তারা ভালমন্দ

অভিনেত্রী সংগ্রহ করে নিয়ে আসত। এই ভাবেই একদিন চারুশীলা "লালবাঈ" নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সংগৃহীত হয়ে এসেছিল। আর তাকে দেখেই প্রিয়নাথ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। আর সেই তাকিয়ে থাকা দেখে চারুর চোখের কোণে আর ঠোঁটে বিদ্যুৎ খেলেছিল। ভেবেছিল, ক্ষেত্রটি উর্বর। চেষ্টা করলে সুফলের আশা আছে। দীর্ঘদিনের নটী-জীবনে চুক্তিমত অর্থ আঁচলে বেঁধে বেঁধে রাতের পরে রাত মুখে অনেক চুনকালি মেখেছে। পেশাগত চুক্তিতে আর মন ভরতে চায় না। চুক্তির অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশায় তারা সকলের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দৃষ্টি পরীক্ষা করে। প্রিয়নাথকেও পরীক্ষা করেছিল। চারু প্রিয়কে সেই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র বলে বুঝে নিল আর প্রিয়র কাছেও চারু বিচিত্র ইতিহাসের অবগুণ্ঠনে মুখখানা ঢেকে রহস্য হয়ে উঠল। এইভাবে প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ের মধ্যে উভয়ের অজ্ঞাতে কোন এক বিশ্বকর্মা অলক্ষ্যে সেতু রচনা করে রাখল।

এযে অবিকল প্রিয়নাথের সেই অম্বিকাদার বৌ-এর চেহারা। গড়পার রোডের মেসের সেই অম্বিকাদা। তিনি প্রতি শনিবারে দেশে যেতেন আর সোমবার ফিরে আসতেন হাঁড়ি ভর্তি করে চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের সন্দেশ আর নারকেল নাড়ু নিয়ে। প্রিয়নাথরা সেইসব আনন্দ করে খেতে খেতে বলত: কেন বৌদিকে রোজ রোজ এত কষ্ট দেওয়া? অম্বিকাদার মুখখানা হাসিতে ভরে উঠত। বলতেন: কষ্ট করে কেউ যদি আনন্দ পায়, তবে তোদের এত মাথাব্যথা কেন? বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা কারও ছিল না। তবুও জানা নেই শোনা নেই, কোন এক না-দেখা মমতাময়ী বৌদির প্রতি প্রিয়নাথের মনটা কী একটা কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে। একটু দেখতেও সাধ হয়। কিন্তু বাঁকুড়া জেলায় কোন এক গাঁয়ে অম্বিকাদার বাড়ি। দেখা হবার আশা দুরাশা মাত্র। তবুও এক ছুটির দিনে আকস্মিক ভাবেই প্রিয়নাথ বাঁকুড়া জেলার সেই গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

অন্য কাজে কাছাকাছি গিয়েছিল। খোঁজ করে অম্বিকার সন্ধান পেয়েছিল। তাকে একেবারে অবাক করে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারে নি। অম্বিকাদা অবাক হয়েছিলেন নিশ্চয়ই। তার চেয়ে বিরক্ত হয়েছিলেন বেশী। অমন যে অমায়িক অম্বিকাদা, তাঁর চোখে মুখে এতখানি বিরক্তি ফুটে উঠতে পারে—তা প্রিয়নাথের ধারণা ছিল না। অম্বিকাদা আপ্যায়নের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে প্রিয়নাথকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে রেখে বলেছিলেন : তোদের আক্কেল বলতে কোন জিনিষ নেই। এই যে বলা নেই কওয়া নেই, এসে হাজির হলি, এখন তোকে নিয়ে আমি কী করি ? কোথায় বসাই, কী খাওয়াই ?

প্রিয়নাথ স্তম্ভিত। কলকাতার মেসে বসে তারা বৌদির স্নেহ ভালবাসার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হয়েছে। অম্বিকাদার চেয়েও সে বৌদির মমতা-মাখা মুখ খানাই বেশী কল্পনা করেছিল। কিন্তু এই বিচিত্র পরিস্থিতি। বৌদি এখানে নেই বলেই হয়ত অম্বিকাদা এতখানি বিব্রত হয়েছেন। তাঁর দোষ নেই। বৌদির কথা জিজ্ঞাসা করতেও অন্তরে সহস্র দ্বিধা। অম্বিকাদাও সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করে বলেছিলেন : ভেতরে গিয়ে বোস। তা প্রিয়নাথ ঘরের মধ্যে গিয়ে বসেছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ বসেনি। উঠে পড়েছিল। সেই নামমাত্র অবসরে প্রিয়নাথ দেওয়ালে টাঙ্গান একটি ফটো দেখেছিল। ফটোটি মাকড়সার জালে একেবারে আচ্ছন্ন। তবুও বোঝা যায়—স্ত্রীর সঙ্গে অম্বিকাদার ফটো। বৌদির প্রাত মমত্ববোধের জন্য কিনা কে জানে, ফটোটি ভালভাবে লক্ষ্য করেছিল।. দুইজনের বয়সের ব্যবধানটি বেশ নজরে পড়ে। অম্বিকাদা বৃদ্ধ না হলেও প্রৌঢ়তো বটেই। কিন্তু ফটোখানা দেখলেই—"বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার" কথা মনে করিয়ে দেয়। এই চারুর একেবারে সেই ফটোর মধ্যে দেখা অম্বিকার স্ত্রীর মত চেহারা। অম্বিকাদার স্ত্রীর নাম কী, তা প্রিয় জানে না। তা দুজনের চেহারা মোটামুটি একরকম—এমন ত

দেখা যায়। অথবা দুই বোন—তাও হতে পারে। একেবারে যমজ বোন। এত সব চিন্তা প্রিয়নাথের মনে। কিন্তু চারু তার বিন্দু বিসর্গও জানে না। সে তার রূপ-যৌবনের মদিরা-পাত্র হাতে নিয়ে কটাক্ষপাত করতে লাগল। সেই গরবিনী চারুশীলা যে প্রিয়নাথকে এমন পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলবে তা কেউ ভাবতে পারে নি।

* * *

লাভ-লোকসানের কারবারে চারুশীলার একমাত্র মূলধন প্রিয়নাথের প্রথম সাক্ষাতে সেই পলকহীন দৃষ্টি। তাই সম্বল করে রঘুনাথ আর লালবাঈ চরিত্রে প্রিয় আর চারুকে নায়ক-নায়িকা করে লালবাঈ নাটকের প্রস্তুতি এগিয়ে যেতে লাগল। মানুষ নিজের বুদ্ধির পরিমাণ-যন্ত্রে অন্যের ওপরে প্রভাব-প্রতিপত্তি পরিমাপ করে। চারুও তাই করেছিল। সে প্রিয়নাথের কাছে একটি প্রস্তাব করে বসল। এত সামান্য পরিচয়ের মধ্যেই এমন অদ্ভুত প্রস্তাবে প্রিয় হতবাক হয়ে চারুর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। যে রহস্য নিয়ে সে কেবলই ভাবনা চিন্তা করে চলেছে, চারু সেই দিকেই এগিয়ে যেতে চায়। সে প্রস্তাবের স্থানকাল সবই বিচিত্র।

রিহার্সালের কাজকর্ম সেরে প্রিয় যখন নির্জন-প্রায় গলি-পথ দিয়ে ট্রাম রাস্তার দিকে এগিয়ে চলেছে, রাত তখন প্রায় দশটা। হঠাৎ পেছন থেকে পরিচিত নারীকণ্ঠে ডাক শুনতে পেল, "প্রিয়দা"। প্রায়ান্ধকার গলিপথে একটু অপেক্ষা করতেই চারু পাশে এসে দাঁড়াল। তার গালভর্তি পান আর হাতেও একটি। হাতের পানটি প্রিয়র দিকে এগিয়ে দিয়ে মাথা নেড়ে গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাল। নিজের মুখে পানের সঙ্গে বোধহয় সুগন্ধি দোক্তা ছিল। তাই মূল্যবান পানের রস অপচয় না করতে পেরে মাথা নেড়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। প্রিয় মৃদু হেসে বলল: আমি পান খাই না।

যত অমৃততুল্যই হোক, তাম্বুলরস আর মুখে ধরে রাখা সম্ভব হোল না। অতি নিষ্ঠুরের মত রাস্তার একপাশে সেই অমূল্য পদার্থ

নিক্ষেপ করে সে বলল : পান খান না? খুব ভাল। উপসর্গ যত কম থাকে তাই ভাল। প্রিয় বলল : ভালমন্দ বিচার করে কিছু করিনি। অভ্যেস নেই, এইমাত্র।

চারু বলল : তা ঠিক। সংসারে চলতে গেলে অত ভালমন্দ বিচার করে পা ফেলা চলে না।

: সে কথা যাক। আপনি কি এই পান খাবার জন্যেই ডেকেছিলেন ?

: পানের দোকান খুলে এত রাতে আমি ডাকাডাকি করব—একথা আপনি বিশ্বাস করেন ?

: অবিশ্বাস্য ঘটনাও সংসারে ঘটে।

: তা ঘটে! কিন্তু সামান্য কথার জন্য আমি আপনাকে ডাকাডাকি করিনি।

: তাহলে সেই অসামান্য কথাটি বলুন।

: কথাটি অসামান্যই বটে। এর আগেও আমি লালবাঈ চরিত্রে এক আধবার অভিনয় করেছি। তাই করে, বিষ্ণুপুর দেখবার একটা খুব কৌতূহল হয়েছে। তাই ভাবছিলাম—আপনি যদি দেখান।

সামান্য পরিচয়েই বিচিত্র অনুরোধ। এর মধ্যে নানা সমস্যা জড়িত আছে। কিন্তু চারু সেই লোক-বিরল গলির মধ্যে ম্লান আলোতে এমন একটা মোহময় দৃষ্টি প্রিয়র দিকে তুলে ধরল যে, তার হঠাৎ সেই বাঁকুড়া জেলার কোন এক পল্লীতে অম্বিকাদার পাশে বসা ভদ্র-মহিলার মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেওতো বিষ্ণুপুরেরই কাছাকাছি একটি গ্রাম। তবে কি স্বামীর ভিটে দেখবার সাধ তাকে ব্যাকুল করে তুলেছে? যদি তাই হয়, তবে তাকে নিয়ে টানাটানি কেন? চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের সন্দেশ আর নারকেল নাড়ু খাবার ঋণ কি এইভাবে শোধ করতে হবে? প্রিয়নাথ ভাবে, যতকিছু বিচিত্র ব্যাপার সব তার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। হাঁড়ি ভর্তি মিষ্টান্ন অনেকেই খেয়েছে। কিন্তু ঋণশোধের বেলায়

প্রিয়নাথ। থিয়েটারের নটী নিয়ে বেড়াতে গেলে, তার মধ্যে সদিচ্ছা যদিবা থাকে, লোক-চক্ষুর কিছুমাত্র সমর্থন থাকবে না। জানাজানি হলে, এই নিয়ে কানাকানি হাসাহাসির শেষ থাকবে না। এতসব প্রতিকূল সম্ভাবনা থাকলেও প্রস্তাবটির মধ্যে কেমন যেন একটা মাদকতা আছে। তাই প্রিয় একেবারে ঝেড়ে ফেলতে পারল না। সে বলল : আমি ভেবে দেখব।

সেদিন সেখানেই ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। তার আগে প্রিয়নাথের দৃষ্টি আবার সেই চারুশীলার হাতে ধরে-থাকা পানটির দিকে পড়েছিল। সামান্য একটা পানের প্রতি তার যেন একটু মমতা হোল। ভাবল—সেই মেস-জীবনে সোমবারে সোমবারে অম্বিকাদার দেশ থেকে নিয়ে আসা চন্দ্রপুলি আর ক্ষীরের সন্দেশের পরে এদিনের তাম্বুল-বিলাসের যদি কিছু যোগ থাকে, তবে প্রিয়ও বলবে না—"ধরিত্রি, তুমি দ্বিধা হও।" তারপর প্রিয়নাথ নিজের অজ্ঞাতে বলে ফেলেছিল : তা দাও, পানটা দাও। পানত আর বিষ নয়।

চারু তাড়াতাড়ি পানটা এগিয়ে দিয়েছিল। তার মুখে কী কথা ফুটে উঠেছিল তা আর প্রিয়নাথ তাকিয়ে দেখেনি। পানটি মুখে পুরে চুনসুদ্ধ বোঁটাটি হাতে নিয়ে হন্ হন্ করে হেঁটে সোজা ট্রাম-রাস্তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। সে আজ অনেকদিন আগেকার কথা।

প্রিয় প্রথম ধাক্কা খেয়েছিল, পাসবাবু সদাশিবনের কাছে। সে বলেছিল—ভেবে দেখব। চারুশীলাকে নিয়ে বিষ্ণুপুরে যাবে কিনা—সে কথা ভেবে দেখবে। তা সে ভেবেছিল। অনেক ভেবেছিল। ভাল-মন্দ অনেক চিন্তা করেছিল। শেষ পর্যন্ত একখানা বিষ্ণুপুরের পাস নিয়েছিল। সেই পাসখানা এগিয়ে দিয়ে পাসবাবু সদাশিবন বলেছিল : আমরা কেন ডিপ্রাইভড্ হলাম দাদা?

বিস্মিত হয়ে প্রিয়নাথ সদাশিবনের মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

সদাশিবন বলেছিল: এত দিনত আপনার জন্য শুধু সেলফ্ পাস লিখেছি। এবার দেখছি ডবল। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না, শুভ কাজটা এর মধ্যে হয়ে গেছে। তাই বলছি—আমাদের ভোজটা মারা গেল।

একটি শিশু কোন অন্যায় কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে তার যেমন মুখের চেহারা হয়, প্রিয়নাথের মুখখানা সেইরকম হয়ে গেল। তার এই বিষ্ণুপুর যাত্রার কথা সে যথাসম্ভব গোপন রেখেছিল। পাসের রন্ধ্রপথে সেই গোপন কথা বেরিয়ে পড়বে—একথা সে ধারণা করতে পারেনি। তবুও মন্দের ভাল, এই পাসবাবু অন্য কেউ না হয়ে সদাশিবন। দক্ষিণ ভারতীয় ছোকরা। বড় সুন্দর অমায়িক ব্যবহার। অনেকদিন কলকাতায় থেকে বাঙ্গালীর আচার-আচরণ বেশ শিখে নিয়েছে। প্রিয়নাথের প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধাও আছে। সেই দাবীতে প্রিয়নাথ প্রথমে অপরাধ-বোধটা মন থেকে দূর করতে চেষ্টা করল। কিন্তু চেষ্টা করা এক কথা, সক্ষম হওয়া ভিন্ন কথা। তাই সকল চেষ্টা সত্ত্বেও জড়িত কণ্ঠে বলল: সকলের সকল পাওনা গণ্ডা যথা সময়ে মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করব। কিন্তু সেই যথাসময় পর্যন্ত একটু ধৈর্য ধরতে হবে, ভাই। সদাশিবন তার আঞ্চলিক রীতি অনুসারে কোন কথা সমর্থন করলেও ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে। আবার প্রত্যাখ্যান করলেও সেই একই অঙ্গভঙ্গী। মুখের অন্যান্য ভাব-প্রকাশ ভালভাবে লক্ষ্য করে তার মনের কথা বুঝে নিতে হয়। এক্ষেত্রে সদাশিবন ডাইনে-বাঁয়ে দেওয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত এত দ্রুত অঙ্গ-সঞ্চালন করতে থাকল, যা দেখে প্রিয়নাথ বুঝতে পারল—সে যথাসময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী আছে। মৃদু হেসে প্রিয় বলেছিল: পাঁচ-কান করে আমাকে বিব্রত কোর না। পুনরায় গা-নাড়া দিয়ে সদাশিবন বলেছিল: কাউকে না জানিয়ে আমি সেদিনের অপেক্ষায় থাকলাম।

* * *

হাওড়া ষ্টেশনে গাড়ির কামরায় উঠে চারুশীলার দুই চোখ কপালে উঠেছিল। ক'দিনের মেলামেশায় এটা বুঝে নিয়েছিল যে তার জন্য প্রিয়নাথের পক্ষে কিছু একটা করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সে-করা যে এতখানি হবে, তা সে ধারণা করতে পারেনি। সে বড় বড় চোখ দুটি বিস্ফারিত করে জিজ্ঞাসা করল: আমার জন্যও ফার্ষ্ট'ক্লাস টিকিট করেছেন নাকি?

: তবে কি ভিন্ন-ভিন্ন লোকের জন্য ভিন্ন-ভিন্ন টিকিট করব নাকি?

: আমার ভারি বিশ্রী লাগছে। আপনার এতগুলো পয়সা নষ্ট করলাম।

: নষ্ট মনে করলে নষ্ট, আর ইষ্ট মনে করলে ইষ্ট।

: আমি আপনাকে বিষ্ণুপুর দেখাতে বলেছিলাম। তা যেমন তেমনভাবে গিয়ে পৌঁছালেই হোত।

: তা পায়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গেলেও কোন ক্ষতি ছিল না —এই কথা বলতে চান?

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে চারুশীলার মুখখানা যেন বিরস হয়ে উঠল। ফার্ষ্ট'ক্লাসের আবেশময় তন্ময়তায় যেন ছেদ পড়ল। সেই প্রায়ান্ধকার গলিপথে পানটা গ্রহণ করে প্রিয়নাথ বলেছিল, "তা দাও, পানটা দাও। পানও আর বিষ নয়।" তা ছিল "তুমি" সম্বোধন। তার পরে এই প্রথম সম্ভাষণ, "...এই কথা বলতে চান?" এবার পুনরায় "আপনি"। তা কথায় একটু ইতর-বিশেষ আঘাত করলেও তা নিয়ে গাছকোমড় বেঁধে ঝগড়া করা চলে না। সে উদ্দীপনা যদি নষ্ট হয়ে থাকে, তবে কথা ফুরিয়ে যাবে। চুপ করে থাকবে। তাই সে একটু চুপ করেই থাকল।

প্রিয়নাথ বলল: আপনি নিশ্চিন্ত হোন, আমার টাকা লাগেনি। আমরা রেলের চাকরি করি। রেলগাড়ি চড়তে আমাদের পয়সা লাগে না।

ঃ আপনার না হয় লাগে না। কিন্তু আমিতো রেলের চাকরি করি না।

একটু বিভ্রান্ত হয়ে প্রিয়নাথ মৃদুস্বরে বলল: আপনারও লাগবে না।

চারুর চোখে মুখে একটু কৌতুকের ভাব ফুটে উঠল। প্রিয়র মুখের দিকে তাকিয়ে কী একটু পরীক্ষা করে নিয়ে বলল: আমার এই হাতের শাঁখা আর সিঁথির সিঁদুর বুঝি আপনার সঙ্গে বিনি-পয়সায় রেল ভ্রমণের ছাড় পত্র?

প্রিয়নাথ চারুর মুখের দিকে চোখ দুটি তুলে বলল: হাতের শাঁখা আর সিঁথির সিঁদুরের অলৌকিক শক্তির কথা সংসারে কে আর না জানে?

ঃ সেই অলৌকিক শক্তির কথা মনে করে গাড়ির মধ্যে লোকের সামনে "ওগো-হ্যাগা" বলতে হবে নাকি?

ঃ শাঁখা-সিঁদুর বুঝি দিনরাত শুধু তোতাপাখির মত 'ওগো-হ্যাগা' বলায়?

চারু হেসে ফেলে বলল: তা অমন অলৌকিক শক্তি থাকলে তার একটা প্রকাশ থাকবে না? কিন্তু আমি ভাবছি—আপনাদের নাটকের ঐ বিষ্ণুপুরের প্রধানা মহিষী শাঁখা সিঁদুরের অলৌকিক শক্তিতে কী পেয়েছিলেন?

ঃ স্বামীর চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হবার শক্তি পেয়েছিলেন।

ঃ স্ত্রীলোকের পক্ষে আগুনে পুড়ে মরতে পারার চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু নেই? রামমোহন রায় কী কুক্ষণে সতীদাহ বন্ধ করেছিলেন! বেচারিরা একটু আগুনে পুড়ে মরবে—সে সাধটুকুও পূর্ণ হবার নয়!

প্রিয়নাথ ভাবতে লাগল—চারুর অন্তরে বুঝি কিছু একটা দগ্ধ ক্ষত রয়েছে। আলোচনাটা অপ্রিয় পথে পা বাড়াল দেখে সে চুপ করে গেল।

নির্বাক হয়ে চারুর হাতের শাঁখার দিকে তাকিয়ে থাকল। কী ভাবছিল কে জানে। চারু ম্লান হেসে বলল: আপনি হয়ত ভাবছেন, আমি এই শাখা পরে আছি কেন? এ কিন্তু নেহাৎ বড়কর্তার সখ।

প্রিয় বুঝতে পারল—বড়কর্তা হলেন, নাট্যাচার্য দিলীপকুমার। চারু দিলীপকুমারের স্নেহধন্যা, তা সে জানে। সংসারে নানা বিচিত্র সখের কথা শোনা যায়। সখ করে কোন নারীকে বসনে ভূষণে আভরণে সাজানও সম্ভব হতে পারে। কিন্তু নাট্যাচার্য চারুকে কেন গৃহলক্ষ্মীর সাজে সাজিয়েছিলেন, তা এক রহস্য। তা সাজুক। চারুশীলা হাতে শাঁখা আর সিঁথিতে সিঁদুর পরে গৃহবধূর সাজে ঘুর ঘুর করে যদি দিলীপকুমারকে আনন্দ দিতে পারে তবে প্রিয়নাথের নিরানন্দ কিছু নেই। সে চির-এয়োস্ত্রী হয়ে থাকুক। তার বিন্দু মাসীমার মত। বিন্দুমাসীমা যখন যুবতী ছিলেন তখন তার মেসো হঠাৎ নিরুদ্দেশ হলেন। দীর্ঘদিন কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। একটি ছেলে আর একটি মেয়ে নিয়ে বিন্দুমাসীমার শাঁখা-সিঁদুর বজায় থাকল। দীর্ঘদিন পরে কথা উঠল, বার বছরের মধ্যে নিরুদ্দিষ্ট লোকের সন্ধান না পাওয়া গেলে, তাকে মৃত বলে ধরে নিতে হয় এবং পারলৌকিক কার্যাদি করতে হয়। স্বামীর অভাবে বিন্দু-মাসীমা ততদিনে ততটা কাতর হন নি। কিন্তু শাঁখা সিঁদুরে হাত পড়ার আশংকা দেখা দেওয়ায় তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন। একদিন সুপ্রভাতে তিন ছেলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। পাড়ার নয়নচাঁদকেও সঙ্গে নিলেন। তিনমাস পরে বিন্দুমাসীমা হাসিহাসি মুখে ফিরে এলেন। তিনি জানালেন—বদ্রিনারায়ণের পথে এক গিরিকন্দরে তিনি তার স্বামীর দর্শন পেয়েছেন। নয়নচাঁদ দুই চোখ বড় বড় করে সাক্ষী দিল: তেনার কি রূপ, কি বরন—চিনতে কি আর পারি? মাথায় জটা, মুখে লম্বা দাড়ি। পাহাড়ের গর্তের মধ্যে একেবারে ধ্যানে বসে আছেন।

অচৈতন্য অবস্থা। নাকটি দেখে আমার সন্দেহ হোল। অচৈতন্য সাধুর দাড়িটা সরাতেই চিবুকে সেই কাটা দাগটি বেরিয়ে পড়ল। তারপর ধ্যান ভাঙ্গতে তেনার কি ক্রোধ। চিমটে তুলে মারেন আর কি। আমি ত ভয়ে ছেলেটা আর মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম। ঠাকরুণ পা-দুটি জড়িয়ে পড়ে থাকলেন।

এইভাবে বিন্দুমাসীমা চির এয়োস্ত্রীর ছাড়পত্র সংগ্রহ করে ফিরে এসেছিলেন। তিনি শূন্য হাতে আসেন নি। ফিরে আসার পরে যথাসময়ে ছোট ছেলেটি ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। তা সেই রক্তের মর্যাদা রক্ষার জন্য কি না কে জানে, সেই ছোট ছেলেটিও একদিন অন্তর্ধান করেছিল। কিন্তু তাকে গিরিকন্দরে খুঁজে বেড়াতে হয়নি। দীর্ঘদিন পরে সে নতুন পরিচয়ে হাজির হয়েছিল। সে সব ইতিহাস অনেক পরের কথা।

বদ্রিনারায়ণের পথে গিরিকন্দরে প্রিয়নাথের মেসোর আর কোন সন্ধান করা হয় নি।

সাধু-সন্ন্যাসীদের পরমায়ুর কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। সুতরাং বিন্দুমাসীমা চির-এয়োস্ত্রী হয়ে থাকলেন। কারণ মেসোর তিরোধান-সংবাদ কোনও দিনই পাওয়া যায়নি। স্বামীর অভাবে মাসীর কিছু কিছু অসুবিধা হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু সুবিধাও কম হয় নি।

চারুর শাঁখা-সিঁদুর যদি নাট্যাচার্যের পরিতুষ্টির জন্যে হয়ে থাকে, তবে বিষ্ণুপুরের কাছে সেই গ্রামে অম্বিকাদার পাশে-বসা সেই মহিলা চারু নয়, অন্য কেউ। দুজনের চেহারার মিলটা হয়ত নিতান্তই আকস্মিক। কিন্তু চৌধুরীবাবু তবে কে? রোজ চারুকে সঙ্গে নিয়ে ভদ্রলোক আসে। 'ওগো-হ্যাগা' বলে ডাকাডাকি করে। তার সুবিধে-অসুবিধের দিকে নজর রাখে। ধৈর্য ধরে বসে থাকে। রিহার্সাল শেষ হলে, সঙ্গে করে নিয়ে যায়। সে যেন আনুগত্যের পরীক্ষা। যেদিন পান হাতে নিয়ে চারু রাত দশটায় অন্ধকার গলি-

পথে প্রিয়নাথের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল, সেই একদিনই শুধু ব্যতিক্রম। সেদিন চারুর সঙ্গে চৌধুরীবাবু ছিল না।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে গাড়ি ছেড়ে দিল। প্রিয় উঠে কামরার দরজাটা বন্ধ করতেই চারু বলল ঃ দরজা বন্ধ করে দিলেন ? আর কেউ আসবে না ?

প্রিয় বলল ঃ না, এ কামরাতে শুধু দুজনেরই জায়গা আছে।

চারু বোকার মত প্রিয়র মুখের দিকে তাকাতেই সে জিজ্ঞাসা করল ঃ শুধু দুজন থাকলে ভয় করবে নাকি ?

চারু বলল ঃ অবাক করলেন যা হোক। ভয় করতে যাবে কেন ? সে কথা নয়। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। বড়কর্তা একবার দলবল নিয়ে বাইরে থিয়েটার করতে যাচ্ছিলেন। অন্য সকলে সাধারণ গাড়িতে ছিল। আমি বড়কর্তার সঙ্গে ফাস্ট´ক্লাসে ছিলাম। কিন্তু সে গাড়িতে অন্য লোকজন ছিল।

প্রিয় হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল ঃ আমি এ রকম ব্যবস্থা কোনও ষড়যন্ত্র করে করিনি। এবার দেখছি কপালে এই কূপে জুটেছে।

ঃ বৌদিকে নিয়ে এমন গাড়িতে কখনও যাননি ?

ঃ যেতে পারলে সুখী হতাম। কিন্তু তেমন সৌভাগ্য হয়নি।

ঃ বৌদি শুনলে কী ভাববেন কে জানে ?

ঃ শুনলে ভেবে ভেবে কাতর হয়ে পড়বেন।

চারু ছোট একটা নিঃশ্বাস গোপন করে বলল ঃ কেবলই বাজে কথা বলছি। যার জন্য যাচ্ছি, সেই কথা বলুন।

চারুশীলা কীজন্য যাচ্ছে, তা জানে সে নিজে আর জানেন অন্তর্যামী। সে বলেছে বিষ্ণুপুর দেখতে যাচ্ছে। বিষ্ণুপুরে বিগত দিনেব ইতিহাস রয়েছে। বর্তমানে এই শহর বাঁকুড়া জেলার একটি মহকুমা। এক সময়ে প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের রাজধানী ছিল।

পরিহাস-প্রবণ চারুশীলা এই কথা শুনেই গম্ভীর হয়ে বলল ঃ এখানকার লোকেরা বুঝি খুব মল্লযুদ্ধ করত ?

ঃ আপনি পরিহাস করে বললেও কথাটি সত্যি। সে অনেক-দিনের কথা। সপ্তম শতাব্দীর কোন এক সময়। কোন এক ক্ষত্রিয় রাজার মহিষী বৃন্দাবন থেকে শ্রীক্ষেত্রে যাচ্ছিলেন। পথে একটি পুত্র প্রসব করে নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুত্রটি স্থানীয় কোন গৃহস্থ লালন-পালন করেন।

ঃ সে আবার কী কথা! একজন মহিষী বলে কথা। তাঁর মৃত্যু হোল। তাই বলে রাজপুত্রকে নিয়ে যাবার মত কেউ ছিল না?

ঃ আমি প্রচলিত কাহিনী বলতে পারি মাত্র। নিজে তো উপন্যাস বা মহাকাব্য রচনা করতে পারব না। তাছাড়া সেদিনের ইতিহাস জানতে হলে সেই প্রাচীন পরিস্থিতির মধ্যে বিচার করতে হবে।

ঃ আচ্ছা, তাই করব। আপনি বলুন।

ঃ সেই নবজাত শিশু ক্রমে গৃহস্থের বাড়িতে বড় হয়ে উঠতেই তার দেহে ক্ষত্রোচিত বলবীর্য্যের বিকাশ ঘটতে থাকে আর মল্ল-ক্রীড়ায় অপরাজেয় হয়ে ওঠে। এই বালকই উত্তরকালে আদিমল্ল বা রঘুনাথ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

চারু জিজ্ঞাসা করল: সেই রঘুনাথ চরিত্রেই আপনি অভিনয় করবেন?

ঃ না, আমি যে চরিত্রে অভিনয় করব, সে দ্বিতীয় রঘুনাথ। অনেক পরের কথা।

ঃ আপনি আগের কথাই বলুন।

ঃ সেই প্রথম রঘুনাথ অনেক সামন্ত রাজা আর সর্দারকে পরাজিত করে এক বিরাট রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজ্যই মল্লভূম নামে খ্যাত। সে ৬৯৫ খৃষ্টাব্দের কথা। প্রথমে রাজধানী ছিল প্রদ্যুম্নপুরে। তারপর ঐ রাজার ঊনবিংশ বংশধর জগৎমল্ল চতুর্দশ শতাব্দীতে রাজধানী বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। বর্তমান বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান আর সাঁওতাল পরগনার কিছু অংশ নিয়ে এই মল্লভূম রাজ্য ছিল।

: তা ঐ বিষ্ণুপুরে এসেই ত লালবাঈ-এর কাহিনী ?

একটু হেসে প্রিয় বলল : আপনি ঐ লালবাঈ-এর জন্য অস্থির হয়ে আছেন। শুধু আপনি কেন ? যাত্রা-থিয়েটারের কল্যাণে সত্যি হোক মিথ্যে হোক, লালবাঈ চরিত্র ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। তার চরিত্রে আপনি অভিনয় করছেন। তার কথাতো আপনি ভালই জানেন।

চারু বলল : হ্যাঁ, আমাদের আবার জানা ! পেটের ভাতের জন্য আমাদের রাণী সাজতে হয়, রত্ন সিংহাসনে বসতে হয়, মণি-মুক্তো নিয়ে ছড়াছড়ি করতে হয়। তবু পেটের ক্ষিদে পেটেই থাকে। তা আর দূর হয় না। আপনি বলুন।

চারু হঠাৎ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। অন্ধকার ভেদ করে লৌহদানব গর্জন করতে করতে এগিয়ে চলেছে। চাকাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে লোহার লাইনের সঙ্গে শব্দময় ঝংকার তুলে চলেছে। একটা ছন্দময় ঝংকার। কিন্তু ব্যতিক্রম আছে। লাইন পরিবর্তনের সময় সকল ছন্দ নষ্ট হয়ে কেমন যেন একটা ত্রাস সঞ্চার করে। নতুন লাইনে ঠিক মত চাকাগুলো এসে পড়লে, আবার সেই ছন্দ। ছেলেবেলায় রেলগাড়িতে যেতে যেতে শিশুমনের খেয়ালে এক-একটা নতুন নতুন কথা বলে-বলে চাকার ছন্দের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করত। মিলেও যেত। সেদিন সেই কথা মনে পড়তে তার হাসি পেল। ভাবল—তখন সহজে ছন্দ মিলে যেত। এখন বোধহয় তেমন আর মিলবে না। কে আর বসে বসে পরীক্ষা করে দেখছে, মিলবে কি মিলবে না।

একটু বিমনা হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়র দিকে তাকিয়ে দেখে, তার চোখ দুটিতে ঘুমের আবেশ। সে বলল : আপনার ঘুম পেয়েছে। শুয়ে পড়ুন। —এই কথা বলে সে বেঞ্চিটার একেবারে প্রান্তে সরে গেল।

প্রিয় বলল : প্রথমতঃ আমার ঘুম পায়নি। আর পেলেও

আমার তো ওপরে যায়গা রয়েছে। আপনাকে সরতে হবে কেন ?

: এত আরাম আমাদের সয় না। আমার এই বসে বসে জানালা দিয়ে অন্ধকারময় জগৎ সংসারের দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব ভাল লাগছে।

: গল্প শোনার চেয়েও ভাল ?

: এখন গল্প বলতে আপনার কষ্ট হবে।

: না-না কষ্ট কেন ?

: তাহলে আপনি শুয়ে শুয়ে বলুন।—বলে সে হাওয়া বালিশটা এগিয়ে দিল। প্রিয়নাথ বালিশটা টেনে কোলের ওপরে নিয়ে লালবাঈ-এর কাহিনী বলতে লাগল আর চারু ছেলেবেলার ব্রতকথা শোনার মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল।

বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ বরদার বিদ্রোহী রাজা শোভা সিংহকে যুদ্ধে পরাজিত করে অনেক সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে এসেছিলেন। সেই লুণ্ঠিত ঐশ্বর্যের সঙ্গে এসেছিল এক অসামান্যা রূপবতী আর যৌবনবতী নারী। তার নাচ গান রূপ যৌবনের মদিরা রাজাকে বিভ্রান্ত করেছিল। কিন্তু সেই রমণী ছিল যবন গৃহপালিতা এক ক্রীতদাসী। জাতিগত ব্যবধানের প্রাচীরকে উপেক্ষা করে বৈষ্ণবকুল-প্রধান রাজা রঘুনাথ সেই যবনীর রূপ-যৌবন আর সুর লহরীর কাছে আত্ম-বিক্রয় করেছিলেন। সেই নারীর গর্ভে রাজা রঘুনাথের পুত্রসন্তান হলো। ঐ যবনী নিজের প্রতিপত্তিকে সীমাহীন মনে করে নিজের সন্তানকে সিংহাসনের ভবিষ্যত উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণায় দাবী জানায়। অন্তরায় হোল ধর্ম। শুভাশুভ বিবেচনা-রহিত রাজার তখন ধর্মাধর্ম জ্ঞান লোপ পেয়েছে। তিনি বললেন—'তথাস্তু'। তাতেও সে নারী নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। সে প্রজাপুঞ্জের স্বীকৃতি দাবী করল। মোহাবিষ্ট নয়ন তুলে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন : প্রজাগণের স্বীকৃতির কী পরিচয় চাও ?

যবনী বলল : আমি নিজের হাতে প্রজাগণের মুখে অন্ন তুলে দেব ; আর তারা তাই তৃপ্তি ভরে খাবে। আবার রাজা বললেন—'তথাস্তু।' রাজ্যময় সেই কথা ঢোল সহরৎ যোগে প্রচারিত হোল। এইবার প্রধানা মহিষীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গল। মহিষীর নির্দেশে মহামাত্যর পরিচালনায় প্রজাবিদ্রোহ দেখা দিল। লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য আয়োজিত অন্ন তোলা রইল। বিদ্রোহী প্রজাগণ ঐ রমণীকে তার বড় সাধের প্রমোদতরণীতে তুলে শৃঙ্খলিত করে ফেলল। তারপর যে লালবাঁধের জলে সেই প্রমোদতরণী নিয়ে জলবিহার হোত সেই লালবাঁধের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে নৌকোর তলদেশে ছিদ্র করে দিল। প্রমোদতরণী আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে লাগল। লক্ষ লক্ষ নরনারী তীরে দাঁড়িয়ে দেখল—শৃঙ্খলিত দুখানা হাত শুধু ক্ষণেকের জন্য কী যেন ধরবার চেষ্টা করে অতলে তলিয়ে গেল। বিদ্রোহী প্রজাপুঞ্জ পৈশাচিক উল্লাসে চিৎকার করে যবনীর শিশু-পুত্রকেও জলে নিক্ষেপ করে দিল। সে লালবাঁধের অনন্ত জলরাশির নীচে শৃঙ্খলিত হাত দুখানার সন্ধান পেয়েছিল কিনা কে জানে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে চারুশীলা বলল : পরের কথাও আপনি আগেই বলেছেন। প্রধানা মহিষী রাজাকে হত্যা করলেন আর নিজেও স্বামীর চিতায় আগুনে পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গেলেন। দেশের লোক ধন্যি ধন্যি করেছিল নিশ্চয়ই ?

: মোটেই না। প্রধানা মহিষীর মরণোত্তর নাম হোল—"পতি-ঘাতিনী সতী।"

দু'জনেই বেশ কিছুক্ষণ চুপ করেছিল। গল্পের প্রভাব বোধহয়। হঠাৎ প্রিয়নাথ তাকিয়ে দেখে, চারুর দেহ ঘুমে এলিয়ে পড়েছে। একটিও কথা না বলে সে ওপরে উঠে এসে শুয়ে পড়ল। সেখানে শুয়েই কাৎ হয়ে ডেকে বলল : চারু, এবার শুয়ে পড়।

চোখ দুটি মেলে চারু কিসের যেন একটা আবেশ অনুভব করতে লাগল। ডাক শুনেই তার ঘুম ভেঙ্গেছে। তার মনে হোল, যেন

স্বপ্নের মধ্যে কী একটা আবেশ। ঘুম চোখে সে হাঁ করে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার ইচ্ছে হোল, জেগে থেকে চৈতন্য নিয়ে ঐ ডাক আর একবার শুনবে। তাই বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

তাব এই অবস্থা দেখে প্রিয়নাথের যেন কৌতূহল হোল। সে একটু হেসে বলল : অমন কবে চেয়ে থাকলে কী হবে? ঘুমুতে হবে না? অনেক রাত হয়েছে। কাল আবাব অনেক ঘোরাঘুরি আছে।

এবার আশা ভঙ্গের বেদনা। জামা কাপড়টা গায়ে একটু গুছিয়ে নিয়ে কোনও ভাবে শুয়ে পড়ল। সবগুলো আলো কামরার মধ্যে জ্বলতে থাকল। প্রিয় বলল : ইচ্ছে করলে, আলো এক-আধটা নিভিয়ে দিতে পার।

এবার উৎসাহের বন্যায় চারু উঠে বসে বলল : আলো নেভাবার সুইচ কোথায়? ঐত এখানে।

সে সবগুলো আলোই নিভিয়ে ফেলতে কামরার মধ্যে অন্ধকার হয়ে গেল। প্রিয় বলল : সবগুলো নিভিয়ে দিলে?

চারু বলল : ক্ষতি কি? বাইরে বেশ চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলো আছে। ক্ষতি হবে?

: আমার কিছু ক্ষতি নেই। ঘুমিয়ে পড়লে আলো আর অন্ধকারে প্রভেদ কিছু থাকবে না। ওতে নতুন পরিস্থিতিতে তোমার অসুবিধে হতে পাবে।

বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে গাড়ি থামতেই দরজা খুলে প্রিয়নাথ মুখ বাড়িয়েই দেখে, একেবারে সামনে চৌধুরীবাবু। সে বিস্মিত হয় নি। ভেবেছিল —ঐরকমই বুঝি চারুর বন্দোবস্ত ছিল। শুধু আশ্চর্য হোল এই কথা ভেবে যে, রাতে এত কথার মধ্যেও চারু ঘুণাক্ষরে চৌধুরীবাবুর কথা উল্লেখ করে নি। মনে-মনে ব্যথা অনুভব করল, চারু কি তাকে বিশ্বাস করে না? সঙ্গে চৌধুরীবাবুকে নিয়ে এসেছে! একটি কথাও না বলে প্রিয় দরজা থেকে সরে আসতেই চৌধুরীবাবু

মুখ বাড়ালেন। তাঁর দিকে নজর পড়তেই চারুর চোখে মুখে একসঙ্গে বিস্ময় আর বিরক্তি ফুটে উঠল। বলল : তুমি ?

চৌধুরীবাবুর মুখের চেহারা তখন না দেখলে বোঝা যাবে না।

* * *

কামরার দরজায় চৌধুরীবাবুর মুখখানাতে যেন একটা বিগলিত আনুগত্যের শপথ। একজন নিষ্ঠুর মানুষের মনেও সে মুখখানা দেখলে একটু মমতা হবে। কিন্তু চারুর মুখে তেমন কিছু দেখা গেল না। আগেই তার চোখে-মুখে একটা বিস্ময় ও বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। এখন মুখের রেখায় রেখায় একটা কঠিন ছায়া ফুটে উঠল। সে বলল : তুমি এসে হাজির হয়েছ কেন ? আর এলেই বা কখন ?

সহস্র অপরাধের বোঝায় চৌধুরীবাবুর মাথাটি যেন নত হোল। সে চারুর কাছ থেকে কোন সমারোহপূর্ণ অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করেনি। কিন্তু এতখানি নিষ্ঠুর প্রত্যাখ্যানও আশংকা করেনি। একেবারে জড়সড় হয়ে সে বলল : ভাবলাম, যদি কিছু দরকার-টরকার হয়···

চৌধুরীর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে চারু বলল : দরকার-টরকার হবে বৈকি। এই বেডিং ছুটো আর সুটকেশটা ট্যাক্সিতে তুলে দাও।

এতক্ষণে চৌধুরীবাবু আশার আলো দেখতে পেল। সেবা তার জীবনের ধর্ম নয়। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে সেবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হোল। গদগদ হয়ে ট্রাউজারটাকে পেটের দিকে টানতে টানতে আর টাই-এর নটটাতে একটু হাত বুলিয়ে বলল : আমি কাল এসেই বুদ্ধি করে ট্যাক্সি ঠিক করে রেখেছি আর কুলীও সঙ্গে নিয়েছি।

চারু বলল : তুমি খুব বুদ্ধিমান, তা জানি। কিন্তু কুলী লাগবে না। এই সুটকেস আর হোল্ডল তোমাকেই নিতে হবে। মালপত্র পৌঁছে দিয়ে নেকসট্ ট্রেনেই তোমাকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে।

চৌধুরীবাবুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। কৈকেয়ী যখন রামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিল, তখন দশরথেরও বুঝি মুখখানা তেমন হয়নি। ব্যাপারটা যা বোঝা গেল—তা এই যে, চারুর অজ্ঞাতে চৌধুরীবাবু বিষ্ণুপুরে চলে এসেছে। তার আসাটা না-না কারণে হতে পারে! তার মধ্যে সেবাধর্মের প্রসঙ্গটা হয়ত নিতান্তই অবান্তর। তা যদি এসেই থাকে, তাহলেও অমন নিষ্ঠুরভাবে তাকে বিতাড়ন কেন? রোজ চৌধুরীবাবু চারুর সঙ্গে রিহার্সালে আসে। সাধারণভাবে উভয়ের মধ্যে মোটামুটি একটা অন্তরঙ্গতাও লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু হঠাৎ এমন বিরূপ হয়ে ওঠার কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না। প্রিয় ভাবল, চারু হয়ত প্রিয়নাথের সঙ্গে তার সাহচর্য্যটা নিতান্তই একান্ত করে রাখতে চায়। তার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির অনুপ্রবেশ পছন্দ করেনি কিন্তু সে কী ভেবেছে, তা তার মনেই আছে। লোকে কথায় বলে, স্ত্রীলোকের বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। নিজের অজ্ঞাতে যে অমার্জনীয় অপরাধই করে থাক, তারই নিষ্ঠুর পরিণামের মুখোমুখি হয়ে চৌধুরী বিব্রত হয়ে তার বেদনা-কাতর মুখখানা প্রিয়নাথের দিকে তুলে ধরল। কোন সাহায্যের প্রত্যাশা কি-না কে জানে। আগে পরে কোন কথাই সে জানে না। কী সাহায্যই বা করবে? তবুও চৌধুরীবাবুর এই দুর্গতিতে প্রিয় বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। স্থান ত্যাগের উপায় নেই। চৌধুরী দরজা আগলে দাঁড়িয়ে। স্থির কণ্ঠে চারু বলল: দাঁড়িয়ে থাকলে কেন?

প্রিয়নাথের মনে হোল, চৌধুরী যেন পা বাড়াল। প্রিয় আতংকিত হয়ে উঠল। চৌধুরী বুঝি আনুগত্যের অনুরোধে কোট ট্রাউজার নেকটাই পরা চেহারাটি নিয়ে এগিয়ে এসে সত্যি-সত্যি মালপত্র মাথায় তুলে নেবে। যদি সত্যি হয়, তবে বড় ভয়ানক কথা। চৌধুরীবাবুর দেহের মধ্য-দেশ অস্বাভাবিক রকমের স্থূল। ট্রাউজার কোমর থেকে কেবলই নীচের দিকে নেমে যেতে চায়।

চৌধুরী ডানহাতে বাঁহাতে কেবলই টেনে টেনে ওপর দিকে তুলে রাখে। সেদিকে অমনোযোগী হলে দুর্ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়।

দৈবের বিড়ম্বনায় সেই চৌধুরীবাবু বাক্স-বিছানা মাথায় তুলে নিলে পরিচিত অপরিচিত সকলের কাছে কী দৃশ্য হবে কে জানে! সেই কল্পনার অতীত সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে প্রিয়নাথ বিচলিত হয়ে উঠল। তাকে পরিত্রাণ দিতে তাকেই ভর্ৎসনার সুরে বলল : আপনি কি পাগল হয়েছেন? আপনি পথ বন্ধ করে আছেন কেন? কুলীকে আসতে দিন।—কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে সে সমর্থনের আশায় চারুর মুখখানা একবার দেখে নিয়ে দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল।

চৌধুরীবাবুর ঠিক করে রাখা ট্যাক্সিতে মালপত্র উঠে গেল। চারু উঠে প্রিয়কে ডাকল। চৌধুরীবাবু অদূরে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ট্রাউজারটিকে কেবলই ওপর দিকে টেনে যাচ্ছেন। বিনীত লোভাতুর দৃষ্টিটা ট্যাক্সির দিকে। প্রিয়নাথ ডাকতেই কাছে এলো। দরজাটা খুলে দিয়ে সে বলল : আসুন।

তখন উঠলে একেবারে চারুশীলার পাশে বসতে হয়। তাই তার মনে দ্বিধা। অনেকদিন আগে সে শুধু দূর থেকে চারুকে দেখত। তারপরে একদিন গভীর রাতে চারুর সঙ্গে তার যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। সে যাত্রায় দুই-এর মধ্যে ব্যবধান ছিল। ক্রমে পাশেও বসল। তারপর থেকে চারুর পাশে যায়গা পড়েই থাকে। বসা আর সব সময় হয়ে ওঠে না। আজ কিন্তু চারুর পাশের জায়গাটুকু তার কাছে বড় লোভনীয় মনে হোল। সে লোভটুকু জয় করে চৌধুরীবাবু সামনের দরজাটি খুলে ড্রাইভারের পাশে বসে পড়ল। তার মুখখানাতে তখন বেশ একটা তৃপ্তির আবেশ। ভাবখানা এই—সঙ্গলাভ করেছি, এই যথেষ্ট। অত নিবিড় সান্নিধ্যে আর দরকার নেই।

গাড়ি চলতে চলতে চারু জিজ্ঞাসা করল : এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?

প্রিয়নাথ কিছু উত্তর দেবার আগেই চৌধুরী মুখ ঘুরিয়ে গর্বের সঙ্গে বলল: আমিতো হোটেলে জায়গা ঠিক করে রেখেছি। ড্রাইভারকে সে কথা বলাও আছে। খুব ভাল বন্দোবস্ত। সেখানে একটু বিশ্রাম এবং জলযোগ করে যেখানে হয় গেলেই হোল। রাত্রে নিশ্চয়ই ঘুমটুম ভাল হয়নি?

শান্ত পরিবেশ আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল। চারু বেশ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করল: রাত্রে ঘুমটুম ভাল হয়নি, সেকথা তুমি জানলে কী করে?

চৌধুরী ভ্রমণজনিত রাত্রি জাগরণের ক্লান্তির কথা ভেবেই দরদভরা গলায় কথাটা বলেছিল। রেলগাড়িতে রাত্রিবেলা ঘুম না হওয়াই স্বাভাবিক। এর মধ্যে এতখানি বিপত্তি থাকতে পারে, তা চৌধুরীর মত লোকের পক্ষে অনুমান করা শক্ত। সে ভয়ে বোকা হয়ে বলল: আমি অনুমান করলাম···

ড্রাইভার ভদ্রলোক একজন শিখ। তার কাছে বাংলা কথা বোধগম্য না হওয়াই স্বাভাবিক—এইরূপ ভেবে, উত্তেজিত কণ্ঠে চারু বলল: তা জানি। উঁকি দিয়ে দেখবার তোমার সুযোগ ছিল না। অনুমানই তোমার সম্বল। আর সেই অনুমান করেই জ্বলে-পুড়ে মরছ।

গাড়ির ঝাঁকানিতে রাত্রে প্রিয়নাথের আর চারুশীলার ঘুম না হয়ে থাকলে চৌধুরীর সমবেদনা হতে পারে। কিন্তু তার মধ্যে জ্বলুনির কী কথা থাকতে পারে, তা তার বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু যত দুর্বোধ্যই হোক, প্রতিবাদের ভরসা নেই। তাই চুপ করেই থাকল।

হোটেলের একটা ডবল বেড রুমে দুইজনকে পৌঁছে দিয়ে চৌধুরী না বলে কয়ে অদৃশ্য হয়েছিল। প্রিয় বলল: ও ভদ্রলোক কি সত্যি-সত্যি ফিরে গেলেন নাকি?

চারু একটু হেসে বলল: এঁচোড়ের আঠা দেখেছেন? এও তাই। এত সহজে গেলে আর ভাবনা ছিল কী?—তা চারুর কথা

সাত্য হয়েছিল। রওনা হবার মুহূর্তে চৌধুরী দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠেছিল। চারু জিজ্ঞাসা করেছিল : আমরা প্রথমে কী দেখব?

প্রিয় বলল : আমার এক বন্ধু আছে। সে বৃত্তিতে ডাক্তার কিন্তু পেশায় চাকুরে। ডাক্তারী সম্বন্ধে তার জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচুর। সত্যি কথা বলতে গেলে, সে হাতে ধরে জল তুলে দিলেও আমার রোগ সেরে যায়। কিন্তু কিছুতেই সে ডাক্তারী করবে না। ভারতময় অন্যান্য ডাক্তারদের্ কাছে ঘুরে ঘুরে তার কোম্পানী যে ওষুধ তৈরী করে, তাই ধন্বন্তরী বলে বোঝাবে। আমরা ঠাট্টা করে তাকে বলি "কাওয়ার্ড ডক্টার"।

: তার অর্থ?

: তার অর্থ এই যে, ডাক্তারীর মত এমন দুরধিগম্য বিদ্যাকে আয়ত্ব করেও যে সভয়ে তার থেকে দূরে থাকে, সে কাওয়ার্ড।

: না জেনে না শুনে মানুষকে অমন অপবাদ দিতে নেই, প্রিয়দা। কোন্ পরিস্থিতিতে মানুষ কী করে, তা সব সময় জানা যায় না। আমি এক ডাক্তার ভদ্রলোকের কথা জানি। একটা সামান্য কারণে বিলেতফেরৎ সেই শল্যবিদ চিরদিনের জন্য ছুরি কাঁচি পরিত্যাগ করেছিলেন। তা সেকথা পরে বলব। আপনার ডাক্তার-বন্ধু কী করেছিলেন বলুন।

প্রিয় বলল : আমার সেই ডাক্তারবন্ধুর নাম সুজিত রায়। নতুন গাড়ি কিনেই বলল, চল তারকনাথ দর্শন করে আসি। তা রওনা হলাম। সঙ্গে তৃতীয় বন্ধু সোমনাথ। তারকেশ্বরে পৌঁছেই সুজিত বলল : কোন স্থান দর্শনের আগে, তার প্রাণকেন্দ্রকে জানতে হয়।

চারু : তা ওখানকার প্রাণকেন্দ্রতো বাবা তারকনাথ।

: তাঁকে জানবার ধৃষ্টতা ডাক্তারের ছিল না। সে বলল : মোহন্তকে আগে দর্শন করতে হবে।

: ওমা! আপনারা মোহন্তকে দেখেছেন নাকি? আমরা

তারকেশ্বর গিয়েছি, বাবা তারকনাথের মাথায় জল দিয়েছি। কিন্তু মোহন্তকে দর্শন করবার কথাতো মনেও হয়নি ? তা কী দেখলেন ?

: দেখলে ত ? মোহন্তর কথা শুনে তুমিও কৌতূহল বোধ করছ! তবেই ভেবে দেখ, আমার সেই ডাক্তারবন্ধুর দূরদৃষ্টি কতখানি। তা আমরা তিনজনে মোহন্তর সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেলাম।

: বাবা তারকনাথকে দেখতে অনুমতি লাগে না, কিন্তু তার সেবায়েতকে দেখতে অনুমতি লাগে ?

: অনুমতি, বলতে অনুমতি ? বিরাট হলঘরটার সামনে আমাদের নিয়ে গেল। দেখলাম, কজন লোক থিয়েটারী ভঙ্গিতে কুর্ণিশ করতে করতে মোহন্তর সামনে গিয়েই উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে থাকল। অন্য দুইজনও সেই পথ ধরল। আমরা প্রমাদ গুণলাম। আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং দেহের অবস্থা অনুরূপ আচরণের অনুকূল নয়। মোহন্ত বোধহয় গাড়ি-চড়ে আসা ভক্তদের সংবাদ জেনেছিলেন। আমাদের বিভ্রান্ত অবস্থা দেখে হাতের ইসারায় ডাকলেন। তিনজনে এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করলাম। মোহন্ত বোধহয় আমাদের ভক্তির পরিমাণ করে ফেলেছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন : কী বলবেন, বলুন।

সুজিত ডাক্তার সদালাপী। ভারতময় অনেক লোকের সঙ্গে তার আলাপ করতে হয়। তারকেশ্বরের বর্তমান অবস্থা, অতীত ইতিহাস, ব্যবস্থাপনা, সুষ্ঠু পরিচালনায় না-না অন্তরায়ের বিষয় নিয়ে অনেক কথা হোল।

দেখা গেল, মোহন্ত মহারাজ বেশ সুশিক্ষিত। যুবক পুরুষ, মার্জিত রুচি, হাসিমুখ এবং ভক্তজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যা হচ্ছিল ভালই হচ্ছিল। কিন্তু বিপদ হোল সঙ্গী সোমনাথকে নিয়ে। এতক্ষণ অসীম ধৈর্যের সঙ্গে শুধু শ্রোতার ভূমিকা নিয়ে তার বোধহয় আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল। নিজের প্রতিভা বিকাশের জন্য

ব্যাকুল হয়ে উঠল। মোহন্তর সঙ্গে বাক্যালাপের উপযুক্ত ভাষা ব্যবহার করে বলে উঠল: ভবদীয় নিবাস কোথায়?—আমরা চমকে উঠে সঙ্গীর দিকে তাকালাম। মোহন্তর মুখখানা প্রথমে একটু গম্ভীর হোল। তারপরেই সামলে নিয়ে বললেন: যেখানে বাস, তাই নিবাস। আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু অতলান্ত জলে ডুবে যাওয়া আমাদের তখনও বাকি। সঙ্গী সোমনাথ ততক্ষণে নীরবতার জড়তা কাটিয়ে মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে বাক্যালাপের গৌরবে চৈতন্য হারিয়েছে। তার দ্বিতীয় প্রশ্ন শুনে আমি ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠহীন ভাষায় কোরাস গেয়ে উঠলাম, "ধরণী দ্বিধা হও।" তাকিয়ে দেখি সকলের মুখ ঘৃণায়, লজ্জায়, পাংশুবর্ণ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মোহন্তর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি —স্নিগ্ধ হাসি। মনে হোল—তার অর্থ এই যে, ভগবান! এদের কৃপা কর।

চারু ধৈর্য ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল: আপনাদের সঙ্গী সোমনাথবাবুর দ্বিতীয় প্রশ্নটি কী ছিল?

: সোমনাথ জিজ্ঞাসা করেছিল, ভবদীয় সন্তানাদি কী?

তার পরেই প্রিয়নাথ বলল: সেইজন্য বিষ্ণুপুর দেখবার আগে আমরা বিষ্ণুপুরের রাজাকে দেখব।

স্থানীয় একজন গৃহস্থ রাজবাড়ি বলে পরিচয় দিয়ে যে গৃহটির সামনে এনে প্রিয়নাথদের হাজির করল, তাকে আর যাই বলা যাক 'রাজগৃহ' বলা যায় না। বর্তমানের রাজসিক সমারোহ এবং মর্যাদা না হয় নাই থাকল। কিন্তু অতীতের অবলুণ্ঠিত রাজকীয় সম্ভ্রমের বিন্দুমাত্র চিহ্ন পর্যন্ত নেই। নিতান্তই সাধারণ গৃহস্থের একটি বাড়ি।

একজন ভদ্রমহিলা সদর দরজার দিকে এগিয়ে আসতেই চারু কানের কাছে ফিসফিস করে বলল: ঐ বোধহয় রাজরাণী। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন না।

প্রিয় বলল : সমানে সমানে কথা হওয়াই ভাল। তুমিও তো কত রজনীর রাজরাণী। তুমিই জিজ্ঞাসা কর।

চারু এগিয়ে গিয়ে ভদ্রমহিলার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ফিরে এসে জানাল—রাজা বাজারে গেছেন। অভিনয় জীবনে অনেক রাজা-মহারাজার সঙ্গে প্রিয়নাথের পরিচয় আছে। তাঁদের রাজকার্য সম্বন্ধেও কিছু কিছু ধ্যান-ধারণা আছে। কিন্তু তার সঙ্গে বাজার করাটা নিতান্তই সঙ্গতি-হীন। তা যুগে-যুগে কত কিছু পরিবর্তন হয়! যিনি তাজমহল তৈরী করেছিলেন. সেই সাজাহানের বংশধর বাহাদুরশাহ সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে রেঙ্গুনে নির্বাসিত হলেন। সেইখানেই তাঁর মৃত্যু হোল। জগৎ সংসার জানল, মোঘল সম্রাটের বংশ নির্বংশ হয়ে গেল। তারপরে কতকাল গত হোল। স্বাধীনতা হোল। সমগ্র ভারতবাসী একদিন সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখল, কোন এক অখ্যাত অজ্ঞাত স্থানে নাকি ভারতসম্রাটের কোন এক বংশধরকে খুঁজে পাওয়া গেছে। তা ততদিনে মাটি ফুঁড়ে ভারতসম্রাটের বংশধর বেরিয়ে এলে আর ভয়ের কথা কী আছে? ততদিনে কোহিনূর উড়ে গিয়ে ইংলণ্ডেশ্বরীর মুকুটে বসেছে। 'জয় ভারতসম্রাট' বলে তোরা সব জয়ধ্বনি দে। অমন প্রিয়নাথেরা কত দেয়। দিয়েই কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে এসে ট্রামের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। কানের কাছে চুনকালি হয়ত একটু লেগে আছে। কেউ কেউ সেদিকে আবার তাকায়। প্রিয়নাথ তখন অন্যদিকে তাকিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে কেবল ঘষতে থাকে। ঐ কানের মধ্যে চুনকালি দেখেই একদিন রাণী বৌদি কানটা ধরে হাসতে হাসতে ঘষে ঘষে দাগ তুলে দিয়েছিল। প্রিয় বলেছিল, বৌদি আপনার দয়ামায়া নেই। বৌদি বলেছিল, দয়ামায়া থাকলে চুনকালি তুলব কী করে?

একটু পরেই বাজারের ব্যাগ সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। তিনি সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে ধরতেই প্রিয়

এগিয়ে গিয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করল। বলল: আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

ভদ্রলোক হেসে বললেন: আমার সৌভাগ্য। আসুন।—বলে তিনি এগিয়ে যেতে যেতে আগেকার দেখা সেই ভদ্রমহিলা এসে বাজারের থলেটা নামিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রিয়নাথরা তিনজন ভদ্রলোকের সঙ্গে গিয়ে একটি ঘরে বসল। ঘরটি নিতান্তই সাধারণ। আসবাবপত্রের কিছুমাত্র বাহুল্য নেই। প্রিয় বলল: আমরা কলকাতা থেকে বিষ্ণুপুর দেখতে এসেছি। তার আগে আমরা রাজদর্শন করতে এলাম।

ভদ্রলোকের মুখখানাতে কে যেন আবীর ছড়িয়ে দিল। একটা সন্দেহের ভাব তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল। পরিহাস কিনা, বোধহয় তাই চিন্তা করে বললেন: একি তিরস্কার না পুরস্কার?

প্রিয় বলল: তিরস্কার বা পুরস্কার কিছুই নয়। আমরা যা শুনেছি—যদি সত্যি হয়, আপনি বিষ্ণুপুর রাজার বংশধর।

: কোথায় বা রাজা, আর কোথায় বা তার বংশ? এখন অন্ন-চিন্তা চমৎকার।

: তাহলেও বংশের ধারাতো মিথ্যে নয়?

: জানি না।

: ক্ষমা করবেন, একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে। আপনার বাসস্থানে রাজগৃহের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সে সব কোথায় গেল?

: প্রথমেই বলেছি, আমি রাজ বংশধর কিনা তা জানি না। বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে আরও দশজন যা জানে আমি তার বেশী কিছু জানি না। তা বোধহয় আপনারাও জানেন?

: আমরা কিছুই জানি না। একমাত্র লালবাঈ-এর কথা নাটকে উপন্যাসে কিছু কিছু দেখেছি। সত্যি মিথ্যে জানি না।

: আমিও জানি না। লোকমুখে কত গল্প, কত ইতিহাস, কত কাহিনী।

: আপনি তাই বলুন।

: তার আগে জিজ্ঞাসা করি, গরিব গেরস্থের ঘরে যদি অতিথি সেবার অনুমতি হয়?

: আপনি আমাদের জন্য ব্যস্ত হবেন না। হোটেলে আমাদের বন্দোবস্ত হয়ে আছে।

চৌধুরীবাবু সুযোগ পেয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন: আমি কালই এসে বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। ডবল-বেড রুম, ডানলোপিলো খাট, এ্যাটাচাড্ বাথ। সমর্থনের আশায় তাকিয়ে চারুর মুখখানা দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন।

চারু বলল: আপনি রাজার কাহিনী বলুন।

ভদ্রলোক বলতে আরম্ভ করলেন: ৬৯৫ খৃষ্টাব্দ থেকে মল্লাব্দের গণনা করা হয়। সুতরাং ধরে নেওয়া যায়, ঐ সময় থেকেই বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। মুসলমান যুগেও অনেকদিন ধরে বিস্তৃত ভূখণ্ডে এই রাজত্ব বিস্তৃত ছিল। শিব সিংহের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত কলার বিকাশ ঘটে। সঙ্গীত জগতে বিষ্ণুপুর ঘরাণার সঙ্গীতাচার্য যদুভট্ট আর রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী সকলের পরিচিত।

প্রিয় চারুর দিকে তাকিয়ে বলল: সেই সঙ্গীত নিয়েই তো রঘুনাথ আর লালবাঈ-এর কাহিনী? এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করি, লালবাঁধের পংকোদ্ধার করতে গিয়ে নাকি একটা শৃঙ্খল পাওয়া গিয়েছিল? ঐ শৃঙ্খল দিয়েই নাকি লালবাঈকে বেঁধে লালবাঁধে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল?

ভদ্রলোক: সে ঘটনা তো আমি দেখিনি; আপনারা যেমন শুনেছেন, আমিও তেমনই শুনেছি। সত্যিমিথ্যে কী করে বলব? তাও বলতে পারি, হাজা-মজা একটা জলাশয়ের নীচে একটা শেকল পড়ে থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। সেটা কোন নৌকোর শেকলও হতে পারে আবার ঐ লালবাঈকে বেঁধেছিল—সে শেকলও হতে পারে।

প্রিয় বলল: একটা কিছু ঘটলে কালে কালে তার সঙ্গে অনেক

কিছু অলংকার যুক্ত হয়ে যায়। তার মধ্যে কতটা সত্য তাই বা কে জানে। রাজা রঘুনাথের মত অমন একজন পরম বৈষ্ণব একজন বিধর্মী রমণীর জন্য···

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন: বৈষ্ণব হলেও রাজা রঘুনাথ একজন মানুষ ছিলেন। তাঁর দেহে রক্তমাংস ছিল। বৈষ্ণব অর্থে একটা ধর্মমত। তার পরিবর্তন হতে কতক্ষণ? এমনই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তো একদিন এই রাজবংশেরই পূর্বপুরুষ বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

ধর্মমতের উদারতা প্রসঙ্গে চৌধুরীবাবু উৎসাহ বোধ করলো। ততক্ষণে চারুশীলার বিরূপ মনোভাবের প্রতিক্রিয়াকে সে কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে। তাছাড়া এতক্ষণের নীরবতায় সে হাঁপিয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি কথার ফাঁকে সে বলে উঠল: বীর হাম্বীরের কথা আমি পড়েছি। কোন বইতে পড়েছি, তা আমার ঠিক মনে নেই। মনে হয়, "নিমাই সন্ন্যাস" গ্রন্থ হতে পারে।

চৌধুরীবাবু যাত্রা গানে "নিমাই সন্ন্যাস" পালা শুনেছে। সুতরাং তার বিবেচনায় আধ্যাত্মিক গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যে "নিমাই সন্ন্যাস"-এর স্থান খুব উচ্চ।

এমন একটি দুরধিগম্য গ্রন্থে সকলের অধিকার না থাকাই সম্ভব। সে সকল শ্রোতাদের একেবারে অবাক করে দিতে চেয়েছিল। তাকিয়ে দেখল তার প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে। প্রিয়নাথ এবং ভদ্রলোক বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু চারুশীলার মুখের দিকে তাকিয়ে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। একেবারে বাক্‌সংযম করে সে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকল। অত ক্রোধ এবং লজ্জার মধ্যেও চারুর রস-বোধ নষ্ট হয়নি। সে ভাবল, "কোরান শরীফ" না বলে অন্তত "নিমাই সন্ন্যাস" বলেছে—এও ভাগ্যের কথা। অপ্রীতিকর পরিস্থিতির হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় প্রিয়নাথ বলল: আপনি বীর হাম্বীরের কথা বলুন।

এই কথা বলতে বলতেই যে ভদ্রমহিলার সঙ্গে চারুর প্রথম কথা হয়েছিল, তিনি একটি কাঁসার থালায় কয়েক পেয়ালা চা এবং কয়েকবাটি মোহনভোগ নিয়ে এসে হাজির হলেন। প্রথম দর্শনে চারু যাঁকে রাজরাণী বলে উপহাস করেছিল, এখন আর তাকে পরিহাস করা যায় না। তার পরিবর্তে স্নেহমাখা মুখখানার দিকে তাকালে একটু শ্রদ্ধাই হয়। একটু আগে সদর দরজায় দেখে চারুশীলা নিজের নগরজীবনের প্রাচুর্যের অহমিকায় এক পল্লীবধূর স্বল্পতাকে পরাভূত করতে চেয়েছিল। সেই মহিলা পোষাকে-পরিচ্ছদে আচারে-বিচারে কোন রূপান্তর গ্রহণ না করেও অন্তরাল থেকে সকলকে পরাজিত করার এক দুর্জয় ক্ষমতা অর্জন করে এসে হাজির হয়েছেন। চারু সকলের আগে উঠে দাঁড়াল। তারপরে প্রিয়নাথ আর চৌধুরীবাবু। বলা নেই, কওয়া নেই, চৌধুরীবাবু তার উদরের প্রতিকূল অবস্থাকে গ্রাহ্য না করে বারবার সামনের দিকে ঝুঁকে সাহেবী কায়দায় বাউ করতে লাগলেন। সাহেবী পোষাকের কল্যাণে কিনা কে জানে। এতখানি মাত্রাতিরিক্ত আভবাদনের কারণ সে নিজেও জানে না। তড়িঘড়ি চারুকে দাঁড়াতে দেখেই মনে হয় তার বিদ্যাবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল। চারু থালাটা ধরবার জন্য হাতখানা বাড়িয়ে দিতেই তিনি বললেন: আপনি বরং টুলটা এগিয়ে দিন। আর আপনারা সকলে উঠে দাঁড়ালেন কেন? বসুন।—সকলে আসন গ্রহণ করল। সকলের পরিচয় জানবার জন্য ভদ্রলোকের নিজেরই কৌতূহল ছিল হয়ত। তিনি বললেন: সকলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।—এই কথা বলে প্রিয়নাথের দিকে তাকালেন। প্রিয়নাথ বলতে আরম্ভ করল: আমার নাম, প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য। নিবাস—কলকাতা। পেশা চাকরী। ইনি শ্রী চৌধুরী—নিবাস—কলকাতা। পেশা—। চৌধুরীবাবু তাড়াতাড়ি বললেন: মিঃ এ চৌধুরী। জেনারেল মার্চেন্ট, ক্যালকাটা। প্রিয়নাথের মুখখানা একটু আরক্ত হোল। আবার বলল: আর ইনি শ্রীমতী চারুশীলা…

—চারু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল: দেবী। নিবাস স্বর্গপুরী, পেশা দেবীদের যা হয়ে থাকে, তাই আর কি! সকলেই হাসতে লাগল। তার মধ্যে চৌধুরীর হাসি আর থামতে চায় না। হাসতে হাসতে চৌধুরী ভাবতে লাগল, পরিচয়টা পরিষ্কার হোল না। ভদ্রলোক চারুর সঙ্গে কার কী সম্বন্ধ ভেবে নিলেন, কে জানে। সে সম্বন্ধটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্যই চৌধুরী চারুর কানের কাছে ফিস-ফিস করে কী সব বলতে লাগল। অপরিচিত এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার কাছে চারুশীলার প্রতি নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে কী গৌরব থাকতে পারে, তা জানে চৌধুরীবাবু। প্রিয়নাথ বলল: আপনি এইবার বীর হাম্বীরের কথা বলুন।

ভদ্রলোক আরম্ভ করলেন: বীর হাম্বীর ছিলেন ঘোরতর শাক্ত। নরহত্যায় তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। তাঁর বীর্যশুল্কে মল্লভূম সে সময়ে উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলতান দায়ুদ খাঁর কী দুর্মতি হোল, তিনি বিষ্ণুপুর আক্রমণ করলেন। দায়ুদ খাঁর লক্ষ লক্ষ সৈন্য এসে বিষ্ণুপুর অবরোধ করল। তারপর প্রতিরোধ। বিষ্ণুপুর দুর্গের পূর্বদ্বারে হাজার-হাজার যবন সৈন্যের মৃতদেহ পড়ে থাকল। শবদেহের পাহাড়। অমাবস্যার নিরন্ধ্র অন্ধকারে মশালের আলোতে নররক্ত দেখে তিনি উল্লাসে ফেটে পড়লেন। বীরহাম্বীর স্তূপীকৃত শবদেহ দেখে বলেছিলেন, লক্ষ লক্ষ মুণ্ডমালা গেঁথে দেবী চামুণ্ডার গলায় পরিয়ে দেব।

এই সময় হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে চৌধুরীবাবু আবার কথা বলল: হ্যাঁ, আমিও পড়েছি, মুণ্ডমালার দাঁত কপাটি। মা কালীর গলায় যে মুণ্ডমালা থাকে না? দেখবেন, তার প্রতিটি মুণ্ডের মুখে দাঁত কপাটি লেগে আছে। যেন একটা প্রতিশোধের ইচ্ছা। পারেত তখনও মা কালীর মুণ্ডটা চিবিয়ে খায়। কিন্তু তা কি পারে? অত সহজ নয়। দেখেছেন না?

মুণ্ডমালা আর কে না দেখেছে? কিন্তু ঐ সব মুণ্ডের মনের ইচ্ছা

কা, তা নিয়ে কেউ আলোচনায় এগিয়ে এলো না। চারু বড়ই বিরক্তি বোধ করছিল। তার ভয় হোল, পরিচয়ের গণ্ডগোলের মধ্যে ঐ ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা, সে আর চৌধুরীর মধ্যে কী সম্পর্ক ধরে নিয়েছে কে জানে। এবার চারু তাড়াতাড়ি বলে উঠল: তারপরে বলুন।

চৌধুরীও বলল: বেশ লাগছে। বলুন স্যার।

ভদ্রলোক বললেন: সে দুর্গ নেই, দুর্গদ্বারও নেই। কিন্তু অসংখ্য নরহত্যার বিনিময়ে বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা রক্ষার ইতিহাস অক্ষয় হয়ে আছে একটি স্থানে। তার নাম "মুণ্ডমালা ঘাট।" ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেই দেখিয়ে দেবে।

প্রিয়নাথ বলল: সেই রক্তস্নাত বিষ্ণুপুর আবার বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবনে ভেসে গেল।

চৌধুরী বলে বসল: এটা কিন্তু খুব ইয়ের কথা!

ভদ্রলোক বললেন: সে এক বিচিত্র ইতিহাস।—তারপর তিনি যে কাহিনী বললেন, তা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। রাজ জ্যোতিষী গণনা করে বললেন যে, রাজ্যের মধ্য দিয়ে গভীর রাত্রে অমূল্য সম্পদ অতিক্রম করে চলে যাবে। শুনে হাম্বীরের অন্তর লালসায় পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি রাজপথে সসৈন্য হাজির থাকলেন। সম্পদের আভাসমাত্র পেলে লুণ্ঠন করবেন। বনানীর অন্ধকারে রাজশক্তি দস্যুরূপে আত্মগোপন করে থাকল। তারপর কেবল প্রতীক্ষা। অবশেষে রজনীর দ্বিপ্রহরে অপেক্ষার অবসান হোল। একটি গোশকট এগিয়ে আসছে। রাজশক্তি দস্যুরূপে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রক্ষক ভক্ষক হয়েছে। রক্ষা করবে কে? অসহায় কয়েকটি মানুষ ধরা পড়ল। সঙ্গে একটি পেটিকা। পেটিকার মধ্যে কী আছে? পরিষ্কার চাঁদের আলোতে দস্যুদল চোখ মেলে অভিভূত হয়ে দেখল, অমূল্য সম্পদের অধিকারী বলে যাদের বেঁধে ফেলেছে, তারা কৌপীন-সর্বস্ব। পেটিকা খুলে দেখা গেল, তার মধ্যে রাশিকৃত পুঁথি।

হাম্বীর আদেশ দিলেন, বেঁধে নিয়ে এসো সেই মূর্খ জ্যোতিষীকে। রাজ জ্যোতিষী এসে প্রদীপ জ্বেলে পুঁথি পড়তে লাগলেন। পড়ে তিনি জানালেন—অমূল্য সম্পদ পেয়েছি।

একটু চুপ করে থেকে ভদ্রলোক বললেন: অনুসন্ধানে জানা গেল, ঐ কৌপীনধারী পুরুষেরা আর কেউ নয়, বৈষ্ণব শিরোমণি শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ আর নরোত্তম ঠাকুর। আর পেটিকার মধ্যে যে পুঁথি পাওয়া গিয়েছিল, তাও আর কিছু নয়, "চৈতন্য চরিতামৃত"-এর পাণ্ডুলিপি। ঐ মোহন্তগণ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি নিয়ে বৃন্দাবন থেকে গৌড় যাবার পথে ঐ বিপর্যয়। শ্রীনিবাস আচার্যের সৌম্যমূর্তি দর্শন করে আর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে বীর হাম্বীর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

চারুশীলা প্রিয়নাথের কানের কাছে মুখ এনে আস্তে বলল: বড়কর্তা আমি বিষ্ণুপুর আসব শুনে বলেছিলেন, বাগবাজারের মদনমোহন নাকি আসলে বিষ্ণুপুরের রাজবিগ্রহ?

ভদ্রলোক সে কথা শুনতে পেয়ে বললেন: আপনাদের বড়কর্তা কে আমি জানি না, কিন্তু তিনি ঠিক কথাই বলেছেন। একথা সকলেই জানে।

চৌধুরীবাবু বলে উঠলেন: আমাদের বড়কর্তা সব জানেন। তিনি সব থিয়েটারের রাজা। আমাদের এই চারুতো তাঁরই ইয়ে···

চারুশীলার আর সহ্য হোল না। সে চৌধুরীর আস্তিনের খুঁট ধরে একটু টেনে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। চৌধুরীও চোখে মুখে উদ্বেগের ছায়া ফুটিয়ে তুলে পড়ি-মরি করে ট্রাউজারের কোমরটা ওপর দিকে টানতে টানতে তার কাছে চলে গেল। দুইজনে কী কথা হোল। চৌধুরী দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল আর চারু ফিরে এসে বলল: মদনমোহনের কথা বলুন, শুনি।

ভদ্রলোক আবার আরম্ভ করলেন: কত উত্থান পতনের পরে মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ ইংরেজের আদালতে নানা মামলা-মোকর্দমায়

জড়িয়ে পড়লেন। আর অর্থের সংস্থান হয় না। শেষকালে ঐ বিগ্রহটিকে বাগবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ ধনী গোকুল মিত্রের কাছে বন্ধক রেখে টাকা ধার করেন। সেই মদনমোহন আর ফিরে এলেন না। তারপর ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে মল্লভূম বর্ধমান মহারাজার কাছে বিক্রিই হয়ে গেল। এখন আর বিষ্ণুপুরে এসে রাজা খুঁজে বেড়ালে কোথায় পাবেন বলুন ?

* * *

হোটেলে ফিরে তারা দেখল, চৌধুরী কাঁদ-কাঁদ মুখে বসে আছে। চারু ঘরে ঢুকেই ছিটকিনিটা তুলে দিয়ে চাপা উত্তেজনার কণ্ঠে বলল : তোমাকে আমি সকালের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে যেতে বলেছিলাম। যাওনি কেন ?

চৌধুরী অসহায়ের মত প্রিয়নাথের দিকে তাকাতেই সে আবার বলল : ওদিকে তাকালে কি হবে ? চিরদিন মেয়ে মানুষের দালালী করলে। ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলামেশা কর নি। কথাবার্তাও শেখ নি। সেইজন্যই তোমাকে চলে যেতে বলেছিলাম। যা করেছ, ভালই করেছ। এখন, কখন্ আমাকে নিস্কৃতি দেবে বলতে পার ?— এই কথা বলে সে স্নানের ঘরে চলে গেল। প্রচুর জল পড়ার শব্দ হতে লাগল। বোঝা গেল, সে স্নান করতে আরম্ভ করেছে।

চৌধুরী কিছুক্ষণ বাথরুমের বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে প্রিয়নাথের দিকে এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল : শুনলেন তো স্যার, কথাগুলো ? অন্য লোক হলে গলায় দড়ি দিত। আমি বলে তাই···

দু'জনের মধ্যে বন্ধনের যোগসূত্রটা কী, তা প্রিয় জানে না। তা যাই হোক, চারুর কোন ব্যবহার সহ্যের অতীত হলে একজন পুরুষ মানুষের কাছে তা প্রতিকার অথবা নিবারণের অনেক কিছু উপায় থাকা সম্ভব। সেসব কোন পথ গ্রহণ না করে একজন সক্ষম মানুষ কী করে গলায় দড়ির পথটা নির্বাচন করতে পারে, তা প্রিয় বুঝতে

পারে না। তবে ভরসার কথা এই—অন্য লোক হলে গলায় দড়ি দিত। চৌধুরী বোধহয় দেবে না। এত কথা প্রিয়নাথের মনেই থাকল। মুখে বলল : ছি-ছি, গলায় দড়ি দেবেন কেন? একসঙ্গে থাকলে অমন দু'চার কথা হয়।

উৎসাহ পেয়ে চৌধুরী পুনরায় স্নানাগারের দরজাটা দেখল এবং জলের শব্দ কান পেতে শুনে প্রিয়নাথের একেবারে কাছে ঘেঁষে এসে চুপি চুপি বলতে আরম্ভ করল। চাপা উত্তেজনায় তার দুই চোখ গোল গোল হয়ে উঠল। বলল : একসঙ্গে থাকার কথা যখন বললেন, তখন বলি। আমার ঘরে মশায়, আসমানের পরীর মত বৌ। দেখলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আপনাকে একদিন নিয়ে যাব, দেখবেন।

প্রিয় বলল : যা দেখলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, তেমন জিনিষ দেখাবার দরকার কি?

: না, ও যে অত রূপের দেমাক করে, তাই বললাম। কিন্তু তোর রূপটা কী কাজে লাগল শুনি? খুবতো শাঁখা-সিঁন্দুর দেখিয়ে বেড়াস। স্বামীর ঘর করতে পারলি? কেন পারলি নে?

প্রিয় বলল : চৌধুরীবাবু, আমি সেসব ইতিহাস শুনতে চাই না।

প্রিয়নাথের ভয় হোল, যদি দৈবাৎ চৌধুরীর মুখ থেকে অম্বিকাদার নামটা বেরিয়ে পড়ে। যা জানা নেই, তা অজ্ঞাতই থাক। যে বৌদির হাতে তৈরী চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের সন্দেশ আর নারকেল নাড়ু খেয়ে মনের একান্তে মমতাময়ী আর প্রসন্নময়ী বলে ঠাঁই দিয়ে রেখেছে, কোন অবস্থাতেই তাঁকে সেখান থেকে নামিয়ে আনার মধ্যে আর যাই থাক, আনন্দ নেই। কিন্তু কার কথা কে শোনে? চৌধুরীর তখন পালে হাওয়া লেগেছে। সে আবার বলতে আরম্ভ করল : আচ্ছা ওর ইতিহাস না হয় নাই শুনলেন। কিন্তু ওর কথাগুলো শুনেছেন ত? বলে কিনা, ওর ঘুম হয়নি, তাই আমি জ্বলেপুড়ে মরছি। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কেউ কোনদিন শুনেছে?

প্রিয় প্রায় চিৎকার করে বলল : আপনি থামবেন কিনা বলুন ?

চৌধুরী অপরাধীর মত বলল : আচ্ছা, এসব কথা না হয় না-ই বললাম। তোরত দেবতার মত স্বামী ছিল। তুই যে স্বামীর ঘর করতে পারলি না, তার জন্য দায়ী কে ? আর তার জন্য তো আমাকে নিমিত্ত করে রাখলি।

প্রিয় কঠিনভাবে তাকাতে চৌধুরী ভয় পেয়ে থামল। কিন্তু তার ভেতরে তখন আগ্নেয় গিরির জ্বালা। চুপ করে থাকবার উপায় নেই। অন্যদিকে তাকিয়ে বলতে লাগল : আপনি শুনতে চাচ্ছেন না ; নাহলে আমি বলতাম, তোকে অত কাণ্ড করে সেনেদের বাড়িতে বৌ করে ঢুকিয়ে দিলাম। একেবারে বাজনা বাজিয়ে, বাজি পুড়িয়ে মালাবদল করে বিয়ে। তা সেখানেও তুই থাকতে পারলি না। তুই গেলি বড় কর্তার সঙ্গে ঢলাঢলি করতে। তাই নিয়েই একেবারে ধুন্দুমার কাণ্ড···

এতক্ষণ প্রিয়নাথের এত চেষ্টায় যা সম্ভব হয়নি, সেই অসম্ভব সম্ভব হোল। চৌধুরীবাবু চুপ করল। স্নানাগারের দরজা খুলেছে।

* * *

বিকেলে প্রিয়নাথ আর চারুশীলা একটি অতিকায় কামানের কাছে গিয়ে হাজির হোল। চৌধুরী সঙ্গে নেই। স্নানাগারের দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে অন্তর্ধান করেছিল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোথায় গেল, কী খেল—তা নিয়ে ভাবনা চিন্তার অন্ত নেই। তবু নিশ্চিন্ততার ভাব দেখিয়ে চারু বলেছিল, আমাদের ওপরে ভরসা করে তো সে আসেনি। তবু দরজায় একটু শব্দ হোলেই তারা তাকিয়েছে। কিন্তু তাকিয়েই নিরাশ হয়েছে। তা চৌধুরীর চিন্তা নিয়ে বসে থাকলে তো আর দিন যাবে না! তারা বেরিয়ে পড়েছে। আর সেই মস্ত বড় কামানটার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছে। একটা অতি প্রাচীন দিনের কামান। নামটাও শুনেছে। নাম নাকি “দলমাদল”।

চারু বলল : নামটার কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না। দল বেঁধে মাদল বাজাবার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কীসের ?

প্রিয় বলল : নামের আবার অর্থ হয় না কি ?

: নামের অর্থ হয় না ? এই যে আপনার নামটা ; কী সুন্দর ! ইচ্ছে হয়, বার বার ডাকি। প্রিয়দা, প্রিয়দা—আশা আর মেটে না।

প্রিয়নাথ বুঝতে পারল, তার নিজের মুখের রংবদল হয়েছে। তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে আত্মগোপন করল।

একটু পরে মুখোমুখি হয়ে বলল : এই নাম নিয়ে বিভ্রাটও কম হয়নি।

চারু জিজ্ঞাসা করল : তা আপত্তি না থাকলে, ব্যাপারটা একটু শুনিনা ?

: সে কৈশোরের এক রহস্যময় ব্যাপার বলতে পারি। বলব অন্য সময়। এই যে কামানটি দেখতে পাচ্ছ, কোন এক সময় নাকি মদনমোহন নিজে এই কামান দিয়ে শত্রুবিনাশ করেছিলেন।

: তারপর বলুন।

: কী বলব ? ভাঁড়ার তো শূন্য। জ্ঞানদানের মত কিছু নেই যে !

: ঐ ট্যাক্সি ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করুন না।

: ও সরদারজি এসবের ধার ধারে না। ও কেবল 'গাড্ডি' বোঝে। বাংলা ভাষাও জানে না।

চারু বলল : বাংলা ভাষা জানে না--এই কথা অনুমান করে অনেক কথাই ওর সামনে বলে ফেলেছি। এখন ভাবছি, ভাল করিনি।

: কেন ?

চারু বলল : অনেক অবাঙ্গালী বাংলা জেনেও না-জানার ভান করে থাকে। বড় কর্তার এক দক্ষিণ-ভারতীয় অনুচর ছিল। হাবা লোকের মত মুখখানা করে থাকত। ভাবখানা এই, যেন আমাদের কোন কথা-বার্তাই সে বুঝতে পারে না। বড়কর্তা ভরসা করে তার

সামনেই আমাকে অনেক গোপনীয় কথাবার্তা বলতেন। একদিন সন্দেহ হতে বাংলায় গোটাকতক গালমন্দ করতেই সে ফোঁস করে উঠল। বড়কর্তা থুতনিটা ধরে আদর করে বললেন, ওহে বর্ণচোরা আম, তুমি বিদেয় হও।

প্রিয়নাথ হাসতে হাসতে বলল: তা বলে আমি সরদারজিকে পরীক্ষা করবার জন্য গালমন্দ করতে পারব না। কিন্তু আমি ভাবছি, বড়কর্তার ঐ দক্ষিণ-ভারতীয় ভৃত্যের কথা। আমার হিংসে হচ্ছে।

: হিংসে কিসের ?

: ও হাবা লোকটি সেজে বড়কর্তার সঙ্গে তোমার গোপন কথাটি শুনে নিত। তার মধ্যে রসময় কথাও থাকত মনে হয় ?

হাসতে হাসতে চারু বলল: আপনি চাইলে, দিবানিশি বসে বসে আমি আপনাকে গোপন রসময় কথা বলতে পারি। কিন্তু আপনি সেই নাম-বিভ্রাটের কথা বলুন-না, প্রিয়দা ?

প্রিয় বলতে আরম্ভ করল: আমার তখন কিশোর বয়স। গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে। আমার এক বন্ধু ছিল, নাম তুলসী। সেই তুলসী বয়সে আমার থেকে দু'-তিন বছরের বড়। সে একটি মেয়েকে চিঠি লিখে দিত।

চারু জিজ্ঞাসা করল: চিঠি লিখে দিত মানে ?

প্রিয় বলল: না, এর মধ্যে কোন জটিলতা নেই। ওদেরই এক প্রতিবেশী, সিদ্ধেশ্বর কর্মকারের যুবতী মেয়ে প্রিয়বালার বিয়ে হল।

যুবতী মেয়ের নাম প্রিয়বালা শুনে চারু মৃদু হেসে রহস্যঘন হয়ে উঠল। প্রিয় তা লক্ষ্য করে একটু হেসে আবার বলতে লাগল: বেচারা প্রিয়বালার স্বামী কলকাতার এক স্যাঁকরার দোকানে চাকরী করত। কিন্তু প্রিয়বালার দিনতো আর কাটে না। সে লেখাপড়া জানে না, চিঠিও লিখতে পারে না। তাই তুলসীকে ডেকে নিয়ে যেত। স্বামীর কাছ থেকে চিঠি এলে তা পড়ে শোনাত আবার

প্রিয়বালার চিঠিও লিখে দিত। তুলসী তার এইসব কাজকর্মের কথা আমাকে মাঝে মাঝে জানাত।

দীর্ঘপথ পার হয়ে অর্জুন পণ্ডিতের পাঠশালায় যাবার পথে তুলসীর সঙ্গে এইসব গল্প হত। একদিন গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা। গাছের নীচে মাদুর বিছিয়ে বসে ইস্কুলের হাতের লেখা করছি, এমন সময় প্রিয়বালা এসে হাজির। সে বলল, ঠাকুর তোমার হাতের লেখাতো বেশ সুন্দর। তুমি আমার সঙ্গে এসো।

চারু বলল ঃ ঐটুকু ছেলেকে আবার ঠাকুর কী ?

ঃ ভয় পেয়োনা, আমরা ভট্টাচার্য বামুন তো। তাই লোকে বলত 'ঠাকুর'। আর আমাদের বাড়িটাকে বলত "ঠাকুর বাড়ি"। তা আমি বইপত্র তুলে রেখে প্রিয়বালার সঙ্গে গেলাম। ওদের একটা স্যাকরার দোকান ছিল। পুরুষেরা সকলে সেখানে কাজকর্ম করছে। মেয়েরা সকলেই নিজের নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে। প্রিয়বালা আমাকে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

চারু বলল ঃ বেশ রহস্যময় ব্যাপার, বলুন !

প্রিয় বলল ঃ রহস্যময় বই কি ? সে আঁচলের চাবি দিয়ে একটি বাক্স খুলে একখানা চিঠি বার করল। একখানা ময়লা কাগজ দোয়াত-কলম, এইসব নিয়ে এসে বলল, এই চিঠিখানা পড়তো ঠাকুর। আচ্ছা থাক, চিঠি পড়তে হবে না। ওটা একজন পড়ে শুনিয়েছে। তুমি চিঠিখানা লিখে দাও।—এই কথা বলে সেই ময়লা কাগজখানা আর দোয়াত-কলম এগিয়ে দিল। আমি চিঠি লেখার কায়দা কানুন বিশেষ জানি না। সে কাগজখানার একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বলল, এইখানে লেখ, "প্রিয়নাথ"। আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বললাম, তুমি আমাকে চিঠি লিখছ নাকি প্রিয়বালাদি ? সে হেসে বলল, না তোমাকে নয়। আমি বললাম, তবে আমার নাম লিখতে বলছ কেন ? সে আমার কানে কানে বলেছিল, তোমাদের জামাই। আমি লজ্জায় লাল হয়ে চিঠি লিখে

দিয়েছিলাম। বেশ কিছুদিন পরে প্রিয়বালার স্বামী এসেছিল। তাকে দেখে ভেবেছিলাম, আমার আর তার একই নাম। কিন্তু তার ভিন্ন নাম ছিল। তার নাম "প্রিয়নাথ" নয়—একথা পরে জেনেছি। এবং ঐ শব্দটি কেন লিখতে বলেছিল—সে কথাও জানতে পেরেছি অনেক পরে। হাসতে হাসতে চারু বলল: তাই তো বলেছি যে, আপনার নামটি বড় রসময়। তা সে জামাই ভদ্রলোককে ঐ নাম ধরে ডাকাডাকি করেননি তো?

প্রিয় বলল: আমি একটি বালক। আমার ডাকাডাকির সুযোগ কোথায়? তবে প্রিয়বালার সঙ্গে দেখা হতে সে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। বলেছিল, তুলসীর চিঠিতে কাজ হয়নি। কিন্তু আমার লেখা চিঠির সাতদিনের মধ্যে আমাদের জামাই নাকি এসে হাজির হয়েছিল। আমি তুলসীকে সেকথা বলেছিলাম। তুলসী বলেছিল, আমার লেখা চিঠিতে আসবে কি? এমন সব বিশ্রী কথা লিখতে বলে, আমি ওসব লিখতে পারি না।

চারু বলল: আপনার বোধহয় শ্রী-বিশ্রী-জ্ঞান তখনও আসেনি? তাই যা বলেছে, তাই লিখে দিয়েছেন। আর সে লেখা একেবারে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কোন একটা বইতে পড়েছিলাম, বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে এলে মেয়ের আত্মীয় বলেছিল, আমার মেয়ে খুব ভাল চিঠি লিখতে পারে। ও একজনকে চিঠি লিখে দিয়েছিল। তিনদিনের দিন ছুটি না পেয়ে জামাই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসে। মেয়ের চিঠি লেখার বিদ্যের এমন তোড়।

এই কথায় দুই জনেই একেবারে হো হো করে হেসে উঠেছে। লোক-বিরল সেই পথে এক ভদ্রলোক সাইকেল চেপে যাচ্ছিলেন। অত হাসি শুনে তিনি সাইকেল থেকে নামলেন। প্রিয় ভাবল, সাইকেল আরোহী ভদ্রলোক বয়সে তরুণ, পোষাক পরিচ্ছদে সৌখীন। তাদের হাসাহাসি আর কথাবার্তা শুনে কৌতূহল স্বাভাবিক। তাছাড়া চারুশীলার রূপ যে-কোন বয়সের নর-নারীর

কাছে তুচ্ছ নয়। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে হাসিহাসি মুখে জিজ্ঞাসা করলেন : দলমাদল দেখতে এসেছেন বুঝি? আপনারা কোত্থেকে আসছেন?

ভদ্রলোককে উৎসাহ দেবার জন্য প্রিয় চারুকে এগিয়ে দিল। চারু হাতজোড় করে নমস্কার করে বলল : আমরা কলকাতা থেকে আসছি। দলমাদল চোখে দেখছি, এই পর্যন্ত। তথ্যাদি কিছুই জানি না।

ভদ্রলোক হাতঘড়িটা দেখে নিয়ে বললেন : এই কামানের নাম 'দলমাদল'। আবার 'দলমর্দন' ও বলা হয়।

ভদ্রলোক ঘড়ি দেখেছেন। বোঝা যায়, ব্যস্ততা আছে। বহুদর্শিনী চারু ভাবল, ওকে কিছুক্ষণ আবদ্ধ রাখতে হলে, কিছু সোমরস সেবন করান দরকার। সে লাস্যময় হাসিমাখা মুখে বলল : দলকে দল একসঙ্গে মর্দন করবার ক্ষমতা ছিল বুঝি?

ভদ্রলোকও কৃতার্থ হয়ে হাসলেন আর বললেন : মেপে দেখুন, এটা লম্বায় বার ফুট সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি আর পরিধি সাড়ে এগার ইঞ্চি। গঠনে এটা ঠিক বিজাপুরের সুপ্রসিদ্ধ কামান "মালিক-ই-ময়দান"-এর অনুরূপ।

চারু আবার হেসে উঠল। বলল : বিজাপুরের "মালিক-ই-ময়দান" না হয়ে গাঁজাপুরের "নোকর-ই-শয়তান" হলেও আমাদের আপত্তি নেই। আমরা কোনটাই দেখিনি। কি বল?—সে প্রিয়র দিকে তাকাল। প্রিয় চমকে উঠে মৃদু হাসল।

ভদ্রলোক বললেন : আমিও দেখিনি। ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। কোনদিন মেপেও দেখিনি। ওটাও শোনা কথা। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখুন, এতদিন আগে তৈরি হলেও এতটুকু মরচে পড়েনি। দিল্লীর অশোক-স্তম্ভের মত।

চারু বলল : সেটি আমরা দেখেছি, কি বল?

প্রিয় আবার একটু হাসল। ভদ্রলোক সাইকেলটি কামানের

গায়ে হেলান দিয়ে রেখে একটু এগিয়ে গিয়ে হিজিবিজি কতগুলো দাগ দেখিয়ে বললেন: এই দেখুন, ফার্সি হরফে লেখা রয়েছে, এই কামান তৈরি করতে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা লেগেছে।

প্রিয় বলল: জিনিষটির পরিচয় দিতে গিয়ে শুধু অর্থ-গৌরবের কথাই লেখা আছে। কিন্তু সেই বিত্তশালী ভদ্রলোকের সন্ধান না পেলে আমরা কার গলায় মালা দেব?

ভদ্রলোক: মালা না-হয় এর গলাতেই পরিয়ে দিন। আবাহনে মালা আবার বিসর্জনেও মালা। শ্মশানঘাটে মালার বহর দেখেছেন তো?—ভদ্রলোক আবার ঘড়ি দেখলেন।

প্রিয়: আপনি বার বার ঘড়ি দেখছেন। কাজ রয়েছে, মনে হয়। রাস্তার মাঝখানে এক বিড়ম্বনায় ফেললাম।

চারু আবার গ্রীবা হেলিয়ে একটু হাসল। মনে মনে ভাবল, বিড়ম্বনা কোথায়? যাবতীয় কাজ গোল্লায় গেলেও এখন যাবার উপায় নেই। ঘাড়টি অন্যদিকে হেলিয়ে বড়ই মধুর হেসে আবার বলল: আপনার যদি কাজ থাকে তবে আটকাব না। ওকে ছেড়ে দাও না গো?

ভদ্রলোক বিগলিত কৃতার্থতায় বললেন: বেগার খাটাও আমাদের বিষ্ণুপুরের সংস্কৃতির মধ্যে একটা, তা জানেন তো?

এরা উভয়ে মাথা নেড়ে জানাল, এমন অদ্ভুত সংস্কৃতির কথা তারা শোনেনি। ভদ্রলোক বললেন: তবে শুনুন। বিষ্ণুপুরের এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম গোপাল সিংহ। তাঁর রাজত্বকালে প্রজারা সব ধর্মহীন হয়ে পড়ল। রাজা দেখলেন, সমূহ বিপদ। তিনি ঢোল-সহরৎ যোগে প্রচার করে দিলেন, প্রত্যেককে দিনে অন্ততঃ এক হাজার আটবার কৃষ্ণনাম জপ করতে হবে। লোকের স্নানাহার নিত্য-কর্ম মাথায় উঠল। মন্ত্রীর মন্ত্রণা শিকেয় উঠল। সেনাপতির সৈনাপত্য গোল্লায় গেল। দোকানীর দোকান বন্ধ হোল। অফিস কাছারী খাঁ-খাঁ করতে লাগল। সদাসর্বদা রাজ-

অনুচর ঢাল তরোয়াল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেখানে যাকে পাচ্ছে, তাকেই বসিয়ে দিয়ে নাম-জপ করিয়ে ছাড়ছে। এই কাজটিকে লোকেরা 'গোপাল সিংহের বেগার' বলত। সে গোপাল সিংহ নেই। কৃষ্ণ নামও নেই। আমরা শুধু বেগার খাটার ট্র্যাডিশনটা বজায় রেখে চলেছি। ওয়াজেদ আলীর "ভারতবর্ষে" সেই মহাভারত পড়ার ট্র্যাডিশনের মত।

তিনজনেই হো হো করে হেসে উঠল। হাসি থামলে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা আর কী কী দেখেছেন?

চারু মুখখানা বেজার করে বলল: কিছুই দেখা হয়নি। আপনারতো আবার কাজকর্ম রয়েছে?

ভদ্রলোক ঘড়িটা এক নজর দেখে নিয়ে বললেন: এইমাত্র আমাদের চিরদিনের সংস্কৃতির কথা বললাম? লালবাঁধ দেখেছেন? রাসমঞ্চ?

ভগ্নোদ্দমের নৈরাশ্যে চারু জানাল, দেখেনি। তখন ভদ্রলোক বললেন: তাহলে আমার পেছনে আসুন। আমি সাইকেলে যাচ্ছি।

চারু দুই চোখ কপালে তুলে বলল: সে কি! আপনি গাড়িতে আসুন।

: কিন্তু আমার সাইকেল?—ভদ্রলোকের জীবন ধারণে সাইকেলটি হয়ত কিছু মঙ্গল করেছে। কিন্তু সে সময় তাঁর মনে হোল—অমন একটি উপদ্রব বুঝি সংসারে আর নেই। তিনি এদিক-ওদিক তাকাতে থাকলেন। ভাবখানা এই—সাইকেলটা কোন একটা আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করতে পারলে বাঁচা যায়। খুব মিহি সুরে চারু বলল: এখানে আপনার পরিচিত কোন জায়গা নেই?

ভদ্রলোক বললেন: দেখি চেষ্টা করে।—বলে সাইকেলটা নিয়ে এগিয়ে গেলেন। চোখের আড়াল হতে চারু হেসে গড়িয়ে পড়ে বলল: ও সাইকেলটা জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এসে হাজির হবে। সোমরস পান করেছে কিনা।

প্রিয় বলল : কেন ভদ্রলোককে নাজেহাল করা ?

চারু হাসতে হাসতে বলল : আমি ছেলেবেলায় পুতুল খেলা দেখতে খুব ভালবাসতাম। ভেবেছিলাম, বড় হয়ে পুতুল খেলার ব্যবসা করব। তা আর হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পুতুল নাচাতে আমার খুব ভাল লাগে। দড়িদড়া বেঁধে টেনেটুনে হাত নাড়ায়, পা নাড়ায়, মাথা নাড়ায়, আর পেছন থেকে নাকি সুরে কথা বলে, বেশ লাগে।

: এ-একরকমের নিষ্ঠুর আনন্দবোধ।

: আনন্দদানও বলতে পারেন। ও ভদ্রলোক সাইকেলটা ফেলে দেবার জন্য দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। পুণ্যফল থাকলে কামনা করতাম, জন্মান্তরে যেন পুরুষ হয়ে জন্মাই। মেয়ে মানুষের রক্ত মাংসের দেহটার মধ্যে কী মধু আছে, তাই একবার আস্বাদন করে দেখব। এরজন্য পুরুষগুলো কী হ্যাংলামি করে !—এরূপ প্রসঙ্গের জন্য প্রিয়নাথ তৈরী ছিল না। সে চুপ করে থাকল।

চারু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল : আমার ছেলে-মানুষীতে রাগ করেছেন নাকি ? আরও একটা কথা। তখন ঐ ভদ্রলোকের সামনে নিজের পরিচয়টাকে একটু গৌরবময় করতে চেয়েছিলাম। তাই আপনাকে "তুমি টুমি" বলেছি। তা রাগ করেন নি তো ? ঐ যে, ভদ্রলোক। সাইকেল-টাইকেল ফেলে দিয়ে পাগল হয়ে ছুটে আসছেন। হাসি পায় না ?

ভদ্রলোক এসে পড়লেন। চারু দু-পা এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলো। পেছনের দরজাটা খুলে দিয়ে চারু বলল : আসুন। —ভদ্রলোক গড়িমসি করে বললেন : আমি না হয় ড্রাইভারের পাশেই বসব'খন। চারু বলল : আপনি অতিথি। তা হয় না, আসুন। ভদ্রলোক উঠে বসতেই চারু নিজে গিয়ে তার পাশে বসে।প্রিয়কে বলল : এসো। ড্রাইভারের সামনে লাগান ছোট্ট আয়নাখানাতে প্রিয় দেখল, চারুর চোখে-মুখে একটা চপলতাময় কৌতুক-দৃষ্টি।

আর ভদ্রলোকের মুখখানা একেবারে আড়ষ্ট। চারু ভদ্রলোককে যথাসম্ভব দেহ দিয়ে চেপে রেখেছে।

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে প্রিয় জিজ্ঞাসা করল ঃ কোন একসময়ে নাকি স্বয়ং মদনমোহন নিজে ঐ দলমাদল কামান দিয়ে তোপ দেগেছিলেন ?

আড়ষ্ট দেহে জড়িত কণ্ঠে ভদ্রলোক বললেন ঃ তখন বর্গীর বড় অত্যাচার ছিল। সে ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের কথা। পলাশী যুদ্ধের তখনও পনের বছর বাকী। ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুর অবরোধ করেছিল। তাকে কিছুতেই প্রতিরোধ করা যায় না। রাজসিংহাসন, নগরজীবন সবই বিপন্ন হয়ে উঠল। ধন-মান-প্রাণ সবই যায়। রানী মদন মোহনের মন্দিরে গিয়ে 'হত্যা' দিলেন। জ্ঞান হতে দেখলেন, মদন মোহনের আসন শূন্য। এদিকে রাজশক্তি দেখল, এক অজ্ঞাত পরিচয় জ্যোতির্ময় পুরুষ দল-মাদল কামান থেকে অনল বর্ষণ করছেন। বর্গী বিতাড়িত হোল, দেশ রক্ষা পেল। সকলে দেখল, সিংহাসনে আবার মদন মোহন ফিরে এসেছেন।

ভদ্রলোকের দিকে মুখ ফিরিয়ে চারু বলল ঃ শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দেয়। কিন্তু সেই মদন মোহনকেই আবার বিক্রী করে দেওয়া হোল ?

ভদ্রলোক ঃ সংসারে কত কিছু বন্ধক রাখার ইতিহাস শুনেছি। রাজা যুধিষ্ঠির নাকি স্ত্রীকে বন্ধক রেখেছিলেন। কিন্তু দেব-বিগ্রহ বন্ধক রাখার কথা যেমন অভিনব তেমনই বিচিত্র। তাই বুঝি পরিণামে বিষ্ণুপুর আর রক্ষা পেল না। ইতিহাসের পঙ্ককুণ্ডে নেমে গেল।

চারু বলল ঃ বিষ্ণুপুরের রাজা তাঁর নিজের দেব-বিগ্রহকে বন্ধক রেখেছিলেন। ষোল আনা ভাল মন্দ তার নিজের। কিন্তু ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভাগের স্ত্রীকে কী করে বন্ধক রেখেছিলেন ?

প্রিয়নাথ বলল ঃ বৈধতা নিয়ে দ্রৌপদী স্বয়ং এবং ভীমসেন প্রশ্ন তুলেছিলেন।

চারু বলল ঃ ভীমসেনের কথা ছেড়ে দাও। তাঁর উপযুক্ত অমন হিড়িম্বা থাকতে ভাগের পরিবার দ্রৌপদী থাকলেই বা কী আর গেলেই বা কী? কিন্তু আমি দেবতাদের চরিত্র ভাবলে অবাক হয়ে যাই। এতকাল পূজো-অর্চনা নিলি, ভারে ভারে ভোগ নৈবেদ্য খেলি, হাসি হাসি মুখে কত স্নানার্থ জল পানার্থ জল, আর তাম্বুলার্থ জল খেয়ে, ভক্ত যেই একটু বিপাকে পড়ল, অমনি নাচতে নাচতে বাগবাজারে চলে গেলি?

ভদ্রলোকের মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল। বেশ কিছুক্ষণ চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন ঃ ঠিক আপনাদের মত। আপনারা যেমন প্রবল কী একট আকর্ষণে রাতারাতি আজন্মের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে চলে যান।

ভয়ানক একটা বিস্ময়ে চারু ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালো। প্রিয়নাথও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। ভদ্রলোক বললেন ঃ অমন নিষ্ঠুরভাবে মায়ার বাঁধন কাটাতে পারেন বলেই তো আপনাদের এই মঙ্গলময়ী মূর্তি। হাতের শাঁখা আর মাথার সিঁদুর।

তারপরেই ভদ্রলোক বললেন ঃ ড্রাইভার রোখো। আসুন, সামনেই লালবাঁধ।—সকলে নেমে এলো। সামনে বর্ষার দিগন্ত-বিস্তৃত লালবাঁধের জলরাশি। আকাশে মেঘের আনাগোনা। পারে-পারে নর-নারীর দৈনন্দিন জীবনের নিত্যচিত্র। বৈচিত্র্যহীন। সবই আছে। কিন্তু রঘুনাথ বা লালবাঈ-এর কোন চিহ্ন কোথাও নেই। কবে না-কি একদিন ঐ লালবাঁধের পঙ্কোদ্ধার করতে গিয়ে কে উদ্ধার করেছিল শৃংখল। হাজার হাজার নরনারী এসে সেই শৃংখল দেখবার জন্য ভীড় করেছিল। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের অবাক হবার সুযোগ বড় কম; তাই মানুষ সম্ভব-অসম্ভব নানা জিনিষের মধ্যে অবাক হবার উপাদান খুঁজে বেড়ায়। শৃংখল দেখে তারা বললে, এই সেই লালবাঈকে বেঁধে ডুবিয়ে মারার শেকল। শেকল দিয়ে প্রমোদ-তরণীর সঙ্গে লালবাঈকে বেঁধে নাকি লালবাঁধের অতলান্ত জলরাশির

মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই চরম নিষ্ঠুরতার সাক্ষী দিতে ঐ নিস্প্রাণ শৃংখল এতদিন পঙ্ককুণ্ডে আত্মগোপন করেছিল। সত্যি হতেও পারে। সাক্ষীরা সকলের অজ্ঞাতে অমনি করেই আত্মগোপন করে থাকে। তারপরে একদিন সকলকে চমকিত করে চোখের সামনে এসে হাজির হয়। সেদিন বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। অপাপবিদ্ধ শিশুকেও সেই জলের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল। কে জানে, অনন্ত জলরাশির নীচে মানুষের সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে, সেই শিশু মাতৃঅঙ্ক খুঁজে পেয়েছিল কিনা। রাজা রঘুনাথও মুক্তি পাননি। রাণী চন্দ্রপ্রভা বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে রাজাকে হত্যা করেছিলেন। ধর্মান্তরের পাপ থেকে তার মহামুক্তি। যন্ত্রণার অবসান। সেদিন চন্দ্রপ্রভা স্বামীর প্রজ্বলন্ত চিতায় ধীর পদক্ষেপে উঠে গিয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ নরনারী দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখেছিল। শংখঘণ্টা বেজে উঠেছিল। উলুধ্বনি দিয়েছিল। চন্দ্রপ্রভা সতী হলেন। কিন্তু তিনি স্বামী-ঘাতিনী। তাই সেই শ্মশানঘাট 'পতিঘাতিনী সতী' নাম ধারণ করে আজও মানুষকে সেই কথা মনে করিয়ে দেয়।

এ কাহিনী বহু-কথিত। সকলের পরিচিত। তবুও প্রিয়নাথ আর চারুশীলা স্তব্ধ বিস্ময়ে কাহিনী শুনল। ভদ্রলোক চারুকে একটু একান্তে ডেকে বললেন: আপনার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।

চারু মনে মনে বেশ কৌতুক বোধ করল। কাছে এসে প্রিয়কে চুপি চুপি বলল: ভদ্রলোক নিরিবিলি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন। কী করব?

প্রিয়নাথ বলল: কী করবে, তা তুমি জান। তুমি কি আমার উপদেশ নিয়ে সব কাজ কর নাকি?

: বাঃ, আমি তো আপনার সঙ্গে এসেছি। আপনিই তো আমার অভিভাবক।

: তুমি কি অভিভাবকের মতামত নিয়ে মেলামেশা, কথাবার্তা বল নাকি?

: তাই বলে কোথাকার কে, জানা নেই শোনা নেই ; ডাকাডাকি করছে। প্রেম নিবেদন টিবেদন করবে নাকি কে জানে ?

: তুমি তো আগে-ভাগেই আমাকে তুমি টুমি বলে কাজ পাকা করে রেখেছ। তবুও আমার চোখের সামনে এই দিন দুপুরে যদি প্রেম নিবেদন করে, তবে ভদ্রলোকের প্রাইজ পাওয়া উচিত।

: তাহলে, ঐ খবরের কাগজের ভাষায় কী বলে ? ফুসলে নিয়ে যাওয়া ? তা পারবে না। কী বলেন ? তবে শুনেই আসি।

চারুশীলা এগিয়ে গেল। দুইজনে কথা বলতে বলতে এগিয়ে গিয়ে ক্রমে একটা বড় গাছের আড়ালে চলে গেল। ভদ্রলোক একবার প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বেশ খানিকক্ষণ ধরে দুজনে কথাবার্তা হোল। দুজনেই মোটামুটি গাছের আড়ালে। তবুও কিছু কিছু দেখা যায়। প্রিয়নাথ অন্যদিকেই তাকিয়েছিল। হঠাৎ এক সময়ে চোখ পড়াতে প্রিয়নাথ দিনের সুস্পষ্ট আলোতে কর্মব্যস্ত লালবাঁধের ধারে একটি দৃশ্য দেখে অন্ধকারে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। চারুশীলা একেবারে দুহাত বাড়িয়ে ভদ্রলোককে ধরে আছে।

প্রিয় ভাবল, চারু মুখে চুনকালি মাখে, থিয়েটার করে। সে নটী। দেহে তার রূপের সমারোহ ! মনেও তার অজানা কতরূপ। রূপে রূপে ছয়লাপ। এও বুঝি তার এক রূপায়ণ। কিন্তু তার মধ্যে তাকে নিয়ে টানাটানি কেন ? সে অভিনয় করে ঠিকই। কিন্তু অভিনয় তার পেশা নয়, নেশা। সেই নেশাতে তার চোখ আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তাও ঠিক। কিন্তু চৈতন্য বজায় থাকে।

প্রিয় একেবারে বিপরীত দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল। যা ঘটবে ঘটুক। কিন্তু তাকে যেন চোখ মেলে দেখতে না হয়। সংসারে কত কীই তো ঘটে। না দেখলে কোন সমস্যা নেই, যন্ত্রণা নেই।

একটু পরে পেছন থেকে ডাক শুনতে পেল, প্রিয়দা।

প্রিয়নাথ চারুর মুখের দিকে তাকাতে পারল না। সোজা গাড়ির কাছে গিয়ে দরজা খুলে ভেতরে বসে পড়ল। দরজা খোলাই থাকল। খোলা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বড় স্নিগ্ধ স্বরে চারু জিজ্ঞাসা করল: একবার ভেতরে গিয়ে বসতেও বললেন না? আমি তো আপনাকে ভরসা করেই এসেছি।

প্রিয় অন্যদিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল: দরজা খোলাই আছে।—চারু ভেতরে গিয়ে বসতে গাড়ী চলতে আরম্ভ করল। এক অস্বস্তিকর নীরবতার মধ্যে গাড়ী এগিয়ে যেতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ পরে ধরা-গলায় চারু জিজ্ঞাসা করল: ভদ্রলোক কি বললেন, জিজ্ঞাসা করলেন না তো?

প্রিয় বলল: দরকার বোধ করিনি বলে জিজ্ঞাসা করিনি।

: তা না হয় দরকার বোধ করেন নি। কিন্তু আমার দিকে একটু তাকিয়ে দেখবার দরকারও কি নেই? প্রিয়নাথ সে কথার কোন উত্তরই দিল না। হোটেলের দরজা পর্যন্ত সেই অখণ্ড নীরবতা বজায় থাকল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বিকেল থেকেই আকাশে একটু একটু মেঘ সঞ্চারের ভাব। হোটেলে পৌঁছে মনে হতে লাগল, বোধহয় বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করবে।

হোটেলের খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলে প্রিয়নাথ বিছানায় আধশোয়া হয়ে সারাদিনের ক্লান্তি দূর করার চেষ্টা করছিল। এ পর্যন্ত সে চারুর সঙ্গে একটি কথাও বলেনি। মনে মনে ভাবছিল, এইভাবে পাশাপাশি দুটি বিছানায় শুয়ে নির্বাক রজনী যাপন করা কম যন্ত্রণার কথা নয়। মানুষ যখন দশজনের সঙ্গে মিলেমিশে কথায় কথায় অস্থির হয়ে পড়ে, তখন একটু নিরালা জায়গার সন্ধান করে। তখন কিন্তু মানুষ ভাবতেও পারে না, নির্বাক হয়ে থাকার যন্ত্রণা কতখানি। প্রিয়নাথ সেই যন্ত্রণায় কাতর হতে আরম্ভ করেছে। এমন সময়ে হঠাৎ চারু এসে বলে বসল: আমি এই রাতের গাড়িতেই কলকাতা ফিরে যাচ্ছি।

প্রিয় অবাক হয়ে উঠে বসে বলল : রিজার্ভেসানতো কাল রাতের গাড়িতে ?

: সে রিজার্ভেশানে আপনি যাবেন। আমার বন্দোবস্ত আমি করে নেব। একখানা থার্ডক্লাসের টিকিট কিনে নিলেই হবে।

: তোমাকে আমি একলা ছেড়ে দেব কী করে ?

: আমরা তো আর কুলবধূ নই যে একলা একলা বাইরে বেরুলে মান-ইজ্জত নষ্ট হবে ?

: শাঁখা-সিঁদুরের ঘটা দেখলে অন্য রকম মনে হয় কিনা ?

: কথাটা বোধ হয় ঠিক হোল না। অন্যরকম মানে, কুলবধূ বলে মনে করেছিলেন—এই কথা বলতে চান ? তা মনে করলে আপনার ঐ বিনি-পয়সার টিকিটে আমার এমন একটা গৌরবময় পরিচয় দিয়ে, নিয়ে আসতে পারতেন ? তার চেয়ে বলুন, আমার এই ছলনাময় রূপটা আপনার বেশ কাজে লেগেছে।

প্রিয়নাথের ভয় হোল, হয়ত উত্তেজিত হয়ে আপত্তিকর কথা কিছু বলে বসবে। তাই নিজেকে সংযত করে পরিস্থিতি শান্ত করতে বলল : এখনও অনেক কিছু দেখবার বাকী থাকল কিনা, তাই বলছিলাম।

চারুর কপালে কয়েকটি রেখা দেখা দিল। সে জিজ্ঞাসা করল : কী দেখতে বাকী থাকল ?

: অনেক কিছু! দুর্গের গড়খাই, পাথর দরজা, বীর দরজা, মদন-গোপাল, মদনমোহন, কালাচাঁদ, শ্যামরায়, রাধাশ্যামের মন্দির, জোড় বাংলা, রাসমঞ্চ, পঞ্চরত্ন মন্দির, কৃষ্ণবাঁধ, যমুনাবাঁধ, শ্যামবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, আরও কত কী।

চারু ম্লান হেসে বলল : তবু ভাল। আমি ভেবেছিলাম— আমাকে নেড়ে চেড়ে দেখা বুঝি বাকি থাকল। তা যদি থাকে, তবে বলুন। আমার জন্য আপনার পয়সা-কড়ি খরচা হয়েছে।

হাজার হোক, কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথাতো আছে। নেমক-হারামী করতে পারব না।

রাগে দুঃখে ঘৃণায় প্রিয়নাথ মুখ ঘুরিয়ে নিল। চারু বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে প্রিয়নাথ তাকিয়ে দেখল, চারুর জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদা শেষ। সে যখন স্নান করতে ঢুকেছিল, সেই অবসরে চারু বিদায় নেবার প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছে। একদিক দিয়ে ভালই হোল। আসবার সময়ে সকলের দৃষ্টি কোনও ভাবে এড়িয়ে এসেছিল। ফেরবার সময়ে কারও নজরে পড়ে গেলে লজ্জার শেষ থাকত না। থিয়েটারের অভিনেত্রী নিয়ে বেড়াতে যাবার কোন কারণই সে বলতে পারত না। চারু সেই যন্ত্রণার হাত থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছে।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে চারু এসে উপস্থিত। সঙ্গে একটি লোক। তার স্যুটকেস এবং হোল্ডলটি ঐ লোকের মাথায় তুলে দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে গ্রীবা ঘুরিয়ে বলল: কিছু অপরাধ করে থাকলে ক্ষমা করবেন। আসি, নমস্কার।

প্রিয়নাথের মাথায় তখন রক্ত উঠেছে। সে বালিস থেকে মাথা তুলে জিজ্ঞাসা করল: সে ভদ্রলোকও আজ কলকাতায় যাচ্ছেন নাকি?

দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে চারু বলল: যদি যান, সেতো আমার সৌভাগ্য। এখনও কিছু সময় হাতে আছে। দেখি চেষ্টা করে, যদি ভদ্রলোক রাজী হন।

চারু যখন দরজার বাইরে পা দিয়েছে, তখন প্রিয় প্রায় চিৎকার করে বলে উঠল: আপনি আমাদের সঙ্গে অভিনয় করবেন কিনা, বলে যান।

বাইরে থেকেই চারু বলল: সেতো আমার পেশা।

: আর যেটা করে গেলেন, সেটা?

চারু বলল: সারারাত শুয়ে শুয়ে সেই বিচার করুন।—চারু চলে

গেল। বিতৃষ্ণায় প্রিয়নাথের মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকল। দরজাটা বন্ধ করে আবার এসে শুয়ে পড়ল। চারুশীলার সঙ্গে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। সে বন্ধন ছিঁড়ে ফেলা যাবে না। কলকাতায় ফিরে গিয়ে আবার তার সঙ্গে রিহার্সাল দিতে হবে। অন্তরঙ্গ হবার ভান করে অভিনয় করতে হবে। যতই তিক্ততা থাক, এর থেকে অব্যাহতি নেই। অভিনয়ের দিন এগিয়ে এসেছে। অভিনেত্রী বদল করবার আর সময় বা সুযোগ নেই। করতে গেলেও তার মধ্যে হাজার সমস্যা, সহস্র প্রশ্ন। অভিনয়টাই হয়ত মাটি হয়ে যাবে। এত পরিশ্রম করে, কত অর্থ ব্যয় করে হয়ত হাস্যকর পরিণতি হবে।

এক ঘণ্টা ধরে এতসব কথা ভাবতে ভাবতে দরজায় ভীরু করাঘাত। প্রিয়নাথ মনে মনে হাসল। লজ্জা-সরম জলাঞ্জলী দিয়ে সেই নারীকে আবার ফিরে আসতে হয়েছে। হয়ত সেই বাউণ্ডুলে লোকটাকে খুঁজতে গিয়ে ট্রেন ফেল করেছে। যদি তাই হয়ে থাকে, না হয় ষ্টেশনেই রাতটা কাটিয়ে দিত। এখানে ফিরে আসতে তার বিন্দুমাত্র লজ্জা হোল না? যে পথে সে পা বাড়িয়েছে তাতে লজ্জা না থাকলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু প্রিয়নাথের লজ্জা ঘৃণা সবই আছে। পুনরায় ঐ স্ত্রীলোকটির মুখোমুখি হতে সে একেবারে সংকুচিত হয়ে উঠল। সারাটা রাত পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে। যাবার আগে চারু বলেছিল, প্রিয় নাকি তাকে নেড়ে-চেড়ে দেখতে চায়। সে কথার পরে একখানা রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে—একথা মনে হতে প্রিয়নাথের মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। সে ভাবল, কিছুতেই দরজা খুলবে না। তাতে পরিণাম যাই হোক। ডাকাডাকিতে হোটেলের লোকজন ছুটে আসবে। হাসাহাসি হবে। লোকেরা কী ভাববে, কে জানে। চৌধুরী হোটেলে প্রিয় আর চারুর কী পরিচয় দিয়ে খাতায় নাম তুলেছে, তাও সে জানে না। ডাকাডাকি

হাসাহাসি হলে, সেসব প্রশ্ন উঠেও পড়বে। শেষ পর্যন্ত পুলিস এসে হাজির হবে কিনা—তাই বা কে জানে। এইসব হাজার চিন্তা করতে করতে দরজায় আবার ঘা পড়ল। আর দেরি না করে প্রিয়নাথ দরজা খুলে দিল। আর দরজা খুলে দিয়েই সামনে চৌধুরীবাবুকে দেখে খুব আশ্চর্য হলেও বিরাট এক সমস্যার হাত থেকে পরিত্রাণের আনন্দে তাকে ডেকে নিয়ে এসে পুনরায় দরজা বন্ধ করে দিল।

সংসারে চৌধুরীবাবুর অভ্যথনা পাবার সুযোগ বড় একটা হয় না। সে জীবনভোর প্রত্যাখ্যাত হতে হতে অপরাধ-বোধটাই জীবনের নিত্যসঙ্গী বলে ভেবে নিয়েছে। অতি সহজেই তার চোখে-মুখে অপরাধের ছায়া নেমে আসে। ঘরের মধ্যে এসে প্রিয়নাথের অনুরোধ সত্বেও না বসে অপরাধীর মত বলল : খুব অন্যায় হয়েছে। এত রাত্রে এসে আপনাকে ডাকাডাকি করেছি। কিন্তু উপায় ছিল না।

এতক্ষণে প্রিয়নাথের মনে রাগের বদলে আশংকা দেখা দিল। চারু যত অন্যায়ই করে থাক, যদি অমঙ্গল কিছু হয়ে থাকে? অম্বিকাদার ঘরে মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন সেই ফটোখানার কথা মনে পড়েছিল। সে চৌধুরীকে হাতে ধরে বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল : ব্যাপার কী? আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

: আমি ত কলকাতায় চলে যাব বলে ষ্টেশনে গাড়ির অপেক্ষায় ছিলাম। আমি জানতাম, আপনারা কাল যাবেন। হঠাৎ চারুকে দেখে আমি অবাক। আমি এগিয়ে যেতেই আমাকে এই মারে তো সেই মারে। আমি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করাতে একেবারে রেগে আগুন। তারপরে যদি আমি দুপুর রাতে আপনাকে ডাকাডাকি করে থাকি, অন্যায় করেছি? আপনিই বলুন না?

: আমি তো বলিনি, আপনি অন্যায় করেছেন? ঠিক আছে, আপনি বিশ্রাম করুন।

: বিশ্রাম করব কি? আমার কি মাথার ঠিক আছে? এর

মধ্যে আবার নতুন এক ছোকরা এসে জুটেছে। তার ঢং দেখলে আপনার পিত্তি জ্বলে যাবে।

চৌধুরীর কথায় যত অতিশয়োক্তিই থাক, এই কথাটি একেবারে সত্যি। নতুন ছোকরার কথায় প্রিয়নাথের পিত্তি সত্যি জ্বালা করে উঠেছিল। কিন্তু চৌধুরীর সঙ্গে সেসব আলোচনা চলে না। সে বলল : গাড়ি এতক্ষণ ছেড়ে চলে গেছে। আপনার আজ আর যাওয়া হবে না। কাল আমরা দুজনে একসঙ্গে যাব। তার আগে আমরা দ্রষ্টব্য জিনিসগুলো দেখে নেব।

দ্রষ্টব্য জিনিসগুলোর প্রতি চৌধুরীর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু এই সাদর আহ্বান তার কাছে বড়ই মধুর বলে মনে হোল। জীবনের অনিবার্য প্রয়োজন সেই শিশুকাল থেকে তাকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে হয়েছে। কিন্তু দস্যুবৃত্তির মানসিক বলিষ্ঠতা তার নেই। কাজেই অন্যলোকের ক্ষমা, দান, উদারতা প্রভৃতি বৃত্তিগুলোই তার বেঁচে থাকার পাথেয়।

প্রিয়নাথ পুনরায় বলল : দেখি, আপনার খাওয়া-দাওয়ার কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

চৌধুরী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল : না-না, এতরাত্রে আপনি খাবার জন্য ব্যস্ত হবেন না। একরাত্রি না খেলে মানুষ মরে না।

প্রিয়নাথ বলল : শুধু একরাত কেন ? না পেলে, মানুষ অনেক রাতই হয়ত না খেয়ে বেঁচে থাকে। মন্বন্তরে অমন কত বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া যে দেখেছি, তার শেষ নেই। না পেলেত, না খেয়ে থাকতেই হবে। কিন্তু তার আগে পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্নটা মীমাংসা করতে হবে।—এই কথা বলে প্রিয়নাথ বাইরে চলে গেল।

চৌধুরী ভাবতে লাগল, সংসারে কত রকমের মানুষই যে আছে! লোকে বলে, মেয়ে মানুষের রূপ। পুরুষ মানুষের রূপেরও শেষ নেই। কত-রূপ!

খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চৌধুরীবাবু এসে বসতেই প্রিয় বলল : আপনার তো ধূমপানের অভ্যেস আছে। কিন্তু আমি ও রসে বঞ্চিত। কাছেই দোকান। আপনি একটু কষ্ট করে নিয়ে আসুন-না ?

চৌধুরীবাবু তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করে বলল : না-না, সে তেমন কিছু নয়।

চৌধুরী প্রিয়নাথ অপেক্ষা বয়সে বেশ বড়। কলকাতায় পরিচয়ের পরে সামান্য কিছুদিন, যা-ছিল তা ছিল। কিন্তু এই বিষ্ণুপুরে ক্রমাগত ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে সে প্রিয়নাথের দিকেই পরিত্রাণের আশায় তাকিয়েছে। এইভাবে নিজের অজ্ঞাতে কখন যেন সে তাকেই অভিভাবকের স্থানে বসিয়ে ফেলেছে। গুরুজন-স্থানীয় এমন একজন লোকের কাছ থেকে ধূমপানের প্রস্তাবটা তার কাছে বুঝি অপরাধ বলে মনে হোল। তাই প্রিয়নাথ যখন কিছু টাকা সিগারেট কেনার জন্য এগিয়ে দিল, তখন চৌধুরী মাথা নীচু করে বলল : ঐখানে রাখুন।—অর্থ এই, ধূমপান কেনার টাকা সে নিজের হাতে গ্রহণ করতে পারবে না। প্রিয়নাথের রেখে দেওয়া টাকা সে অন্যদিকে তাকিয়ে গ্রহণ করে যথাসম্ভব অপরাধের বোঝা লঘু করে সে বেরিয়ে গেল। যতই লজ্জা হোক, চৌধুরীর চোখে মুখে এমন একটা তৃপ্তির আভাষ ফুটে উঠেছিল, তা দেখে প্রিয়নাথ ভাবল, রাজার ঐশ্বর্য হাতে তুলে দিলেও মানুষের চোখে-মুখে এতখানি তৃপ্তি ফুটে ওঠে না। চৌধুরীও ভাবল—এমন মানুষও সংসারে হয়! ঘুরে এসে চৌধুরী বেশ আরাম করে খাটের ওপরে বসে বলল : আমার জন্য আপনার কত কষ্টই না হোল!

: কষ্ট আবার কী ? আপনি আমার অতিথি।

: আমরা একটা মানুষ, আমরা আবার অতিথি! আপনি আমাদের জানেন না, তাই একথা বলছেন। পেটে অন্ন নেই, মাথায় আচ্ছাদন নেই, দেহে বস্ত্র নেই। পোষাক-আষাকের ভড়ং

চড়িয়ে মেয়ে মানুষের দালালী করি। জানি—লোকে আমাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। শুনেও কানে তুলি না।

ঃ ওসব বলে লাভ কী? ঘুমোন এবার।

ডানলোপিলো গদিটা হাত দিয়ে টিপে পরীক্ষা করে সে বলল ঃ এত আরামে শুলে কি ঘুম হবে? কিন্তু কী দুঃখ জানেন? যে মেয়ে মানুষগুলোর জন্য আমরা সমাজ হারিয়েছি, সংসার ছেড়েছি—সেই লোকগুলোও আমাদের মানুষ বলে মনে করে না। আপনিতো একজন বিচক্ষণ লোক। আমার এই কথাটা সত্যি কি না বলুন।

সান্ত্বনা দেবার জন্য প্রিয়নাথ বলল ঃ তা সবসময় সত্যি নয়।

ঃ আপনি ঐ বেইমানদের চেনেন না, প্রিয়দা। ওরা সাপের চেয়েও খল। আমার ঘরে স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে একটি রূপসা মেয়েমানুষ আছে। তাকেও দেখেছি। তারপর এই চারুর কথাই ধরুননা। ওর স্বামী বিদেশে থেকে চাকরি করত। একেবারে স্ত্রী-অন্ত প্রাণ। আর তোকেও বলি। এমন রূপ, একেবারে আগুনের খাপরা। তাই এই ভাঙ্গা ঘরে রেখে তুই কোন সাহসে··· ···অমন চাকরির মুখে আগুন।

প্রিয় সংকিত হয়ে উঠল। চারুর কাহিনী আরম্ভ হোল। এ কাহিনী একবার আরম্ভ হলে কোথায় গিয়ে শেষ হবে, কে জানে! সে বলল ঃ ওসব থাক। ওসব শুনে আমি কি করব?

চৌধুরী বলল ঃ ওর কথা না বলাই ভাল। সে এক মহাভারত। আমি তো একটা চাষার ছেলে। লেখা জানি না, পড়া জানি না। আমার বাবা ওদের জমিজিরেত চাষবাস করতেন। ওদের যুবতী বৌকে পাহারা দেবার জন্য বারান্দায় চাটাই বিছিয়ে শুয়ে থাকতেন। তা একদিন বাবা কোথায় গিয়ে ফিরতে পারলেন না। বারান্দায় শুয়ে পাহারার ভার পড়ল আমার ওপরে। আর সেইদিনই কাণ্ডটা ঘটল।

প্রিয়নাথ আর্তনাদ করে উঠল : আপনার পায়ে পড়ি, চৌধুরীবাবু। আপনি চুপ করুন।

চৌধুরী চুপ করল। প্রিয়নাথের বন্ধ চোখের সামনে ভেসে উঠল, অম্বিকাদার ঘরে মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন সেই ফটোখানা।

* * *

সংসারে এক রকমের মানুষ আছে, যারা যে কোন অনিবার্য ঘটনার মধ্যে কিছু না কিছু মঙ্গল খুঁজে বের করে। আর তাই দেখেই বলে, এই ভগবানের আশীর্বাদ। পুত্র বিয়োগ হলেও তার থেকে বড় বিপর্যয় কিছু হয়নি—এই তাদের সান্ত্বনা। গৃহদাহ হলেও বলে, ঐ সঙ্গে সকলে পুড়ে মরিনি, এই তো মঙ্গলময়ের আশীর্বাদ। প্রিয়নাথও প্রায় সেই জাতীয় মানুষ। তা এতো পুত্র-বিয়োগ নয়, গৃহদাহের মত ঘটনাও নয়। সামান্য একজন রমণী—শ্রীমতী চারুশীলা বিদায় নিয়েছে। এক নাটকীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সে তার সঙ্গ পরিত্যাগ করেছে। সে আসঙ্গ প্রিয়নাথ কামনা করে আদায় করেনি। একটা নাটকে অভিনয় করতে এসে দুদিনের পরিচয়ে চারুশীলাই প্রিয়নাথের সঙ্গ কামনা করেছিল। ভালমন্দ বিবেচনা না করে সে রাজী হয়েছিল। শুধু সঙ্গ দিতে সঙ্গী নয়। জীবনে যা কোনদিন করেনি তাই করে বসল। নিজে বিয়ে করেনি। পরস্ত্রীকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে নিয়ে যাবার জন্য রেল ভ্রমণের পাস নিল। পাস-বাবু সদাশিবন জানত, প্রিয়নাথ অবিবাহিত। সস্ত্রীক পাসের দরখাস্ত দেখে সদাশিবন ভেবেছিল, সকলের অজ্ঞাতে প্রিয়নাথের বিয়ে-পর্ব সমাধা হয়েছে। সে ভোজ দাবী করেছিল। প্রিয়নাথও ভরসা দিয়েছে। কিন্তু মিথ্যাচারের অপরাধ-বোধে মনটা বিষণ্ণ হয়েছিল। যে মিথ্যাচার করল তাও পুরোপুরি কাজে লাগল না। বিষ্ণুপুর যাবার পথে সত্যি হোক মিথ্যে হোক, স্ত্রী পরিচয়ে একজন নারী তার সঙ্গে ছিল। কিন্তু ফেরার পথে সে একা। মনের মধ্যে সেই অপরাধীর পরিতাপ।

তা সেই চারু যখন হোটেলের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তখন অত ঘৃণা আর অত লজ্জার মধ্যেও সে একটি সান্ত্বনা খুঁজে বের করল। হাওড়া ষ্টেশন থেকে যখন চারুকে নিয়ে রওনা হয়েছিল, তখন দৈবাৎ কারও নজরে পড়েনি। পড়লে থিয়েটারের নটী নিয়ে বেড়াতে যাবার কী কৈফিয়ৎ দিত কে জানে! ফেরার পথেও সে আশংকা ছিল। চারু নিজে থেকে চলে গিয়ে প্রিয়নাথকে সে বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। চারুর সাহচর্য আর তাকে বিড়ম্বিত করবে না—এটাই একটা মঙ্গল। অনেক ভেবে-চিন্তে স্থির করেছিল, আবর্জনা দূর হয়েছে।

প্রভাতে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় দেখল, পাশের শয্যায় চৌধুরীবাবু শুয়ে আছে। চারুশীলা তার শয্যাসঙ্গিনী নয়। প্রতিদিন ঘুম-ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে সে চারুশীলার মুখ দেখে না। প্রতিদিন কেন? কোনদিনই নয়। একদিন শুধু গাড়িতে ঘুম ভেঙ্গে চারুকে দেখেছিল।

প্রিয়নাথের মনে হোল, আবর্জনা দূর হয়েছে। আবর্জনা বলে মনে করা যতটা সহজ, দূরে ফেলে দেওয়া ততটা সহজ নয়। একটা সংসারে আবর্জনা ভেবে কত জিনিষ স্তূপাকার হয়ে পড়ে থাকে, কিন্তু প্রাণে ধরে ফেলা যায় না। তার পরে দেখা যায়, সত্যিই একদিন আবর্জনার স্তূপ থেকে প্রয়োজনের কোন জিনিস বেরিয়ে আসে।

ঘুমোবার আগে যে চারুশীলাকে আবর্জনা বলে মনে হয়েছিল, ঘুম ভেঙ্গেই সেই চারুর অভাবে প্রিয়নাথের আগামী দিনটা বিরস হয়ে উঠল। একটি রাত্রের ব্যবধানে তুইটি দিনের মধ্যে অনেক প্রভেদ। তবুও দিনটা কাটাতে হবে। গাড়ি সেই সন্ধ্যেবেলা। চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে দ্রষ্টব্য স্থানগুলো দেখতে হবে।

ট্যাকসিওয়ালা প্রথমেই সেই মুণ্ড-মালাঘাটে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। কোথায় মুণ্ড কোথায় কী? কোথাও কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই। কোন এক বিস্মৃত অতীতে সেই দায়ুদ খাঁ ধেয়ে এসেছিল।

জ্বলন্ত পাবকশিখা দেখে পতঙ্গ যেমন আসে তেমনই। তারপর সবকিছু নিঃশেষ করে রিক্ত সর্বহারা হয়ে ফিরে গিয়েছিল। বিষ্ণুপুররাজের সে এক গৌরবময় অধ্যায়। কিন্তু কোথায় গেল সেই গৌরব? সে গৌরবেরও কোন চিহ্ন নেই। তিনিও নিঃস্ব হয়ে শেষ হয়ে গিয়েছেন। তাঁরই কোন এক বংশধর গৃহ-বিগ্রহকে বিক্রী করে দিয়েও শেষ-রক্ষা করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত রাজ্যটাই বিক্রী করে দিলেন বর্ধমান মহারাজার কাছে। বর্ধমান মহারাজা হয়ত ভেবেছিলেন, ঐ রাজ্যটা পেলে, "দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান হইবে টানা।" কিন্তু সে বর্ধমান মহারাজার রাজত্বেরও না আছে দৈর্ঘ্য না আছে প্রস্থ। সব শেষ। আর সেই মদনমোহন? তিনি গেলেন বাগবাজারে মিত্তিরদের বাড়িতে। মিত্তিরদের তখন খুব বাড়-বাড়ন্ত। মদনমোহনের আশীর্বাদেই নাকি ঐশ্বর্য উপচে পড়েছিল। সেই মদনমোহন তো আজও সেখানে ভোগ-রাগ নৈবেদ্য গ্রহণ করে যাচ্ছেন। ঘি এর প্রদীপ, সুগন্ধি ধূপ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে আজও আরতি করা হয়। কিন্তু অত ঐশ্বর্য কোথায় গেল? মদনমোহনের চোখের সামনেই তো সেসব অন্তর্ধান ঘটে গেল। তবে কি দেবতার আগমনে ঐশ্বর্য আসে, না ঐশ্বর্য দেখে দেবতার আগমন হয়? তারপর যেদিন সম্পদ শেষ হয়ে যায়, সেদিন দেবতা অন্তর্ধান করে নতুন ধনাগারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তাহলে বুঝি ঠাকুর-দেবতাকে ডাকাডাকি করলে আর যাই পাওয়া যাক ধনসম্পদ পাবার সম্ভাবনা নেই? তাঁদের আগমন নির্গমনে টাকাকড়ি যাতায়াত করে না?

প্রিয়নাথের দেশের বাড়িতে অনেক পায়রা ছিল। প্রিয়নাথের বাবা শক্তিধর হরিদয়াল সরকারকে বলতেন, যতদিন পায়রাগুলো আছে, ততদিন সুদিন। যেদিন পায়রাগুলো থাকবে না, সেদিন বুঝতে হবে, দুর্দিনের আর দেরি নেই। তারপর শক্তিধর ভট্টাচার্য্য হরিদয়াল সরকারকে তার সংসারের ইতিহাস শোনাতেন। শক্তিধরের

উপার্জন-ক্ষম বড় ভাই গত হলেন, ছোটভাইও তাই। ছোটভাই পুলিসে বড় চাকরি করতেন। একদিন তিনি একটা ডাকাতের দল ধরে ফেলেছিলেন আর তাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন অগাধ ঐশ্বর্য্য। সেই সম্পদ ঘরে এনে বিবাহ করেছিলেন। অপরূপ রূপবতী স্ত্রী। বিয়ের রাত্রে শয্যা নিলেন। সেই শয্যাই শেষ শয্যা। কোথায় গেল সম্পদ, কোথায় গেল কি। শক্তিধরের বিধবা বোন ছিল, নাম মনোমোহিনী। তিনি অভিমান করে এক তাল গোবর ফেলে দিয়ে গৃহ দেবতা নারায়ণ শিলাকে ঢেকে ফেলেছিলেন। পরে সেই গোবরের তাল ঘাঁটাঘাঁটি করে নারায়ণকে আর পাওয়া যায় নি। গোবরের অন্তরাল থেকে নারায়ণ অন্তর্ধান করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে পায়রাগুলো। তারপরে শক্তিধরের সংসারে সে কী দুর্দিন। হরিদয়াল সরকার বসে বসে সেইসব ইতিহাস শুনতেন। হরিদয়াল সরকার সেই তুলসীর পিতৃদেব। সপ্তম এডওয়ার্ডের আমলে সরকারী চাকরি করতেন। তখনকার দিনে কোন অন্যায় উৎপীড়ন হলে লোকেরা পরলোকগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নাম স্মরণ করে সুবিচার প্রার্থনা করত। এ সেই আমলের সরকারী চাকুরে। মাসে ষাট টাকা করে পেন্সন পেতেন। তিন টাকা হলে একজন লোকের সারামাস খাওয়া হয়ে যেত। সেই আমলে ষাট টাকা পেন্সন। এত টাকা পেয়েও হরিদয়াল সরকার মিথ্যে কথা বলতে পারতো না। তার জন্য গ্রামের লোকেরা বোকা বলে ঠাট্টা তামাসা করত। মিথ্যে কথা বলতে না পারলে, সে বোকা—একথা চিরদিনের সত্য। এমন একটি বোকা মানুষের ছেলে তুলসী। সে প্রিয়বালাকে চিঠি লিখে দিত। কিন্তু তার লেখা চিঠিতে প্রিয়বালার প্রবাসী স্বামী আসেনি। প্রিয়বালা এমন সব বিশ্রী কথা চিঠিতে লিখতে বলত—তা তুলসী লিখতে পারত না। কিন্তু প্রিয়নাথ লিখেছিল। প্রিয়বালা যেমন যেমন বলেছিল সব কথা লিখেছিল। আর চিঠি পেয়েই জামাই ছুটে এসেছিল। প্রিয়বালা

গদগদ হয়ে তার গোলগাল পানভর্তি মুখখানাতে হাসির রেখা টেনে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল—ঠাকুর, তোমার কলমের জোর আছে। কিন্তু জোরটা কিসের তা জানেন বিধাতা।

মুণ্ডমালা ঘাটে বসে এতকথা চিন্তা করা চলে? চৌধুরী দীর্ঘ নীরবতায় একান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সে বলল, আচ্ছা প্রিয়দা, দায়ুদ খাঁ তো অন্য সম্প্রদায়ের লোক। তার সৈন্যগুলোও নিশ্চয়ই ভিন্ন ধর্মের ছিল। কিন্তু তাদের মুণ্ড দিয়ে মাকালীর মুণ্ডমালা তৈরি হল কী করে?

প্রিয় হেসে বলল: দায়ুদ খাঁর সৈন্যেরা সব ভিন্ন ধর্মের ছিল, একথা বলা যায় না। তারা সব নিজের সম্প্রদায়ের লোক দিয়ে এদেশটা জয় করেছে, একথা সত্যি নাও হতে পারে। আর হলেই বা কী? ও নামটার মূল্য কতটা? সত্যি কি আর মুণ্ড দিয়ে মালা তৈরি করেছে, না করবার কোন পরিকল্পনা ছিল? তাছাড়া ভগবানের কাছে সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ কিছু নেই।

চৌধুরীবাবুর মুখে বড় সুন্দর একটা হাসি ফুটে উঠল। সে বলল: একটা কথা শুধু চারুশীলা জানে, আর কেউ জানে না। সে কাউকে বলবেও না। কিন্তু আমি আপনাকে বলব। আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে। কেবল 'প্রিয়দা' বলে ডাকতে ইচ্ছে করে।

প্রিয়নাথ চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার সরলতায় হেসে ফেলল। চারু বলেছে, প্রিয়নাথ নামটার মধ্যে নাকি যাদু আছে। বারবার ঐ নাম ধরে তার নাকি ডাকতে ইচ্ছে করে। প্রিয়বালা ও এই নামটা নিয়ে কী ফাঁপরে ফেলেছিল। রানী বৌদিও এক বিচিত্র কথা বলেছিল। নন্দদুলালদার স্ত্রী রানী বৌদি। প্রিয়নাথ বলেছিল, আমি তো এখন সকলের ছোট। তা আমাকে ছোট ঠাকুরপো বললেই হয়? তা রানী বৌদি বলেছিল, অন্য নাম হলে তাই বলতাম। কিন্তু প্রিয় ঠাকুরপো বললে 'মাই ডিয়ার ঠাকুরপো'

বলার আনন্দ আস্বাদন করা যায়। বিন্দু মাসীমার ছেলে নন্দদুলালদা। তার স্ত্রী রানী বৌদি। সেও এক বিচিত্র কাহিনী। তা পরের কথা পরে।

বিষ্ণুপুরে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময়। এর মধ্যেই সবকিছু দেখে নিতে হবে। কিন্তু উৎসাহ বড় একটা নেই। কাল ছিল, আজ আর নেই। কাল আর আজের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান। তা না থাকলেও সময়টা কাটাতে হবে। ট্যাক্সী তো আছেই। হুকুম করলেই ছুটতে আরম্ভ করবে। ড্রাইভারটি কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলে না। তারও যেন উৎসাহ কমেছে বলে মনে হয়। তা সোয়ারী দেখে উৎসাহ কমে-বাড়ে বই কি! উৎসাহ কম থাক আর বেশী থাক, এক একটা বিরাট জলাশয়ের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে লাগল। তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম। কিন্তু আকৃতি বা প্রকৃতিতে ব্যতিক্রম বড় বেশী কিছু নেই। তবে জলাশয়ের নিজস্ব একটা সৌন্দর্য্য আছে। কোনটার নাম কৃষ্ণবাঁধ, কোনটার নাম যমুনা বাঁধ, কোনটার নাম শ্যামবাঁধ, আবার কোনটার নাম কালিন্দী বাঁধ। প্রত্যেকটি নামের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির নিদর্শন। একমাত্র ব্যতিক্রম লালবাঁধ। একেবারে বিষ্ণুপুরের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে মূর্তিমান বিদ্রোহ। রাজা রঘুনাথের কী মতিভ্রম হয়েছিল। বিষ্ণুপুর রাজবংশের সংস্কৃতির ধারাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেছিলেন। বর্তমান বিষ্ণুপুরে শ্যামবাঁধ, আর লাল বাঁধের মধ্যে পার্থক্য কিছু নেই। সকল বাঁধে মানুষের সঙ্গে গো-মহিষের সহাবস্থান। সকলে মিলে মিশে এক সঙ্গে স্নান করে, রজক কাপড় কাচে, স্ত্রীলোকেরা ঘড়া ভর্তি করে জল নেয়। অবস্থা দেখে মনে হয়—পৃথিবীর যাবতীয় রজক সার্বজনীন পরিচ্ছন্নতার প্রতিযোগিতায় বাঁধগুলোর ধারে সমবেত হয়েছে। অতীত দিনের সকল গৌরবের অহংকার স্থগিত রেখে এবং সংস্কৃতি গচ্ছিত রেখে নব্য ধারার অববাহিকায় যাবতীয় গো-মহিষ ইত্যাদি চতুষ্পদগণ মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। তা দেখে

প্রিয়নাথের মন ভরে না। সে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, ধলেশ্বরী অনেক দেখেছে। জলাশয় দেখে আহামরি বলে লুটিয়ে পড়ে না।

এবার সে গিয়ে হাজির হোল জোড় বাংলার চত্বরে। নামটি সার্থক। একজোড়া ইঁট দিয়ে গাঁথা দোচালা ঘর। চেহারা ঠিক বাংলার কুটিরের মত, কিন্তু সম্পূর্ণ ইটের। আর তার গায়ে পোড়া মাটির সব শিল্প কাজ। সেসব শিল্প-কাজের মধ্যে নানা দৃশ্য ফুটে উঠেছে। তার মধ্যে একটি নৌযুদ্ধের দৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাবতে অবাক লাগে, বিষ্ণুপুরে নৌযুদ্ধের পরিকল্পনা কী করে হোল। জলপথে বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণের কিছু সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না। বিষ্ণুপুরে কৃত্তিম বারিরাশি দিয়েই জলের সাধ মেটান হয়েছে। তবুও শিল্পের মধ্যে নৌযুদ্ধের দৃশ্য। যবদ্বীপের কোন মন্দিরে নাকি অনুরূপ দৃশ্য আছে। জল-বেষ্টিত যবদ্বীপে যা আছে তা স্বাভাবিক। বিষ্ণুপুরের জোড়-বাংলাতে শিল্পীর কল্পনা ফুটে উঠেছে। কোনটি কার অনুকরণ কে বলবে? বলবে জ্ঞানীজনেরা। প্রিয়নাথ অত কথা জানে না।

চৌধুরীবাবু জোড় বাংলা দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু মদনমোহনের মন্দিরে কিছুতেই যায়নি। বাইরে বসে থাকল। বলল: আপনি যান, প্রিয়দা। আমি যাব না। পরে আপনাকে বলব। শুধু আপনাকেই বলব। চারু জানে। কিন্তু সে বলবে না। আর কেউ জানেও না। তা প্রিয়নাথ একাই গিয়েছিল মদনমোহনের মন্দির দেখতে। সে আদি মদনমোহন তো নেই। তিনি তো অন্যত্র গিয়ে বসে আছেন। প্রিয়নাথের মনে পড়েছিল, ছেলেবেলায় পড়া সেই কবিতা—'সিংহগড়ের সিংহ গিয়েছে পড়ে আছে শুধু গড়।'

তা মদনমোহনের মন্দিরের গায়েও সেইসব পোড়ামাটির কাজ। কত শতাব্দীর অবক্ষয়ের রক্তচক্ষুকে এড়িয়ে এই সব শিল্পকাজ আজও টিঁকে আছে। কালাচাঁদের মন্দির, রাধাশ্যামের মন্দির, রাসমঞ্চ, মদন গোপালের মন্দির সবই একে একে ঘুরে প্রিয়নাথ

দেখল। চৌধুরী সবই দূর থেকে দেখল। সর্বত্রই বাংলার হিন্দু-সংস্কৃতি ও প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। দেখে প্রিয়নাথ বুঝল, এক সময়ে বিষ্ণুপুর বাংলার প্রাণকেন্দ্র ছিল। প্রিয়নাথ আরও ভাবতে লাগল, বর্তমানে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের আধার আর বাংলা ভাষা নয়। বাঙ্গালীরাও শাস্ত্রীয় সংগীতে হিন্দী ভাষা ব্যবহার করে না। বাংলা ভাষায় নাকি তত মাধুর্য আসে না। কিন্তু এই বিষ্ণুপুরেই সংগীত চর্চার একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তার নাম 'বিষ্ণুপুর ঘরাণা'। সংগীতাচার্য যদুভট্ট আর রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী সেই ঘরাণার সংগীতচর্চায় চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। সকলের শেষে রাসমঞ্চ থেকে নেমে এসে চৌধুরী বলল: এখানকার শাঁখা খুব বিখ্যাত। সিল্কের শাড়ীও খুব ভাল। আর শুনেছি তুলসীর মালা খুব ভাল পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরে এইসব সম্ভারের প্রাচুর্যের সংবাদে প্রিয়নাথের উৎসাহ বোধ করবার কোন কারণ নেই। বিশেষতঃ তুলসীর মালার উৎকর্ষতার সংবাদে তার বেশ হাসি পেল। তুলসীর মালা সে দেখেছে। সরু মোটা নানা রকমের দেখেছে। নতুন থাকতে রংটা সাদা থাকে। ক্রমে শরীরে তেল ইত্যাদি ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে গলায় আঁটা মালাটিও কালো হয়ে যায়। কীর্তনের আসরে ভক্তগণ যখন ভক্তির আবেগে ঊর্ধমুখ হয়ে উচ্চ-কণ্ঠ প্রকাশ করেন, তখন গলার শিরাগুলো এমন স্ফীত হয়ে ওঠে যে, মনে হয় ঐ মালা বুঝি ছিঁড়েই যাবে। সেই দৃশ্য মনে পড়তেই প্রিয়নাথ বলল: বিষ্ণুপুরে এসেছি; কিছু চিহ্ন নিয়ে যাই। দুগাছা মালা নিয়ে আসুন। তাই পরে দুজনে কলকাতায় ফিরে যাই। ভক্তির নিদর্শন থাকবে।

চৌধুরী বুঝতে পারল, কথাটা উপহাসের। সে বলল: আমি তুলসীর মালার কথাটা এমনি বললাম। তবে ঐ শাঁখা আর শাড়ীর কথাটা ভিন্ন। চারু নতুন শাঁখা পরতে খুব ভালবাসে।

আর এখানে আসবার আগের দিন কথায়-কথায় বলেছিল, বিষ্ণুপুরে গেলে শাড়ী আনব।

প্রিয়নাথ বিস্মিত হয়ে চৌধুরীর মুখের দিকে তাকাল। অস্তগামী সূর্যের শেষ আভা এসে চৌধুরীর মুখে পড়েছে। তার মুখখানা বড়ই বোকাবোকা দেখাল। প্রিয় ভাবল, এই লোকটির মান-অপমান বোধ বলেও কোন জিনিস নেই। সেই স্ত্রীলোকটি আগেরদিন সন্ধ্যেবেলা যারপরনাই অপমান করেছে—একথা সে নিজেই বলেছে। তারপরে এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে তাকে শাঁখা আর শাড়ী উপহার দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। কথাটি নিতান্তই আপত্তিকর তা জানে বলেই মুখখানা বোকাবোকা করে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রিয় মনের মধ্যে একটা ব্যাকুলতা বোধ করল। মনকে প্রবোধ দিল এই ভেবে যে, এই ব্যগ্রতা চৌধুরীর জন্য। পকেটে হাত দিয়ে কিছু টাকা বার করে চৌধুরীর দিকে এগিয়ে দিল। চৌধুরীর মুখখানা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। সে চিৎকার করে বলল: ও প্রিয়দা, আমাকে দিলেন কেন? আমি কি কিছু চিনি, না জানি? যা হয় আপনি কিনে দিন।

প্রিয়নাথ ততক্ষণে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেছে। মুখ না ঘুরিয়েই জবাব দিল: যা হয় আপনি করুন।

* * *

কলকাতার গাড়ি ছাড়তে বড় একটা দেরি নেই। চৌধুরীবাবু ফার্স্টক্লাসে যেতে কিছুতেই রাজী হয়নি। প্রিয়দাকে অর্থদণ্ড করাতে সে প্রস্তুত নয়। রাজী থাকলে প্রিয়নাথকে পয়সা দিয়েই ফার্স্টক্লাসের টিকিট কিনতে হোত। চৌধুরীবাবুর পরিচয় আর যাই হোক, শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। একখানা থার্ডক্লাসের টিকিট নিয়ে সে যথাস্থানে ছিল। প্রিয়নাথ ফার্স্টক্লাসের একটা কুপেতে একলা বসেছিল। গাড়িতে খুব আলোর জোর ছিল না। সেই মৃদু আলোতে দেখল, এক ভদ্রলোক

তার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখে চোখ পড়তেই ভদ্রলোক মৃদু হেসে প্রিয়নাথকে প্রণাম করল। এতক্ষণে সে চিনতে পেরেছে। অতি ভক্তির ঘটা দেখে তার যেমন বিস্ময় হয়েছে, তেমনই বিরক্তিতে মনটা তিক্ত হয়ে উঠল। এর সঙ্গেই চারুশীলাকে গাছের আড়ালে হাত ধরে টানাটানি করতে দেখেছে। প্রকাশ্য দিবালোকে লোকচক্ষুর সামনে তারা এই বিরূপ আচরণে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি। তাই দেখে দিনের আলোতে অন্ধকারে ভূত দেখার মত বিস্ময়ে প্রিয়নাথ চমকে উঠেছিল। এরই সঙ্গলাভের প্রত্যাশায় চারু কাল সন্ধ্যায় হোটেলের ঘরে নাটকের দৃশ্য রচনা করেছিল। তারপরেই চব্বিশ ঘণ্টাও পার হয়নি। এরই মধ্যে সেই নির্লজ্জ পুরুষটি গদগদ হয়ে ভক্তি নিবেদন করতে এসেছে। প্রিয়নাথ ভাবল, চরিত্র বলে জিনিষটি অন্তর্ধান করলে মানুষের মনুষ্যত্ব আর বাকী কিছু থাকে না। লজ্জা ঘৃণা সবই যায়। এক একটা মানুষের কত-রূপ। দেখে মন জুড়োয়।

প্রিয়নাথ কথা না বলে লোকটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার রূপের সন্ধান করতে থাকল। আগন্তুক বলল : কাল দিদিকে গাড়িতে তুলে দিলাম। তিনি আমাকেও সঙ্গে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি যেতে পারলাম না। মাষ্টারী চাকরি ; ছেলেদের পরীক্ষা।

মাষ্টারী বলতে প্রিয় ভাবল, কোন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক বুঝি। একটু অবজ্ঞার সুরেই জিজ্ঞাসা করল : কোন স্কুল ?

ভদ্রলোক একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজের নাম বলায় প্রিয়নাথ নড়ে-চড়ে বসে বলল : আপনি বসুন।

: আপনি আজ্ঞে বললে আমি বসতে পারব না, জামাইবাবু।

প্রিয়নাথ আকাশ থেকে পড়ল। এ আবার কী বিচিত্র সম্বোধন। পারিবারিক না-না সম্পর্কের জটিলতায় সে নানারকম সম্বোধন লাভ করেছে। এমন কি, ঠাকুর্দা পর্যন্ত হয়েছে। তাতে সে অভ্যস্ত। কিন্তু জামাইবাবু অত সহজে হওয়া যায় না। ও সম্বোধন পেতে

হলে সর্বপ্রথম যা দরকার, তা কোথায়? সম্পর্কটি মধুর হলেও সহজলভ্য নয়। সেই জিনিষ এত অনায়াসে পেয়ে প্রথমে সে বিচলিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করতেও দেরি হয়নি। জামাইবাবু সম্বোধনটি যতই মধুর হোক, বিপরীত সম্বোধনটি সত্যি না হলে, বিপদের আশংকা। তার মনে পড়ল, ভদ্রলোক প্রথমেই বলেছেন যে, তিনি তাঁর দিদিকে কাল গাড়িতে তুলে দিয়েছেন। তারপরেই আজ জামাইবাবুকে তুলে দেবার পালা। কীভাবে কে জানে, চারুশীলা তার দিদি—একথা বোঝা গেল। এও বোঝা গেল—সেই সূত্রে প্রিয়নাথ জামাইবাবু হয়েছে। এই কথা চিন্তা করে সে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। চারুশীলা জন্ম জন্ম ধরে লক্ষ কোটি মানুষের দিদি হয়ে বিরাজ করতে থাকুক। কিন্তু সেই সূত্র ধরে সে জামাইবাবু হতে পারবে না। অবশ্য লোকজন ডাকাডাকি করলে প্রিয়নাথের অস্বীকার করবার পথ নেই। চারুশীলার সঙ্গে তার সম্পর্কটা লেখা রয়েছে তার চাকরীস্থলের পাসের মধ্যে। সে পাসখানা তার পকেটেই রয়েছে। প্রত্যাখ্যানের সব অধিকার সে হারিয়ে ফেলেছে! তাই কুইনিন গেলার মত 'জামাইবাবু' ডাকটি গিলে ফেলে বলল: আচ্ছা না হয় বলছি, 'বোস'।

ভদ্রলোক বসে বললেন: কাল দিদিকে জিজ্ঞাসা করলাম, জামাই-বাবু এলেন না কেন? তা দিদি বললেন, তোমার জামাইবাবু শিল্পী। অতবড় অভিনেতা, বিষ্ণুপুরের সব শিল্পকাজ না দেখে তিনি যাবেন না।

প্রিয়নাথ মনে মনে ভাবতে লাগল, চারুশীলার এ আবার দাম্পত্য জীবনের কী বিচিত্র বিলাস! রাস্তার লোককে ডেকে-ডেকে নারী জাতীর পবিত্রতম সম্পর্কটি পাতিয়ে রসিকতা সৃষ্টির এই হাস্যকর চেষ্টার কোন অর্থ সে খুঁজে পেল না। চৌধুরী বলেছে, তার স্ত্রী-অন্ত-প্রাণ স্বামী ছিল। কিন্তু সে স্বামীর ঘর সে করতে পারে নি।

স্ত্রী-অন্ত-প্রাণ স্বামী ভাঙ্গা ঘরে আগুনের খাপরা রেখে বিদেশে চাকরি করত। তারপর একদিন বুঝি সেই খাপরা থেকে আগুনের ফুল্‌কি বেরিয়ে সেই ভাঙ্গাঘর পুড়েছে। সেই আগুনের শিখা দিক থেকে দিগন্তরে কতখানি ছড়িয়েছে, তা প্রিয়নাথ জানে না। সেকথা সে চৌধুরীকে বলতে দেয়নি। গৃহদাহের অগ্নিশিখার ইতিহাস যদি কিছু থাকে, তবে তা প্রিয়নাথের অজানাই থাক। তারপরে আবার চারুর নাকি শাঁখা পরার শখ। তা না-কি আবার বড় কর্তার বিচিত্র অভিলাষ। তিনি নাকি তাকে শাঁখা-পরা দেখতে ভালবাসেন।

প্রিয়নাথ চৌধুরীকে টাকা দিয়েছে। সেই টাকা দিয়ে চৌধুরী শাঁখা আর শাড়ী কিনে ভিন্ন গাড়ীতে বসে বসে কী স্বপ্নজাল রচনা করে চলেছে, তা প্রিয়নাথ জানে না।

পেশাতে অধ্যাপনা বলেই বোধ হয়, ভদ্রলোক সময় সম্বন্ধে সচেতন। বারবার ঘড়ি দেখা তার অভ্যেস। তিনি বললেন: গাড়ি ছাড়বার সময় হোল। এবার উঠি। দিদি কাল বলেছিলেন, তোমার জামাইবাবু বড় ভুলো মানুষ। তাঁকে কাল গাড়িতে ঠিকমত বসিয়ে দিও। আমি হোটেলে গিয়ে দেখি, আপনি বেরিয়ে পড়েছেন। তাই তাড়াতাড়ি এখানে চলে এসেছি।

ঠিক পতি-পরায়ণা স্ত্রী যেমন হয়, সেই রকম কথাবার্তা। কিন্তু একেবারে মিথ্যে—যা সত্যি হবার কোন সম্ভাবনা নেই, যা সত্যি হতে নেই, চারুশীলা তাই নিয়ে বিলাস করতে চায়। এই উড়ে এসে জুড়ে বসা ভদ্রলোক কী করে তার ভাই হয়ে বসল, তাই বা কে জানে! এই ভ্রাতৃত্ব কত দিন বজায় থাকবে, তার ঠিক কি! প্রিয়নাথের এক আত্মীয়—তার নাম সুবিনয়। তার আচার-বিচারেও কত বিনয় ছিল। নীলিমা বলে একটি মেয়েকে দেখে সে এমন অভিভূত হয়েছিল, তাকে 'মা' বলে ডাকল।

ক্রমে মায়ের থেকে 'দিদি'। তারপরে অন্তরঙ্গতা যখন চরম শিখরে উঠল, তখন সুবিনয় সেই নীলিমাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল

হয়েছিল। তা সুবিনয় পাগল হলেও নীলিমার উন্মাদিনী হতে তখনও বাকী ছিল। মেয়েটির বিরূপ মনোভাবে সুবিনয় ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিশোধের জন্য কোন পথ খুঁজে পায়নি। প্রিয়নাথকে পাঠিয়েছিল নীলিমার কাছ থেকে তার দেওয়া সব উপহার ফেরৎ নিয়ে আসতে। বেচারা প্রিয়নাথ কিছু না জেনে গিয়ে কোন মতে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিল। উপহার হিসেবে সুবিনয়ের কত কি মণিরত্ন দেওয়া ছিল, তা প্রিয়নাথ জানত না। সে সব ফেরৎ আনতে পারেনি। আনবার মধ্যে এনেছিল, কয়েকখানা বই। তা সে বইগুলো নীলিমা এক-একখানা ইঁটের মত প্রিয়নাথের মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মেরেছিল। ইতিহাস না জানাতে সে ভয়-চকিত হয়ে কয়েকখানা বই নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল। বাড়ি এসে নিরিবিলি বইগুলো খুলে সুবিনয়ের এক-একটা উপহারপত্র দেখে সে হেসে আর বাঁচে না। একটির মধ্যে লেখা, 'এ বইখানা ঘরের দরজা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে চাঁদের আলোতে পোড়ো।' আর একটিতে লেখা, 'এ বইখানা নিজে না পড়ে কোন প্রিয়জনকে পড়তে দিয়ে তার কাছে গল্প শুনে নিও।' অন্য একখানাতে লেখা, 'এই বইখানা তুমি স্বপ্ন দেখবার চেষ্টা কোরো।' এসব নির্দেশ অথবা অনুরোধ নীলিমা কতখানি রক্ষা করেছিল, তা প্রিয় জানে না। শুধু এইমাত্র জানে, বাবা-মায়ের আশীর্বাদে সে প্রাণটা নিয়ে ফিরে এসেছে। সে বইগুলো সুবিনয় নেয়নি। প্রিয়নাথকেই দান করেছিল। তা কোথায় বা সুবিনয় আর কোথায়ই বা সে নীলিমা। চারু এই ভদ্রলোকের দিদি হয়েছে। কী সূত্রে হয়েছে, তা প্রিয়নাথ জানে না। ভবিষ্যৎ জীবনে চারুর মত একটি মেয়ে এই ভাইকে নিয়ে কী ইতিহাস রচনা করবে, তা বিধাতাই জানেন।

ভদ্রলোক হঠাৎ তাঁর ব্যাগ থেকে একটি সুন্দর মোড়ক বার করে বেশ একটু অপরাধীর মতই বললেন: আমি দিদির জন্য এই শাড়ীখানা এনেছি। যদি কিছু মনে না করেন···

এইবার প্রকৃত সমস্যা দেখা দিল। জামাইবাবুর কাছে দিদির জন্য উপহার পাঠান কিছু দোষের নয়। কিন্তু ঐ উপহার গ্রহণ করে সে কিছুতেই জামাইবাবু বলে স্বীকৃতি দিতে পারল না। সে বলল : আপনি যা ভেবেছেন তা সত্যি নয়। ও আমি হাতে তুলে নিতে পারব না। আপনি অন্যভাবে পাঠিয়ে দেবেন।

ভদ্রলোক কী ভেবে নিলেন, কে জানে। তিনি বললেন : আমি যা ভেবেছি, তা মিথ্যে নয়। কাল দিদিকে ঘটনাটি বলেছি। আজ আপনাকে বলি। আমার এক দিদি ছিল। তার খুব রূপ। কিন্তু শুধু রূপে বিয়ে হয় না। বাবার অর্থ ছিল না। তাই দিদির আর বিয়ে হয় না। শেষকালে বেশী বয়সে দিদির বিয়ে হোল। তার কত আশা, কত আনন্দ, ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন। আপনি আর চারুদিতে যেমন, আমার দিদি আর জামাইবাবুতে ঠিক তেমনই ছিল। দিদি জামাইবাবুকে ছেড়ে একদিন থাকতে পারত না। বাবা একদিনের জন্য দিদিকে নিয়ে এলে, সে পাগল হয়ে যেত। আমি তখন ছোট। আমার বড় দুঃখ হোত। এত দিনের স্নেহ-মায়া-মমতা দিদি ভুলে গেল কি করে! দিদিতো সেই দিদিই আছে। শুধু হাতে শাঁখা পরেছে আর সিঁথিতে সিঁদুর পরেছে। তা যে জামাইবাবুকে ছেড়ে দিদি একদিন থাকতে পারত না, সেই জামাইবাবুর বংশধরকে সংসারে আনতে গিয়ে দিদি জীবনটা দিল। বাবা দিদির জন্য একখানা শাড়ী কিনে রেখেছিলেন। এতদিন বাক্সে তোলা ছিল। কাল চারুদিকে দেখে আমার দিদির কথা মনে পড়ল। ঠিক অমনি রূপ, অমনি লক্ষ্মীর মত চেহারা। সেই শাড়ীখানা এই দিদির জন্য নিয়ে এসেছি।

এর মধ্যে কখন ঘণ্টা পড়েছে, বাঁশি বেজেছে, সিগন্যালের আলোটা সবুজ হয়েছে, সবুজ নিশান উড়েছে—প্রিয়নাথ সেসব কিছু লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ গাড়ীটা নড়ে উঠতেই ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে প্রিয়নাথকে প্রণাম করে নেমে গেলেন। শাড়ীর প্যাকেটটি

পড়েই থাকল। নিতে পারব না বলে ফিরিয়ে দেওয়া, প্রিয়নাথের পক্ষে আর সম্ভব হোল না।

জানালা দিয়ে মুখ বের করে প্রিয়নাথ দেখল, ভদ্রলোক তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দুই হাত যুক্ত হয়ে আছে। প্রিয়নাথকে সে প্রণাম করে পায়ের ধূলো নিয়েছে। আবার এই যুক্তকর বোধহয় অন্য কোন চরণের উদ্দেশ্যে। প্রিয়নাথ সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল, গাড়ীর সার্চ লাইটের আলোটা কেবিনের ওপরে গিয়ে পড়েছে। সামনে বোধহয় লাইনের একটা বাঁক আছে। ঐ কেবিন থেকে গাড়ীর দিক নির্দেশ করা হয়। রাতটি বোধহয় ছিল পূর্ণিমা। একটি বিরাট চাঁদ পূবের আকাশটাকে প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। গাড়ির গতিবেগ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। অতি-বেগ-সমৃদ্ধ গাড়িখানা যেন ঐ বিশাল চাঁদটিকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে চলেছে। তখন বোধহয় লাইন বদলের পালা। ছন্দময় গতি পরিহার করে গাড়ীখানা ডাইনে বাঁয়ে বারকতক দুলে লাইনের সঙ্গে চাকার শব্দে ছন্দপতন ঘটিয়ে দিল। পেছনে তাকিয়ে দেখল, নিরন্ধ্র অন্ধকার। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাও অন্ধকার মনে হয়। সার্চ লাইটের তীব্র আলোতে দৃষ্টি-বিভ্রম। পেছন দিকে কোন এক জায়গায় চৌধুরীবাবু বসে আছে। প্রিয়নাথের দেওয়া টাকাতে চারুশীলার জন্য শাঁখা কিনেছে, সিল্কের শাড়ী কিনেছে। কিসের প্রত্যাশায় সেসব উপহার সে চারুর সামনে তুলে ধরবে সেই জানে।

এদিকে প্রিয়নাথের পাশে ভদ্র-লোকের রেখে যাওয়া শাড়ীখানা পড়ে আছে। কোন এক অজ্ঞাত ভদ্রলোক কত আশা নিয়ে মেয়ের জন্য শাড়ীখানা কিনে রেখেছিলেন। সেই শাড়ীখানা চারুশীলাকে লক্ষ্য করে দুরন্ত বেগে ধেয়ে চলেছে। পেছনে পড়ে থাকল বিষ্ণুপুর।

* * *

প্রিয়নাথের বিন্দুমাসীমা তথা বিন্দুবাসিনীর সেসব দিন আর নেই। তাঁর সংসারের পালা বদল হয়েছে। মেসো বদ্রিনারায়ণের

গিরিগুহা থেকে সংসারে ফিরে আসেন নি। মাসীমা সেই যে তাঁর কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এসেছিলেন, তারই প্রভাব কি-না, কে জানে! বিন্দুবাসিনীর বড় ছেলে নন্দদুলাল একটি মাত্র খাকীর হাফপ্যাণ্ট এবং একটি কামিজ সম্বল করে কলকাতায় এসেছিল। কী করে কোন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছিল। সেইখান থেকে খানিকটা পাস করেই নন্দদুলাল বলেছিল, তার সব শেখা শেষ হয়েছে। তার আপনজনেরা কেউ সে কথা বিশ্বাস করল না। কিন্তু নন্দদুলাল সত্যি-সত্যি একদিন কোন বন্ধুর কাছ থেকে প্যাণ্ট-কোট-টাই চেয়ে নিয়ে ইণ্টারভিউ দিয়ে একটা মোটা মাইনের চাকরী পেয়ে গেল। সেদিন সকলে বিশ্বাস করল, ছোকরা সত্যি-সত্যি ভোজবাজির খেল দেখাল বটে। তা সেই নন্দদুলাল মা-ভাই-বোন এবং নবপরিণীতা স্ত্রী রাণীকে নিয়ে কলকাতায় সংসার পাতল। প্রিয়নাথের সেখানে কাজে অকাজে যাতায়াত। কিসের আকর্ষণ, কে জানে! বিন্দুবাসিনী সম্পর্কে, প্রিয়নাথের মাসীমা। কিন্তু সে লতায়-পাতায়। সে সম্পর্কের জোরে এতখানি মাখামাখি সম্ভব নয়। মাসীমা যেন তাকে মায়ের চেয়েও বেশি যত্ন করেন। সন্ধ্যাবেলা বিন্দুবাসিনীর রান্নাঘরের সামনে বসে গরম গরম পরোটা এটা-ওটা-সেটা দিয়ে সে তৃপ্তি করে খায় আর ভাবে, কোথাকার কী একটা সম্পর্ক, অথচ কতখানি ভালবাসা!

একদিন প্রিয়নাথ ভালবাসার সূত্রটা খুঁজে পেল। নন্দদুলালের বাড়িওয়ালার ছেলে রাস্তায় প্রিয়নাথের সঙ্গে দেখা হতেই সামান্য দু'একটা মামুলি কথার পরেই বলে বসল: প্রিয়দা, আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে। কথাটা যেমন দরকারী, তেমন গোপনীয়।

প্রিয় বলল: তা বল না?

: মাসীমা হৈমকে আপনার হাতে দিতে চান।

প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি হাত দু'খানার দিকে তাকাল। বোধহয়

হৈমকে গ্রহণ করবার উপযুক্ত কিনা, পরীক্ষা করে বলল: হৈমতো আমার বোন হয়।

বাড়িঅলার ছেলে এ প্রশ্নের জন্য তৈরি ছিল। যে তাড়াতাড়ি বলল: মাসীমা সে কথা বলেছেন। তিনি বললেন, সম্পর্কটা লতায়-পাতায়। রক্তের সম্বন্ধ নয়।

প্রিয় তাড়াতাড়ি বলল: আচ্ছা, আমি এ নিয়ে মাসীমার সঙ্গে কথা বলব।—এই কথা বলে ঐ অনাত্মীয় তৃতীয়পক্ষ ছেলেটার হাত থেকে মুক্তি পেল। প্রিয় জানে, হৈমর সঙ্গে তার বিয়ে অসম্ভব। বাধাটা শুধু রক্তের সম্বন্ধের কথা নয়। আরও অনেক কিছু। কিন্তু সেসব কথা আলোচনার ক্ষেত্র ভিন্ন। তা তার সঙ্গে না হোক, হৈমর বিয়ের বড়ই প্রয়োজন। নন্দদুলালের সংসারে একমাত্র তার স্ত্রী ছাড়া আর সকলেই তার কাছে নিতান্ত অবাঞ্ছিত। বিশেষ করে বোন হৈমতো নিশ্চয়ই অনাদৃতা। নন্দদুলাল আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলকে বলত, একটা দোজবর তেজবর যা হয় এনে দাও, আমি এই পাষাণটার হাত থেকে অব্যাহতি পাই। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস, দোজবর নয়, তেজবর নয়—একেবারে বরের মত বর যোগাড় করে হৈম স্বয়ম্বরা হয়েছিল। সেসব ইতিহাস পরের কথা।

প্রিয়নাথ ভাবতে লাগল—বাঙালী মধ্যবিত্ত সংসারে উপযুক্ত বয়স হলে, কোন যুবকের পক্ষে বিয়ে না করা পর্যন্ত কন্যাদায়গ্রস্থদের লুব্ধ দৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষা করা একটা বিড়ম্বনা। যে সংসারে বিবাহযোগ্যা মেয়ে আছে, সেখানে এমন ছেলেদের আদরযত্নও আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা প্রিয়নাথ বিন্দুমাসীমার বাসায় গিয়ে হাজির হয়। কিসের প্রত্যাশা, তা সে কোনদিন ভাল করে ভেবে দেখেনি। সেখানে রান্নাঘরের সামনে বসে পটল ভাজা বেগুন ভাজা দিয়ে গরম পরোটা সে অনেক খেয়েছে। এতদিন এই আদান-প্রদানের মধ্যে সে স্নেহ-প্রীতি-ভক্তি-ভালবাসাই অনুভব করে এসেছে। আজ বাড়িঅলার ছেলের মুখে অভিনব প্রস্তাব শুনে

তার মনে হোল—এই দেনাপাওনার মধ্যে বুঝি মূলধন বিনিয়োগের একটা প্রচ্ছন্ন পরিকল্পনা আছে। এই চিন্তাটাই নন্দদুলালের বাসায় যাবার পথে তার কাছে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। কিছুদিন সে আর ওদিকে যেতেও পারেনি। মনে হয়েছে—বিন্দুমাসীমার কাছ থেকে হাত পেতে কিছু গ্রহণ করার মানেই হোল, তাঁর মেয়েকে গ্রহণ করার অলিখিত চুক্তিপত্রে দস্তখত করা। নানা কারণে তার যাওয়া সম্ভব হয়নি। আফিসের থিয়েটার নিয়ে ক'দিন খুবই ব্যস্ত ছিল। বাড়ী ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। তারপরে সেই বিষ্ণুপুরে যাবার বিড়ম্বনা। কোথাকার কে এক থিয়েটারের নটী চারুশীলা তাকে টানতে টানতে বিষ্ণুপুর নিয়ে গেল। সেখানে সে লালবাঁধের ধারে কোন এক পুরুষের সঙ্গে কী সব করল। তাই দেখেই প্রিয়নাথের অভিমান হোল না কী হোল। তা একটা হাসির কথাই বটে। চৌধুরীবাবুর মুখে চারুশীলার জীবনের ইতিহাস যা শুনেছে, তাতে কোন অজ্ঞাত পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা দেখলে বিস্মিত হবার কোন কারণ থাকবার কথা নয়। তবুও বিনা কারণেই প্রিয়নাথ চারুশীলার প্রতি বিরূপ হোল। ফিরে এসে নাটকের প্রয়োজনে আবার মেলামেশা করতে হবে—এই ভয়ে ক'দিন আফিসেই গেল না। কিন্তু এভাবে সমস্যা কতদিন চাপা দিয়ে রাখা যাবে! নায়ক এবং নায়িকার মধ্যে যদি ব্যবধান রচিত হয়ে থাকে তবে নাটকে রসসৃষ্টি অসম্ভব। অভিনয় নিতান্তই প্রাণহীন হয়ে যাবে। প্রিয়নাথ মনে মনে ভাবে, চারুশীলাকে নিয়ে বিষ্ণুপুর যাবার কথা বুঝি গোপন থাকে নি। পাসবাবু সদাশিবনের জন্যই হোক, আর চৌধুরীর বাচালতার জন্যই হোক, চারুশীলাকে নিয়ে প্রিয়নাথের বিষ্ণুপুর বেড়ানর কথায় হয়ত বন্ধুজনেরা বেশ রসাস্বাদন করেছে। কিন্তু তার প্রাণের রস যে শুকিয়ে যাবার অবস্থা। এইসব কথা ভেবেই দু'তিন দিন সে আফিসে না গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াল।

একদিন ঢাকুরিয়া লেকের ধারে সন্ধ্যেবেলা গিয়ে বসল। সেখানে জোড়ায় জোড়ায় যুবক-যুবতী ছায়াঘন গাছের নীচে বেঞ্চিতে বসে বসে আদিহীন অন্তহীন কথা বলে। তখন বিন্দুমাসীমার বাড়িঅলার ছেলের প্রস্তাবটা তার মনে পড়ল। অত কিছু বিরূপতার মধ্যেও তার মনটা বেশ রসসিক্ত হয়ে উঠল। নিরালা বেঞ্চিতে আধো আলো অন্ধকারের মধ্যে পাশে-বসা মোটা-সোটা গোলগাল হৈমবতীর গদগদ মুখখানার কথা কল্পনা করে তার বেশ হাসি পেল। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দলালের কথা মনে হোল। আনন্দ তার ভাইপো। বড়দা তুলালচন্দ্রের বড় ছেলে। তুইজনে সমবয়সী এবং বন্ধুভাব। আনন্দলালের সঙ্গে হৈমবতীর বেশ মাধুর্যময় সম্বন্ধ বিদ্যমান। আনন্দ অভিযোগ করে, প্রিয়নাথই নাকি তাকে হৈমর দিকে এগিয়ে দিয়েছে। প্রিয়নাথ বলে : অন্যান্য ক্ষেত্রে তুমি যখন নিজের পায়ে যেতে পেরেছ, তখন হৈমর বেলায় তুমি আমার ভরসা করেছিলে—একথা কে বিশ্বাস করবে? ক্ষেত্রতো তোমার একটা নয়?

মুচকি হেসে আনন্দ বলত : হাজার হোক, পিসি তো? একেবারে নিজে নিজে কি করে যাই? তা পিসি বলে কি শান্তি আছে? বুড়ি একেবারে মেয়েকে পাহারা দিয়ে রেখেছে। পাঁচ মিনিট না দেখলেই অমনি যাকে দেখবে জিজ্ঞেস করবে—ও দাদা, হৈমকে দেখেছিস, ও বাবা, হৈমকে দেখেছিস? অত বড় বাড়িটার মধ্যে সেই বিপুল দেহখানা নিয়ে হৈম যে মিনিটে মিনিটে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। বিন্দুবাসিনীর কাছে তা এক বিড়ম্বনা। বিন্দুবাসিনী, সম্পর্কে আনন্দ লালের ঠাকুরমা। সে পরিহাস করে বলত : মেয়ে কি তোমার একটি মাছি? সে কি উড়ে যাবে? অমন আদেখলের মত হৈম-হৈম করলে তুমি এমন ঘা খাবে বুড়ি···

তা হৈম সত্যিই আঘাত করেছিল। কিন্তু তা মাকে নয়। তখন মাও নেই, মেয়েও নেই। কোন এক অজ্ঞাত অবস্থান থেকে এমন

আঘাত করেছিল যে, আনন্দলাল একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। সে অনেক পরের কথা।

ইচ্ছেতে হোক আর অনিচ্ছেতে হোক, সেদিন প্রিয়নাথ সেখান থেকে উঠে পায়ে পায়ে নিজের অজ্ঞাতে তিনতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে একেবারে মাসীমার বাসার দরজার কড়া নেড়েছিল।

প্রিয়নাথ বাইরে থেকে শুনতে পেল, স্নানের ঘরে জল-পড়ার শব্দ। সে বুঝতে পারল, কেউ স্নান করছে, তাই কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে পায়নি। সে জোরে জোরে কড়াটা নাড়তেই জল পড়ার শব্দ বন্ধ হোল। তারপরেই মহিলা-কণ্ঠে প্রশ্ন। প্রিয়নাথ কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারল, রাণী বৌদি স্নান করছে। নন্দদুলালের বড় আদরিণী স্ত্রী এই রাণী বৌদি।

ভেতর থেকে প্রশ্ন হোল—কে?

প্রিয়নাথ বলল: আমি প্রিয়। ভেতরের কণ্ঠস্বর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল: সঙ্গে কে?

প্রিয়নাথ বলল: আমি একা।

—তারপরে কিছুক্ষণ চুপচাপ। প্রিয় বুঝতে পারল, রাণী বৌদি বাসায় একা এবং তিনি স্নান করছেন। তাঁর বিব্রত অবস্থার কথা চিন্তা করে সে বলল: আমি এখন যাই, রাণী বৌদি। পরে আসব।

রাণী তাড়াতাড়ি বলে উঠল: দোহাই প্রিয় ঠাকুরপো, এতখানি উপকার কোর না। সহ্য হবে না। এ যে গরীবের বাড়িতে হাতীর পা। তার চেয়ে যা বলি, শোন। আমি ছিটকিনি খুলে দিচ্ছি। কিন্তু আমি বললে তবে দরজা ঠেলবে। তার আগে নয়। মনে থাকবে তো?—প্রিয়নাথ বুঝতে পারল, রাণী বৌদি স্নান করতে করতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাঁর দৈহিক অবস্থা প্রিয়নাথের সামনে হাজির হবার মত নয়। সে বলল: হ্যাঁ মনে থাকবে।

শব্দ হল। অর্গলমুক্ত বন্ধ দরজার একদিকে রাণী অন্যদিকে প্রিয়। সামান্য একটা আঘাত দিয়ে স্পর্শের অপেক্ষা। কয়েক মিনিট এইভাবে কেটে যাবার পরে রাণী বৌদি বললেন : এইবার এসো।—তারপরেই জল পড়ার শব্দ আরম্ভ হোল। প্রিয়নাথ ভিতরে এসে ছিটকিনি বন্ধ করতেই রাণী স্নানাগার থেকে বলে উঠল : প্রিয় ঠাকুরপো, এদিকে এসো না কিন্তু, দরজাটা ছাই ভাঙা। প্রিয়নাথের সেদিকে যাবার কোন কথাই নয়। কোন নিষেধাজ্ঞার দরকারই ছিল না। কিন্তু নিষেধবাণী শোনামাত্র তার মনে একটা কৌতুক জেগে উঠল। সংসারের নিয়মই বুঝি এই। যেখানেই নিষেধাজ্ঞা, সেখানেই তা ভাঙার প্রবণতা। মনে যাই থাক, প্রিয় মুখে বলল : আমি ওদিকে যাব না। আপনি নির্ভয়ে কাজ শেষ করুন।

জল পড়ার ছল ছল শব্দে সে কথা রাণী শুনতে পেল কিনা, কে জানে। না শুনলেও কোন ক্ষতি নেই। লাভ ক্ষতির হিসেবের দরকার শুধু নির্দেশ অমান্য করে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলে। তা প্রিয়নাথ সেদিকে যাবে না। তাকিয়েও দেখবে না—দরজার কতখানি ভাঙা, আর সেই গুপ্তপথে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে ভিতরের রহস্য কতখানি দেখা যায়, সে কৌতূহল প্রিয়নাথের নেই। খাবার ঘরের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে সে ভাবতে লাগল। বাড়িটার মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে বেশ কয়েকজন আছে। তাদের মধ্যে সম্বন্ধটা মা-ছেলে-ভাই-বোন এই সব। তাই জীর্ণ দরজার অন্তরালে নিজ-নিজ রহস্যময় অস্তিত্ব নিয়ে কেউ বিব্রত হয় না। কিন্তু ব্যতিক্রম ও তো হয়। যেমন রবাহূত প্রিয়নাথ এসে পড়েছে। সেতো রোজই আসে। রাণী বৌদি যখন ছিটকিনিটি খুলে দিয়েছিলেন তখন তাঁর আত্মরক্ষার একমাত্র অবরোধ ছিল, প্রিয়নাথের শালীনতা-বোধ।

প্রিয়নাথ তখন নিতান্ত কৌতুকের বশেও আঙ্গুল দিয়ে দরজাটি সামান্য ঠেলে দিলে, রাণী বৌদির কত যত্নে আবৃত জীবন-রহস্য মুহূর্তের মধ্যে অনাবৃত হয়ে যেত। দীর্ঘদিনের সঞ্চিত সম্পদ চোখের পলকে

এইভাবে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। একটি ঘটনা প্রিয়নাথের মনে পড়ল। তাদের দেশের গাঁয়ের কথা। সে তখন কিশোর। সর্ব পরামানিক বড়ই গরীব। তার বাড়িতে দুপুরবেলা দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। অনেক লোকের সকল চেষ্টাতেও সে আগুন নিভল না। নিভল, যখন দাহ্য পদার্থ আর কিছু বাকি নেই। সমাগত লোকারণ্যের মধ্যে কিশোর প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব পুড়ে শেষ হয়ে যাওয়া দেখল। ছাই চাপা-পড়া অর্ধদগ্ধ একটি জিনিষ দেখে প্রিয়নাথের কিশোর মন একেবারে হাহাকার করে উঠেছিল। সে জিনিস একটি গরম গায়ের চাদর। প্রিয়নাথের বাবা ঐ চাদরটি সর্ব পরামানিককে দান করেছিলেন। সর্ব কিন্তু ঐ চাদরটি নষ্ট হয়ে যাবার ভয়ে ভয়ানক শীতের মধ্যেও ব্যবহার করত না। অত যত্নে তুলে রাখা চাদরটিকে পর্যন্ত রুদ্র বৈশ্বানর ক্ষমা করেনি। তা আগুনের না হয় মায়া-মমতা-স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা কিছু না থাকতে পারে। কিন্তু প্রিয়নাথ তো আগুন নয়, মানুষ।

এইসব কথা চিন্তা করতে করতেই জল-পড়ার শব্দ বন্ধ হোল। রাণী বৌদি বললেন: প্রিয় ঠাকুর পো, আমার শোবার ঘরের আলোটা জ্বেলে দেখ, বিছানার ওপর আমি জামা-কাপড় রেখে এসেছি। সেখান থেকে শাড়িখানা আমার হাতে দাও।

প্রিয়নাথ প্রমাদ গণল। বাড়ান হাতে শাড়িখানা এগিয়ে দিতে গেলে সেই ভাঙ্গা দরজার কাছেই যেতে হবে। তাই সেদিকে একবার তাকাল। দেখে নিশ্চিন্ত হোল, দরজাটি অন্যদিকে। আরও দেখল, রাণী বৌদির বাড়ান হাত দু'খানা নীচু দেওয়ালের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে। শাঁখার মত ধবধবে সাদা দু'খানা জলে-ভেজা সুডৌল হাত প্রায় বাহুমূল পর্যন্ত ওপর দিকে বেরিয়ে আছে। দেখে প্রিয়নাথ অভিভূত হয়ে পলকের জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছিল। তারপরে সে দৃষ্টি আর ফেরাতে পারে না। এমন সময়ে রাণী বৌদি বললেন: ও প্রিয় ঠাকুর পো, হাত যে ব্যথা হয়ে গেল; কখন দেবে?

প্রিয়নাথের চৈতন্য ফিরে এলো। কণ্ঠস্বরটা একটু দূরে নিয়ে গিয়ে বলল: এই দিচ্ছি রাণী বৌদি।

শোবার ঘরের আলো জ্বেলে প্রিয়নাথ দেখল, বিছানার ওপরে ছোট-বড় নানা রকম জামা-কাপড় সাজান রয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল: কোনটা কোনটা দেব রাণী বৌদি? এখানে তো অনেক কিছু রয়েছে?

সঙ্গে সঙ্গে চাপা উত্তর: রক্ষে কর ভাই। তোমাকে কিছুই করতে হবে না। শুধু শাড়িখানা এনে আমার হাতে দাও। আর কিছু নাড়াচাড়া করতে হবে না।—প্রিয়নাথ শাড়িখানা তুলে নিয়ে কাছে এসে তাকিয়ে দেখল, হাত দু'খানা তেমনই বাড়ান রয়েছে। মুখখানা দেখা যায় না। কিন্তু অসহায় হাত দু'খানার মধ্যে যেন অন্তহীন ব্যাকুলতা। হঠাৎ প্রিয়নাথের মনে সেই ছবিখানার কথা মনে পড়ল। ছবিখানার নীচে লেখা—"গোপীদের বস্ত্রহরণ"। সেই কথা মনে রেখে শাড়িখানা নিয়ে গিয়ে রাণী বৌদির হাতে তুলে দিল। ফিরে এসে চেয়ারখানায় বসতে না বসতেই, কী ব্যাপার, কে জানে! আলো নিভে গেল। অন্ধকার। চারদিকে চেঁচামেচি আরম্ভ হোল। একটা অদ্ভুত কথা প্রিয়নাথের মনে হোল। সে কথা কাউকে বলবার নয়। বড় গোপনীয়। তার মনে হল, শাড়িখানা রাণী বৌদি না পেলেও ক্ষতি ছিল না। ঘরের মধ্যে একেবারে নিকষ কালো অন্ধকার। একহাত দূরের মানুষের অস্তিত্ব পর্যন্ত বোঝা যায় না। রাণী বৌদি অনায়াসে তার সামনে দিয়ে যে ভাবে খুশি শোবার ঘরে চলে যেতে পারতেন। অন্ধকারের এও এক রূপ। রূপহীন অপরূপ তিমিরে মানুষের কত-না রূপান্তর হয়।

স্নানাগারের ভাঙা দরজা খুলে কখন রাণী বৌদি বেরিয়ে এসেছেন, প্রিয়নাথ বুঝতে পারে নি। তাঁর অস্তিত্ব বুঝতে পারল তখন, যখন একেবারে কাছে অন্ধকারের মধ্যে থেকে তাঁর কথা ভেসে এলো: কোথায় আছো, প্রিয়ঠাকুর পো?—

প্রিয় কণ্ঠস্বর দিয়ে নিজের অস্তিত্ব বুঝিয়ে দিল। রাণী বলল: ভয় পেয়ো না, আমি জামা কাপড় পরে আসছি। চুপ করে বসে থাক।

কিছুক্ষণ কেটে গেল। এর মধ্যে প্রিয়নাথের আবার সেই "গোপীদেব বস্ত্রহরণের" ছবির কথা মনে পড়ল। অনেক দিনের অনেক কথা। সে প্রিয়বালাকে প্রবাসী স্বামীর কাছে চিঠি লিখে দিয়েছিল। সে-ই প্রিয়বালাদের বাড়ীতেই সে প্রথম ঐ ছবি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়বালার বাবা সিদ্ধেশ্বর কর্মকার কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তাঁর সারা অঙ্গের দৃশ্যমান অংশে কৃষ্ণ-নামের ছোট-বড় ছাপ লাগান থাকত। তাই দেখে কেউ কেউ অন্তরালে তাঁকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বলত। প্রিয় যখন চিঠি লিখে দিয়েছিল, তখন সে কিশোর। ছবির বিষয়-বস্তু না বুঝলেও কেমন একটা রহস্যঘন কৌতূহল বোধ করত। গোপবালারা কেউ হাঁটুজলে কেউবা কোমরজলে দাঁড়িয়ে একহাতে নিজ নিজ নিরাবরণ দেহ আবরিত করবার অক্ষম চেষ্টা করে অন্য হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণকে অনুনয়-বিনয় করছে। ক্রমে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পা দিতেই না-না জায়গায় না-না পরিবেশে সে ঐসব কৃষ্ণভক্তির ছবি দেখেছে আর ভেবেছে—বস্ত্রের অভাবে গোপীদের দুরবস্থার কথা চিন্তা করেই বুঝি ভক্তরা এত ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কৃষ্ণলীলার এত কথা থাকতে ভক্তগণ ঐসব বস্ত্রহরণ, রাসলীলা প্রভৃতির ছবি নিয়ে এত টানা-পোড়েন করেন কেন। সে রহস্য মোচনের জন্য প্রিয়নাথ মহাভারত, ভাগবত পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ পড়েছে। বস্ত্র-হরণের কথা একমাত্র ভাগবত ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থে নেই। ভাগবতে বর্ণিত সে কাহিনী প্রিয়নাথের কাছে বড়ই দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছে। ভক্তগণ বলে, ঐসব কাহিনীর মধ্যে পরম পবিত্র ভক্তিতত্ব আছে।

কৃষ্ণ-অনুরাগী গোপবালারা কৃষ্ণকে পতিভাবে পাবার জন্য কাত্যায়নী ব্রত করেছিল। ব্রতের নিয়ম একমাস। এই একমাস

তারা দলবেঁধে এসে প্রত্যূষে যমুনায় স্নান করত। রমণীগণের স্নানের বিষয়ে একটি কুৎসিৎ প্রথা ছিল। তারা নদী-তীরে বস্ত্রাদি রেখে জলে নামত।

মাসান্তে ব্রত সমাপ্তির দিনেও সেই গোপনারীরা প্রথামত বস্ত্রাদি তীরে রেখে জলে নেমেছিল। তাদের কর্মফল প্রদান করবার জন্য কৃষ্ণও যমুনাতীরে উপস্থিত হলেন। ওপরে রেখে-যাওয়া বস্ত্রগুলো সংগ্রহ করে শ্রীকৃষ্ণ কদম্ববৃক্ষের শাখায় আশ্রয় নিলেন। এদিকে গোপীগণ বড় বিপন্না। গায়ের বসন পরহস্তগত হলে কোন্ নারী বিপন্না না হয়। তা সে হরণকারী শ্রীকৃষ্ণ হলেও ব্যতিক্রম নেই। তারা গলা পর্যন্ত জলের নীচে ডুবে থেকে শীতে কাতর হয়ে উঠল। কৃষ্ণ বড় সহজে বস্ত্র দেন নাই। সেই বসনাদি ফিরে পাবার জন্য গোপীদের অনুনয় বিনয় এবং তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র সব নির্দেশের কথা ভাগবতে বিস্তারিত বিন্যাস করা হয়েছে। তার মধ্যে ভক্তিতত্ত্বের কথা যতই থাক্, শালীনতার সীমা রক্ষা করা হয়নি। সেই ব্যাকুলতাই যেন রাণী বৌদির দুখানা প্রসারিত হাতে ফুটে উঠেছিল। তাঁর কথাতেও সেই অনুনয়ের সুর ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সে তো বস্ত্রহরণ করেনি। নির্জন বাড়ীতে যেমন-তেমন ভাবে স্নান-শেষে শোবার ঘরে চলে যাওয়া যাবে—এই কথা মনে করেই বুঝি রাণী বৌদি জামা কাপড় না নিয়েই স্নান করতে গিয়েছিলেন। এর মধ্যে সে এসে পড়েছিল। তার মধ্যে ব্রত-রক্ষার ফলদানের কোন ষড়যন্ত্র ছিল না।

এইসব কথা মনে করতে করতেই সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। রাণী বৌদির দাঁতে বুঝি কিছু একটা ধরা ছিল। হয় শাড়ীর আঁচল না-হয় সায়ার দড়ি। সেই অবস্থাতেই বললেন: তোমার দাদা এলেন।

এই কথার মধ্যে কী ত্রাস ছিল কে জানে; কথাটা বোমার মত প্রিয়নাথের কানে ফেটে গেল। উচিত অনুচিতের কথা চিন্তা না

করে প্রিয়নাথ পলকের মধ্যে রাণী বৌদির শোবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে হাজির। নিকষ-কালো অন্ধকারের মধ্যে দরজায় দাঁড়িয়ে ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল : নন্দদা এলো না কি ? কী—লজ্জার কথা বলুন তো!

রাণীর দাঁত ততক্ষণে মুক্তি পেয়েছে। আঁচল সেখান থেকে সরে গিয়ে যথাস্থানে চলে গেছে। অন্ধকারের মধ্যেও তার সুন্দর দাঁতগুলো ঝক ঝক করে উঠল। সে হেসে বলল : এর মধ্যে লজ্জাটা 'কোথায় ?

প্রিয় বলল : এই অন্ধকার বাড়ীতে কেউ নেই, ছিঃ ছিঃ।

: শুধু আমি আর তুমি—তাই তো ? তুমি যাই বল প্রিয় ঠাকুরপো ; তোমার মনে তা হলে পাপ আছে।

: এত বড় কথা আপনি বললেন ?

রাণী বলল : ওমা ! তাই রাগ করলে নাকি ? তোমার সঙ্গে যে আমার ঠাট্টা-তামাসার সুবাদ ! তুমি যে মাই ডিয়ার ঠাকুরপো।—অন্ধকারের মধ্যেই হঠাৎ প্রিয়নাথের দিকে একটু তাকিয়ে দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে করে বলল : একটু পাপ না হয় মনে থাকলই।

দরজার কড়া আবার নড়ে উঠল। প্রিয় ফিস ফিস করে বলে উঠল : দরজাটা আগে খুলে দিন না ছাই।

হাসতে হাসতে রাণী বৌদি উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে :যতেই আলো জ্বলে উঠল। বলল : আর ভয় নেই। কিন্তু তোমার ?:দা তোমাকে নিতান্ত নাবালক মনে করেন। তুমি যে এঁচোড়ে পাকা, একথা ও ভদ্রলোক জানেন না।

দরজা খুলতেই একটি কথা আলো আঁধারের মধ্যে দিয়ে ভেসে এলো : প্রিয়কা এখানে আছে, কাকিমা ?

একজন মানুষের কণ্ঠস্বরে এমন মুক্তির আস্বাদ থাকতে পারে—একথা প্রিয়র জানা ছিল না। চোখের পলকে সে সব জড়তা কাটিয়ে লাফিয়ে উঠে বলল : আরে আণ্টু ?—আণ্টু অর্থে, সেই আমন্দ। প্রিয়নাথের বড়দা দুলালচন্দ্রের বড় ছেলে। তার সমবয়সী আর

বন্ধুস্থানীয়। সে সোজা এসে প্রিয়নাথের কানে-কানে বলল : আই কনগ্র্যাচুলেট ইউ।

প্রিয়নাথের এক ছেলেবেলার বন্ধু তবলা বাজনা শিখতে গিয়ে শুধু একটা তাল শিখেছিল। তার নাম 'ত্রিতাল'। আর কোন তাল তার শেখা হয়নি। কিন্তু বাজনায় তার অনন্ত উৎসাহ। যে কোন লোকের যে কোন গানের সঙ্গে সে তবলা বাজাতে যেত। কিন্তু তাল ঐ একটিই। বন্ধুবান্ধবরাও তালটির নাম দিয়েছিল. "ঘুঘুতাল"। তা আনন্দেরও তাই। যে কোন প্রসঙ্গের মধ্যে সে নারী-সঙ্গের আস্বাদন অনুভব করত। অন্ধকার নিরালা বাড়ির মধ্যে একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোককে দেখলে দ্বিতীয় কিছু অনুমান করা তার পক্ষে অসম্ভব। প্রিয়নাথের ভাগ্য সুপ্রসন্ন অনুমান করে সে অভিনন্দন জানাল। প্রিয়নাথ তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিলক্ষণ জানে। তাই শুধু বলল : সাট আপ, ইউ নটি বয়।

সে প্রিয়র কানে কানে জিজ্ঞাসা করল : গ্রেটাগার্বো কোথায় ?—গ্রেটাগার্বো অর্থে সেই হৈমবতী। প্রিয়নাথের আবার সেই বাড়ি-অলার ছেলের প্রস্তাবের কথা মনে পড়ল। "মাসীমা হৈমকে আপনার হাতে দিতে চান"। প্রিয়নাথ আনন্দের হাত দুখানা ভাল করে তাকিয়ে দেখল। আনন্দ যে হাত দুখানা বাড়িয়েই রেখেছে—সেদিকে বিন্দুমাসীমার দৃষ্টি নেই। তিনি প্রিয়নাথের হাত নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করেছেন। পাত্র হিসেবে আনন্দর দাম অনেক বেশী। তার বাবার কত বড় বাড়ি, কত টাকা। প্রিয়নাথ তো বলতে গেলে, ওদের আশ্রিত।

ঐ আনন্দই প্রিয়নাথকে একদিন গল্প করেছিল। একদি আনন্দ নাকি ভাবসময়ে রঙ্গরসে হৈমবতীকে বলেছিল, তুমি বেচার প্রিয়কাকাকেও একটু কৃপাদৃষ্টি দিও। তাতে নাকি হৈম জিভ কেটে দুই চোখ গোল গোল করে বলেছিল : ছিঃ অমন পাপ-কথ বলতে নেই। তিনি তো আমার দাদা। আনন্দ না-কি বলেছিল

তুমি তো আমারও পিসি। একেবারে গঙ্গাজলের শিশি।—তা সেই গঙ্গাজলের শিশি একদিন স্বয়ম্বরা হয়ে এমন পাত্র যোগাড় করেছিল—তা দেখে আনন্দর বড় হিংসে হয়েছিল। সে সব অনেকদিন পরের কথা। যখনকার যা, তখনকার তা। অনেকদিন পরে ঐ রাণী বৌদিও তো কী কাণ্ড করে বসল। সময় এলে যত কষ্টই হোক, সে কথাও না বলে উপায় থাকবে না।

সত্যি কথা বলতে কি, হৈমকে স্ত্রীরূপে কল্পনা করতে প্রিয়নাথের বড় হাসি পায়। হৈমর থলথলে দেহটির মধ্যে গোলগাল মুখখানা যদি প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে, তবে তার পক্ষে বুঝি ধৈর্যধারণ করা কঠিন হবে। রসচর্চায় হৈমবতীর এইসব দৈহিক রূপান্তরের সম্ভাবনার কথা আনন্দলালই বোধহয় প্রিয়কে বলেছিল। এসব কথার মধ্যে হাস্যরস আছে। কিন্তু তার চেয়ে বেশী আছে হৈমবতীর অজ্ঞাত ভবিতব্যের অশুভ ইঙ্গিত। তাই বিচলিত হয়ে প্রিয়নাথ তার জন্য মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটি পাত্র চায়। সে সব পরের কথা। সেদিনের সন্ধ্যায় আনন্দ রাণীকে দেখে নিয়ে প্রিয়নাথকে বলেছিল: এ মাহ ভাদর, এ মহা বাদর, এ গেহ আঁধারে তোমাকে বিরক্ত করলাম বলে আমি দুঃখিত প্রিয়কা।

প্রিয় বলল: ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে এই অন্ধকারে কিসের সন্ধানে এসেছিল—সত্যি করে বল।

আনন্দ তাড়াতাড়ি বলে উঠল: আমি সত্য ছাড়া মিথ্যা বলিব না। বিন্দিঠাকুমা তার মেয়ে নিয়ে আমাদের বাড়িতে। তিনি বললেন, তিনি তোকে দেখেন নি। সম্ভব অসম্ভব নানা জায়গা ঘুরে তোকে না পেয়ে যখন বাড়ি ফিরে গেলাম, তখন হৈম মুচকি হেসে বলল, ঐ আমাদের বাসায় প্রিয়দাকে পাবে।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করল: তা হৈম এমন অনুমান কী করে করল?

আনন্দ বলল: সেই তো কাব্য করে জানাল। না হলে আমি ওসব ভাই, ভাদর টাদর কী করে জানব।

প্রিয়নাথের মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। যখন তখন সে এ বাড়িতে ছুটে আসে···একথা ঠিক। কেন আসে, কী তার আকর্ষণ, ত কোনদিন বিশ্লেষণ করে ভেবে দেখে নি। বিন্দু মাসীমার পরোটা এবং পটল ভাজা বেগুন ভাজার লোভে সে আসে না, একথা ঠিক দৈবাৎ নিরালা অবসর পেলে হৈম সেবা যত্ন করবার চেষ্টা করে তাও মনে হয়, তার মায়ের নির্দেশে। তার মধ্যে কোন প্রাণ নেই নন্দদা বাড়িতে থাকলে তাঁর সঙ্গে কিছু কিছু কথাবার্তা হয় বটে কিন্তু তার লোভে সে আসে না। রাণীর মুখখানার দিকে তাকাতে প্রিয়নাথের চিন্তায় ছেদ পড়ল। উত্তর খুঁজে পেল কিনা কে জানে সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল: তা আমাকে এত খোঁজাখুঁজি কেন?

আনন্দ বলল: বাবার তাড়া। তোদের আফিস থেকে এক ভদ্রলোক এসে বসে আছেন। তাঁর সঙ্গে দুটি জিনিষ। একটি সচল, অন্যটি অচল। সচল জিনিষটি এক ভদ্রমহিলা আর অচলটি একটি মিষ্টির হাঁড়ি। সচল জিনিষটি বেশ দেখবার মত।

হতবাক হয়ে প্রিয় জিজ্ঞাসা করল: ভদ্রলোকের নাম কী?

আনন্দ বলল: সে কথা বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবে।

* * *

সে দিনটি বড় অভিশপ্ত। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর একটা খবর শুনে সারা পৃথিবীর মানুষ যেন নড়েচড়ে বসল। তাই নিয়েই প্রিয়নাথের বড়দা দুলালচন্দ্রের বৈঠকখানা সেদিন সরগরম হয়ে উঠেছে। তবে সে আলোচনার মধ্যে উত্তেজনা থাকলেও কোন আতঙ্ক নেই। যেন একটা প্রচ্ছন্ন উল্লাস। সেদিন যার সামান্য সূচনা, তার পরিণামে সমস্ত পৃথিবীটার ভাগ্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—তা নিয়ে সে বৈঠকখানায় সেদিন কেউ বিচলিত নয়। সকলেই যেন একটা মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে।

রোজকার মত দিনমানের কাজকর্ম সেরে সকলে এসে দুলালবাবুর বৈঠকখানায় বসেছে। দুলাল নিজে ব্যবসা পত্র নিয়ে থাকেন। সারাদিন বৈষয়িক ব্যস্ততার শেষ নেই। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা সব ঝামেলা সরিয়ে রেখে গড়গড়া নিয়ে বসেন। একে একে বন্ধুবান্ধবরা সব এসে পড়েন। বরুণবাবু, নরেশদা, ঘোষবাবু, হরিপদ, সতীনাথ—এরাই সব দুলালের নিয়মিত সান্ধ্য মজলিসের সভ্য। এদের সকলের পেশাগত কাজের প্রকৃতি এবং মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন। হরিপদর নিজের বৃত্তি যাই হোক, সে ঐ সান্ধ্য মজলিশের সাংবাদিকের কাজটি নিষ্ঠার সঙ্গে করে থাকে। সত্যি-মিথ্যে, ভালমন্দ যেখানকার যে কোন খবর সে এনে পরিবেশন করত। ঐ নির্দিষ্ট দিনেও বিশেষ সংবাদটি সেই হরিপদই সংগ্রহ করে এনে পরিবেশন করেছিল। একমাত্র বরুণবাবু ছাড়া বাকি সকলে সেই সংবাদে উল্লাসে ফেটে পড়েছিল। প্রতিপক্ষের ঘনায়মান বিপদে যেমন আনন্দ হয়, তাই আর কি। দুলালবাবু গড়গড়া নিয়ে বেশী ব্যস্ত থাকেন। কথা বলেন কম, শোনেন বেশী। উপভোগ করেন তার চেয়েও বেশী। কথাবার্তা থেমে গেলে নিজে ছোট্ট একটা মন্তব্য করে পুনরায় আলোচনার সূত্র দান করেন। বরুণবাবুর ডাকবিভাগে চাকরি। তাও আবার বিভাগীয় প্রধানের অফিসে। ব্রিটিশ সরকারের যা কিছু গোপন তথ্য, সবই নাকি তিনি জানতে পারেন। নিতান্ত নির্ভরযোগ্য স্থানে তেমন দু'একটি রহস্যময় কথা তিনি সংক্ষেপে প্রকাশ করেন। তাঁর শ্রবণশক্তি কিছু কম। বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি নাকি বীরের মত যুদ্ধ করেছিলেন। সেই সময়েই নাকি ভীষণ ভীষণ কামান আর বোমার শব্দে তিনি শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন। হরিপদবাবু একথা বিশ্বাস করেন না। তার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ওপর বরুণবাবু নির্ভর করে বসে থাকেন না। কেউ কোন কথা বললেই তিনি হাতটা কানের পেছনে রেখে শব্দ তরঙ্গকে রন্ধ্রপথে প্রবেশের সাহায্য করেন। এই বধিরতার

জন্য বরুণবাবুর অসুবিধা অনেক ছিল। অন্যদিকে সুবিধাও কিছু কিছু ছিল। যে কোন অপ্রিয় কথা না-শোনার ভান করে এড়িয়ে যেতেন।

তা সেই সান্ধ্য মজলিশেঁ সেদিন হরিপদ যথাসময়ে আসেনি। এলো অনেক পরে। সাংবাদিকের কৌশল তার বেশ ভালই জানা ছিল। মূল বক্তব্য গোপন রেখে অন্যকিছু একটা বলে শ্রোতার আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারত। এসেই প্রথমে হাসি, শুধু হাসি। কোন কথাই বলতে পারে না। এইভাবে যথেষ্ট বিস্ময় সৃষ্টির পরে তিনি কথা বললেন। সে কথা ভীষণ কথা। হাসির কথা নয়। হরিপদ-বাবু বললেন: ছাতা দিয়ে রোদ নিবারণ করা যায়। বৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। পাগলা কুকুর তাড়া করলে, তাও বুঝি ঠেকান যায়। কিন্তু যুদ্ধ নিবারণ করা যায় না।—এই কথা বলে তিনি উভয় হাতের বুড়ো আঙ্গুল দুটি এক জায়গায় করে নাড়তে লাগলেন। বুড়ো আঙ্গুল দুটি সজ্জী জাতীয় কলার বিকল্প। তাই খাওয়াবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু কাকে? বরুণবাবুদের সামনে এগিয়ে দিয়ে সাগরপারের যে সম্প্রদায় হরিপদদের দুঃখ-দুর্দশার পথে এগিয়ে দিচ্ছে, বোধহয় তাদের। সকলে যখন নিবদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল, তখন তিনি বললেন: বেচারা চেম্বারলেন! ছাতা মাথায় দিয়েই জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। পোঁধরা ফ্রান্সও তাই করেছে। ওদের ঘরের পাশ দিয়ে যখন হিটলার দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছিল, তখন কিছু বলেনি। ভেবেছিল, যায় শত্রু পরে পরে।

বরুণবাবু এতক্ষণ কানের পেছনে হাত রেখে মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনছিলেন। ভাল হোক, মন্দ হোক, চেম্বারলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং একজন মানুষের মত মানুষ। বরুণবাবু চেম্বারলেনের কায়া কোনদিন দেখেননি। তা ভগবানের কায়াও তো অনেকেই দেখেনি। তাই বলে পুজো করতে বাধা কোথায়?

নিজ নিজ রুচি অনুসারে মানুষ ভগবানের ছায়াকে পূজো করে। তা বরুণবাবুও ঐ সাহেবের ছবি দেখেছেন খবরের কাগজে আর পত্র-পত্রিকায়। মাথাধরা থাকলেই যেমন মাথার অস্তিত্ব, পাখি থাকলেই যেখন পাখা, তেমনি চেম্বারলেন সাহেবের ছবি থাকলেই হয় হাতে না হয় মাথায় ছাতা থাকবেই। প্রধান মন্ত্রীর ছাতা বলেই বোধহয়, আকারে বেশ বড়। তা রোদ-বৃষ্টি নিবারণের জন্য ভদ্রলোক যদি সাধারণ মানুষের মত ছাতা ব্যবহার করেন, তবে তা নিয়ে হাসাহাসি করবার কি থাকতে পারে—একথা বরুণবাবু বুঝতে পারেন না। কিন্তু ছাতার চিন্তা নিয়ে তখন বসে থাকবার অবসর নেই। হরিপদবাবু যে ভয়ানক সংবাদ জানালেন, তাই নিয়ে তখন হল্লা আরম্ভ হয়েছে। সকলেরই তখন উল্লাসে ফেটে পড়বার মত অবস্থা। একমাত্র বরুণবাবু কানের পেছনে হাত রেখে চোখেমুখে একটা ভয় মিশ্রিত অবিশ্বাসের ভাব নিয়ে বসে থাকলেন। তুলালবাবু গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে মৃদু হেসে কণ্ঠস্বর বরুণবাবুর শ্রবণগোচর করে বললেন ঃ হরিপদ কী বলছে, বরুণ ?

বরুণবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে মাথাটা একটু নেড়ে সংবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। সেদিকে কেউ লক্ষ্য করল না। সকলের তখন আত্মহারা অবস্থা। এত উল্লাসের কারণ এই, ব্রিটিশের শিয়রে শমন। চেম্বারলেন এতদিন যেভাবে অনিবার্য যুদ্ধকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছিলেন, তাতেই বোঝা যাচ্ছিল—তিনি কত শক্তিহীন। সেই তুর্বল শক্তি বিপাকে পড়ে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে। সুতরাং পরিণাম বোঝা যায়। শক্তিশালী কোন প্রতিপক্ষের হাতে যদি ব্রিটিশের পরাভব ঘটে—এই সম্ভাবনার আনন্দে সকলে মেতে উঠেছে। হিটলারের শক্তি সম্বন্ধে তখন বিশ্বব্যাপী এক অজ্ঞাত আতঙ্ক। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, সেই বিশ্বত্রাসকে শত্রুরূপে আক্রমণ করে ব্রিটিশ যদি নিজের সমাধি রচনা করে, তবে অসহায় প্রতিপক্ষরূপে ভারতবাসী সুফল পাবে—এই আশা।

তুলালচন্দ্র গড়গড়ার নলটা হাতে ধরে মৃদু হেসে বললেন : বরুণ, লড়াই তাহলে লেগে গেল ?

বরুণবাবু এতক্ষণ অনেক সহ্য করেছেন। এবার অতিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে সংক্ষেপে বললেন : মিথ্যে কথা।

হরিপদবাবু হো-হো করে হেসে উঠে এবার উৎসাহের প্রাবল্যে দাঁড়িয়ে পড়ে পকেট থেকে ভাঁজ করা আনন্দবাজারের একখানা টেলিগ্রাম কপি বার করে কাগজটি বরুণবাবুর চোখের সামনে খুলে ধরলেন। এক পয়সা দিয়ে কাগজখানা সদ্য রাসবিহারীর মোড় থেকে কিনে এনেছেন। বড় বড় অক্ষরে এই যুদ্ধ ঘোষণার কথা তাতেই লেখা আছে। টেলিগ্রামের প্রতিটি অক্ষর বরুণবাবুর বুকে মুষলের আঘাত করতে লাগল।

বরুণবাবুকে পরাজয় স্বীকার করতে হোল। তাঁকে মেনে নিতে হোল যে, তাঁর অজ্ঞাতেও জগৎ-সংসারের কিছু কিছু ঘটনা ধরণীর চিত্রপটে ঘটে থাকে। তাঁর পরাভূত মলিন মুখখানার দিকে সকলে হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে থাকল। বিষণ্ণ মুখখানাতে যতটা সম্ভব উত্তেজনা টেনে এনে তিনি বললেন : অবোধের গো-বধে আনন্দ। যুদ্ধ লাগলে এত আনন্দ করবার কি আছে ?

হরিপদবাবু রাস্তাটা একটু দেখে নিয়ে নিম্নস্বরে বললেন : আপনার মনিবদের এবার জবাই করবে—এই আনন্দ।

একথা না শোনার ভান করে বরুণবাবু বললেন : বিগত মহাযুদ্ধে দু'কোটি লোক মরছে—তা জানেন ?

ঘোষবাবু বললেন : দু'কোটি নয়, চার কোটি।

এ কথাটা বরুণবাবু শুনতে পেলেন। তিনি বললেন : তা চার কোটি হওয়া বিচিত্র নয়। এ যুদ্ধেও কোটি কোটি লোক মরবে তো ?

হরিপদ : তাতে আর আপনার ভাবনাটা কিসের ? (একটু নিম্নস্বরে) এক বাঁজা সাড়ে তিনমণি বৌ আর এক শালা ছাড়া তো তিন কূলে কেউ নেই। ও থাকলেই কি, আর গেলেই কি ?

বরুণবাবুর ছেলেপুলে নেই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে স্ত্রী ভদ্রমহিলা প্রয়োজনের থেকে একটু বেশী স্বাস্থ্যবতী। সেই স্ত্রী এবং একটি শ্যালকের ভবিষ্যত চিন্তা করে ভদ্রলোক বৃদ্ধ বয়সে একটি বাড়ি করেছেন। এই বাড়ির জন্যই তাঁর যত আর্থিক কৃপণতা। তু'পয়সা দিয়ে একটি রসগোল্লা কিনে ফাউ হিসেবে প্রাপ্য রসের পরিমাণ নিয়ে তিনি দোকানীর সঙ্গে ঝগড়া করেন। বরুণবাবু গোপনে তুলালচন্দ্রকে বলেছেন, বিকেলবেলায় রুটি খাওয়াটা ঐ রসগোল্লা উপলক্ষ্য করেই হয়ে যায়। মাছ-মাংস তরি-তরকারি কিছু দরকার হয় না। রসগোল্লাটা দিয়ে গৃহিনী খান-তিনেক রুটি খান আর তিনি শালাকে নিয়ে ঐ রসটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেন। কোথাকার কে এক শালার জন্য বাড়ি তৈরি করে এই কৃচ্ছ্রসাধন হরিপদবাবু দেখতে পারেন না। অন্যদিকে তুলালচন্দ্র অনেক আত্মীয় পরিজন নিয়ে সংসার করেন। তারমধ্যে তু-একজন শালা-শালী থাকা অসম্ভব নয়। এর মধ্যে কিছু অন্যায় আছে বলে তিনি মনে করেন না। চাকরির প্রতি বরুণের বিবেক-বর্জিত আনুগত্যই তুলালের বিরূপতার কারণ।

বরুণবাবু বিরক্তিতে উঠে পড়েছিলেন। তুলালচন্দ্রের নির্দেশে আবার বসে পড়লেন।

ঘোষবাবু কম কথা বলেন। তাঁর জীবন প্রবাহের মধ্যেই ভাগ্যের এক বিচিত্র পরিহাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ছাত্র ছিলেন। ইস্কুল-ইন্সপেক্টারের চাকরি করতেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় চাকরি ছেড়ে চলে এসেছেন। চাকরি ছাড়ার মত সহজ কাজ সংসারে নেই। কঠিন কাজ হোল, নতুন একটি সংগ্রহ করা। ঘোষবাবু সেই কঠিন কাজটি করে উঠতে পারেন নি। স্ত্রীর গয়নাপত্র বিক্রি করে বাজারে একটি মুদিদোকান দিয়েছিলেন। বিধিলিপি

এমন—এত জায়গা থাকতে কোন লোক তাঁর দোকানের সামনে বসে কচ্ছপের মাংসের দোকান খুলে বসল। সে দোকানে খুব ভীড়। বিক্রেতা মহা উৎসাহে একটির পরে একটি তার জ্যান্ত-পণ্য হত্যায় ব্যস্ত। সে বীভৎস দৃশ্য অতিক্রম করে কোন ক্রেতা ঘোষবাবুর দোকানে যেতে চায় না। ফলে ক্রেতার অভাবে দোকান যায়-যায়। তিনি বললেন: ফ্রান্সের ভার্সাইতে যত্ন করে রেখে দেওয়া বারুদের কণা কুড়ি বছর বাদে আগুন ছড়াতে আরম্ভ করল।

দুলাল: আমাদের মত মূর্খ মানুষগুলো যে কথা বুঝতে পেরেছিল, ওদের মত বড় বড় রাজনীতিবিদ সে কথা সেদিন বুঝতে পারল না। ওরা ভেবেছিল বিজিতকে দিয়ে নাকে খত দেওয়াতে পারলেই, জয়ের আনন্দ শেষ হোল। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা কি এত সহজে হয়? তাই আগুন জ্বলে উঠল।

নরেশদার পুলিশের চাকরী। ভয়ে কথা বলতে হবে। তিনি ফিস ফিস করে বললেন: ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর দু কোটি লোকের প্রাণ বলি দিয়ে বিশ্বযুদ্ধের অস্ত্র-সংবরণ হোল। আবার ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে জার্মানীকে দিয়ে চরম অপমানজনক সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিয়ে নিল।

সতীনাথ: অনেকে বলে, সে যুদ্ধের মৃত্যু সংখ্যা চার কোটি।

দুলালবাবু বললেন: দশকোটি বললেই বা ক্ষতি কি? কে আর গুনেছে রে ভাই? ঐ ডামাডোলের মধ্যে লোকে নিজের প্রাণ বাঁচাবে না মরা মানুষ গুণবে? যা হোক একটা কিছু বললেই, হোল। উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য বরাহপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, আকাশে কয়টি তারা? পণ্ডিত বলতে পারলেন না। আমার মনে হয় আমাদের হরিপদও বলতে পারত। একথায় সকলে হেসে উঠল।

হাসি শেষ হলে হরিপদ বলল: তা সে দু'কোটি আর চার কোটি যাই হোক, আমাদের কিছু আসে যায় না। দু'এক কোটি এদিক ওদিক হলে, আমাদের বসুমতীর রক্তস্নানের আনন্দ কম বেশী হবে

না। বৃহৎ ব্যাপারে একটু গণ্ডগোল হবেই। সামান্য একটা ট্রেন দুর্ঘটনা হলে সরকার বলে মৃত্যুসংখ্যা পঞ্চাশ, খবরের কাগজ বলে একশ; আবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে প্রত্যক্ষদর্শি বলে—সে নিজের চোখে দেখে এসেছে যে, রাতের অন্ধকারে ওয়াগন ভর্তি করে মৃতদেহ স্থানান্তর করেছে।

ঘোষবাবুঃ সে যাই হোক, জার্মানীর অপমানের বদলা নেবার লোক এবার এসে পড়েছে।

বরুণবাবু এতক্ষণ কানের পেছনে হাত রেখে সবকিছু শুনছিলেন। এবার কথা বললেন: কিন্তু এই হিটলার ভদ্রলোকের জার্মানীর জন্য এত মমতা কেন? তিনি বা তার পূর্বপুরুষ জার্মানীর লোক ছিলেন না। এমন কি রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা অধিকার করবার কিছুদিন আগেও তিনি জার্মানীর নাগরিক পর্যন্ত ছিলেন না। ওর জন্ম অস্ট্রীয়াতে।

দুলালবাবু বরুণকে উত্তেজিত করবার জন্য যোগ করলেন: ঐ হিটলারতো বিশ্বযুদ্ধে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কত কষ্টে দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। তার আবার অত তেজ!

বরুণ: পূর্বপুরুষদের পদবী হিয়েডলার পরিবর্তন করে উনি হলেন হিটলার। আর হবে না কেন? ওর কি পরিচয় দেবার মত পূর্বপুরুষ আছে নাকি? ওতো পিতৃপরিচয়হীন। ওর বাবা যোহানজর্জ কুমারী মায়ের সন্তান।

হরিপদবাবু উত্তেজিত সুরে বললেন: তা হোক-না পিতৃ-পরিচয়হীন। অমন অনেক কুমারী মায়ের সন্তান আপনাদের ঠাকুর দেবতা হয়ে আছেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, মহাভারতের কর্ণ, উপনিষদের সতকাম—এরা সকলেই হয় পিতৃপরিচয়হীন, না হয় কুমারী মায়ের সন্তান।

দুলালবাবু গড়গড়ায় দুটো টান দিয়ে বললেন: যুদ্ধ জিনিষটি বড় ভয়ঙ্কর—কি বল বরুণ?

কথাটি আস্তে বললেও বরুণবাবু শুনতে পেয়েছেন। তাঁর চোখে-

মুখে উদ্দীপনা ফুটে উঠল। তিনি পুনরায় বললেন: এসব অবোধের গোবধে আনন্দ। যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের কথা গীতাতেও লেখা আছে। তার মধ্যে বর্ণসংকরের কথা পর্যন্ত রয়েছে। সেইসব হবে আর কি!

হরিপদবাবু অন্যদিকে মুখ করে বলল: তোমার বাঁজা বৌ। তোমার আর বর্ণসংকরের ভয় কিসের?

বরুণবাবু তো শুনতেই পান নি। অন্য সকলেও এই অশালীন কথা শুনে বিব্রত হয়ে পড়ল। বরুণবাবু এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে না পেরে যখন উঠে পড়লেন, তখনই প্রিয়নাথ সামনে এসে হাজির হোল।

প্রিয়নাথকে দেখে দুলালবাবু সহ সকলে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠল: এই যে প্রিয় অফিস-পাড়া থেকে এলো। কিহে, অফিস-পাড়ায় কী দেখে এলে?

চারুশীলা-প্রসঙ্গের ভয়ে প্রিয়নাথ তিনদিন অফিসে না গিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, সেকথা কেউ জানে না। প্রিয়ও সে কথা জানাতে চায় না। কিন্তু অফিস-পাড়ায় হঠাৎ দ্রষ্টব্য জিনিষের কৌতূহলের কথা শুনে সে ফাঁপরে পড়ল। হরিপদবাবু বললেন: সাহেবদের মুখ শুকিয়ে উঠেছে না?

এইবার প্রিয়নাথ বুঝতে পারল, রাস্তায় আসতে আসতে সে খুব হট্টগোল দেখেছে। টেলীগ্রামের খবর নিয়ে খুব হৈচৈ লেগেছে। হকাররা চিৎকার আরম্ভ করেছে—লড়াই লাগ্ গিয়া, লড়াই লাগ্ গিয়া। প্রিয়নাথ এক পয়সা দিয়ে একটি টেলীগ্রাম কিনেছিল। তাও আবার অন্য কে-একজন ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেল। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের চেয়েও বড় সংবাদের জন্য প্রিয় অপেক্ষা করতে লাগল। আনন্দ বলে দিয়েছে, তার অফিস থেকে কে একজন মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে এসে বসে আছে। কিন্তু কোথায় সেসব? সাহেবদের মুখ উৎকণ্ঠায় কতখানি শুকিয়ে উঠেছে, সে

সংবাদ সংগ্রহ না করেই সকলে উঠে পড়ল। সকলে চলে যাবার পরেও বড়দা তুলালচন্দ্র প্রিয়নাথের উদ্বেগের প্রসঙ্গ কিছুমাত্র তুললেন না দেখে সে ধীরে ধীরে ভেতরের দিকে চলে গেল। মিষ্টির হাঁড়ি আর ভদ্রমহিলার কথা রহস্যই থেকে গেল। বড়দাকে নিজে থেকে জিজ্ঞাসা করতেও দ্বিধা। কারণ প্রসঙ্গটার মধ্যে স্ত্রীলোক জড়িত এবং তা কতখানি জড়িয়েছে, সে কথাতো সে জানে না।

প্রিয়নাথকে দেখে তার বড় বৌদি প্রসন্নবালা দেবী একগাল হেসে বললেন : তুই অফিসে বসে থাকলি। আর এদিকে এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত। এতক্ষণ বসে থেকে এইমাত্র উঠে গেলেন।

: তা সে ভদ্রলোকের নাম কী ?—অনেক উত্তেজনা চেপে কথাটা সে নিরাসক্ত কণ্ঠে বলবার চেষ্টা করেছে।

: আমি কি ভদ্রলোককে দেখেছি না কি ? তোমার দাদা সব জানেন।

প্রিয়নাথ মনে মনে ভাবল, দাদাতো জানেন, সে কথা আমিও জানি। কিন্তু তিনি না বললে আমি কী করব ? সে জিজ্ঞাসা করল : ভদ্রলোক কি একলাই এসেছিলেন ?

সঙ্গে একটি মেয়েও এসেছিল।—এই কথা বলে প্রসন্নবালা অকারণে একটু হেসে ফেললেন। ভাবখানা এই, ঘটনা সবই প্রিয়নাথের নির্দেশে পরিকল্পিত। সে পরিকল্পনাকে প্রসন্নবালা যেন সস্নেহে প্রশ্রয় দিলেন। তার পরেই প্রিয়নাথের মুখখানা ভালভাবে দেখে নিয়ে মৃদু হেসে বলে ফেললেন : মেয়েটি আমার কাছে খুব ভাল লাগল। তোর কেমন লাগে ?

: কি আশ্চর্য ! কে এসেছিল, আমি তাই জানি না। ভাললাগা মন্দলাগা কী করে বলব ?

বৌদি হলেও প্রসন্নবালা মায়ের বয়সী। তাঁর এই ইঙ্গিতে

প্রিয় যেন বিব্রত হয়ে পড়ল। মুখের কোন পরিবর্তন হোল কি-না, কে জানে। প্রসন্নবালা বেশ উপভোগ করলেন। তিনি বললেন: এইরকম একটি মেয়ে বাড়িতে বউ হয়ে এলে বেশ হয়।—তিনি আবার গভীরভাবে প্রিয়নাথের মুখখানা দেখতে লাগলেন।

প্রিয়নাথের তখন বিব্রত অবস্থা। দরকার নেই নামধাম জেনে। জেরার হাত থেকে মুক্তি পেলে সে বাঁচে। আনন্দটাও এমন হাঁদা! কিছু খোঁজ খবর নেওয়া নেই; মিষ্টির হাঁড়ি আর রূপের হাঁড়ির খবর নিয়ে গিয়ে হাজির। এর মধ্যে দুলালচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে প্রিয়নাথের নাম ধরে হাঁক দিলেন। বড় বৌদি বললেন: ঐ যে সব শোন গিয়ে।—দুর্গানাম শরণ করে প্রিয়নাথ বড়দার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। মিষ্টির হাঁড়ির কথা শুনে প্রথমেই তার অম্বিকাদার কথা মনে হয়েছিল। তার সঙ্গে মহিলার কথা শুনে ভেবেছিল, হয়ত বিষ্ণুপুরের কাছে কোন এক গাঁয়ে মাকড়সার জালে জড়ান সেই ফটোখানার মধ্যে অম্বিকাদার পাশে বসা সেই ভদ্রমহিলার কথা। কিন্তু এ যে বড় বৌদি বৌ করে আনতে চায় আর প্রিয়নাথের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসেন। কী জানি! এ আবার কোন রূপ! সংসারে কতরূপ!

* * *

তিনদিন অফিস কামাই করে অনেকটা অপরাধীর মন নিয়ে অফিসে পা দিতেই সদাশিবনের সঙ্গে দেখা। দশটা বাজতে তখনও কিছুটা দেরি আছে। সকলে অফিসে এসে উপস্থিত হয়নি। প্রিয়কে দেখে সদাশিবন যেন হাতে চাঁদ পেলো। সে তাড়াতাড়ি প্রিয়র দুখানা হাত ধরে বলল: প্রিয়দা, আপনি এসেছেন! আমি যে কী বিপদে পড়েছি! ঐ ক্যান্টিনের দিকে চলুন। এখানে বলা যাবে না।

দু'জনে ক্যান্টিনে গিয়ে দু কাপ চা নিয়ে নিরিবিলি বসল। তারপর সদাশিবন বলল: আপনিও পাস নিয়ে গেলেন; আর সেইদিন থেকেই আপনাদের থিয়েটারের একটি মেয়ে নাকি রিহারসালে আসা

বন্ধ করল। একদিন গেল, দু'দিন গেল, না এলেন আপনি; না এলো সে মেয়েটি। তারপরে কোথা দিয়ে কি হল জানি না, সকলে এসে আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যারা ওসব থিয়েটারের মধ্যে নেই, তাদেরই আক্রোশটা যেন বেশী। আমাকে এই মারে তো সেই মারে! বলে, তুমি প্রিয়নাথকে ওয়াইফ-এর পাস দিলে কেন? ও কি বিয়ে করেছে? আমি বলি, নিশ্চয়ই বিয়ে করেছেন। বিয়ে না করলে, তিনি ওয়াইফ-এর পাস নেবেন কেন? তা কে কার কথা শোনে? ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কাপুর সাহেবের কাছে চলে গেল। কাপুর সাহেব আমাকে নিয়ে টানাটানি।—এই পর্যন্ত বলে সদাশিবন প্রায় কেঁদে ফেলবার অবস্থা।

ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়—এইভাবে প্রিয়নাথ বলল: আমাকে নিয়ে তোমার এতটা বিড়ম্বনা হয়েছে জেনে আমি খুবই দুঃখিত। যাই হোক, এখন তো আমি এসে গিয়েছি; তোমার আর কিছু চিন্তা নেই।—দুজনে নিজ নিজ জায়গায় চলে গেল।

ক্লাবের কম-বয়সী সদস্যরা কিছুই না-জানার ভান করে প্রিয়নাথের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। সমবয়সীরা রহস্যময় হাসি যথাসম্ভব গোপন করে রিহারসালের বিপর্যয়ের কথা আলাপ-আলোচনা করল। এক সময়ে সম্পাদক অনিল নন্দী একখানা চেয়ার টেনে বসে বলল: লালবাঈ তো ডকে উঠল, প্রিয়দা।

প্রিয় জিজ্ঞাসা করল: কেন ভাই?

: চারুশীলাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রিয়নাথের বুঝতে বাকি থাকল না যে, অনিল নন্দী সবকিছু জেনেশুনেও না-জানার ভান করছে। সে বলল: পাওয়া যাচ্ছে না, তবে কোথায় গেল?—অনিল বলল: আমি তো পুলিশে কাজ করি না, প্রিয়দা। ও কথার আমি জবাব দেব কী করে?

প্রিয় শান্তভাবে বলল: দরকারটা যখন আমাদের, একটু খোঁজ নিলে দোষ কী?

নন্দী বলল : ওসব কাজ আমার দ্বারা হবে না, প্রিয়দা। থিয়েটারের দরকারে মেয়ে মানুষ আনাই বটে। কিন্তু তাদের সঙ্গে ঢলাঢলি করাটা পছন্দ করি না।

: ঢলাঢলি না করেও একটা মানুষের খোঁজ করা যায় না ?

: আমি পারি না। আমি ওদের বাড়িতে কোন দিন যাই না। ওসব পল্লী ভদ্রলোকদের যাতায়াতের জায়গা নয়।

প্রিয়নাথ মাথাটা একেবারে নীচু করে কী যেন একটা কাগজ একেবারে চোখের সামনে নিয়ে এসে আস্তে আস্তে বলল : ওসব নোংরা পল্লীতে যাবার দরকার কি ? ভাগীরথীর বুকে পানসী ভাসিয়েও ওদের ডেকে আনা যায়।

আর একটি কথা নয়। কোথায় আঘাত লাগল কে জানে। চোখের পলকে অনিল নন্দী চেয়ার ছেড়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার গতিপথের দিকে তির্যক ভঙ্গিতে দেখে নিয়ে প্রিয়নাথ বুঝল— নাটককে প্রস্তুতির পথে এগিয়ে নিতে গেলে দুস্তর সাধনার প্রয়োজন। সে ধৈর্য প্রিয়নাথের বুঝি নেই। শুধু নায়ক দিয়েতো নাটক হবে না। কিন্তু এর আর্থিক দায়দায়ীত্ব সবই অনিল নন্দীর। এই মধ্য পথে নাটক বন্ধ হয়ে গেলে যেসব অর্থ আগেই ব্যয় হয়েছে, তার কী হবে ? শেষ পর্যন্ত সব অপরাধের বোঝা প্রিয়নাথের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। প্রিয়নাথের অস্বীকার করবার পথ নেই। অবিবাহিত প্রিয়নাথ শুধু স্ত্রীর জন্য পাস নিয়েই ক্ষান্ত থাকেনি। সরকারী কাগজপত্রে সস্ত্রীক ভ্রমণের কথাও কালির অক্ষরে লেখা আছে। বিষণ্ণ মন নিয়ে সেদিন কোন কাজ সে করতে পারেনি। কাপুর সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি নিজে অনেক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত আছেন। কিন্তু তাঁর ভীষ্মের মত কোন প্রতিজ্ঞা নেই অথবা শুকদেবের আদর্শে চলাফেরা করেন না। মানুষের দেহে বয়সের প্রভাবকেও তিনি অস্বীকার করেন না। তিনি প্রিয়নাথকে ডেকে বললেন : ইউ কুড হ্যাভ ডান দিস মোর ক্লেভারলি, প্রিয়া।

প্রিয়নাথ অখণ্ড নীরবতা নিয়ে কাপুর সাহেবের কথাগুলো শুনে বেরিয়ে এসেছিল। কাপুর সাহেব ডেকেছে শুনেই সকলে বেশ উৎসাহ বোধ করছিল। প্রিয়নাথ মনমরা হয়ে বেরিয়ে আসাতে সেই উৎসাহটা আশাতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আশাটা নিরাশ হয়ে গেল।

পাঁচটা বাজতেই রিহার্সালের কি হয় না হয় দেখবার জন্য অপেক্ষামাত্র না করে প্রিয়নাথ অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল। মনটা একেবারে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। কিন্তু অনিল নন্দী থেকে আরম্ভ করে সদাশিবন পর্যন্ত কোন লোকটিকেই সে দায়ি করতে পারল না। এমনকি সেই অন্তর্ধান হয়ে যাওয়া চারুশীলা পর্যন্ত তার কাছে নিরপরাধ বলে মনে হতে লাগল।

সাধ করে হোক আর গ্রহের ফেরেই হোক, চারুশীলা সংসারের এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, যেটা মানুষের সহজ চলার পথে নয়। দুর্গম সেই যাত্রায় তার পথ-চলা যদি সকলের মনোমত না হয়, তবে তার দুর্ভাগ্যকে সমবেদনা জানানো যায়; কিন্তু দোষ বুঝি দেওয়া যায় না। নাটক বন্ধ হয়ে গেলে তার দায়ভাগ যদি প্রিয়নাথের ওপরে এসে পড়ে, তবে দোষ দেবে কাকে?

কফি হাউসে এসে এক কাপ কফি নিয়ে সে অনেকক্ষণ কাটাল। তারপর দেহমন কিছুটা শান্ত হোলে বেরিয়ে এলো। গলিপথ দিয়ে সে যখন ট্রাম রাস্তার দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন বেশ অন্ধকার। সেই অন্ধকার গলিপথে পেছন থেকে কে ডাকল—'প্রিয়দা'। ঐখানেই চারুশীলাও একদিন 'প্রিয়দা' বলে ডেকেছিল। সেদিন বেশ রাত হয়েছিল। কণ্ঠস্বরটা ছিল স্ত্রীলোকের। কিন্তু আজ কণ্ঠস্বর পুরুষ মানুষের, আর সময়টা সন্ধ্যা। মহিলার কণ্ঠস্বর হলে প্রিয়নাথ ফিরে তাকাত না। রমণী-কণ্ঠে সাড়া দিয়ে তার খুব পরাভব হয়েছে।

প্রিয়নাথকে অবাক করে দিয়ে সেই পানের দোকান থেকে চৌধুরীবাবু বেরিয়ে এলো। মিষ্টার এ. চৌধুরী, ক্যালকাটা,

জেনেরাল মারচ্যাণ্ট। বিষ্ণুপুরের রাজার কাছে চৌধুরীর দেওয়া নিজের পরিচয়। চৌধুরীবাবু এগিয়ে এসে প্রিয়র পায়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। প্রিয়র ভয় হোল—পায়ের ধূলো নেবার পরিকল্পনা কি-না কে জানে! ভয়ে সে দু'পা পিছিয়ে গেল। চৌধুরী দু'পা এগিয়ে এসে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বিনয়ে গদগদ হয়ে বলল: এই রাস্তার মাঝখানে আর পায়ের ধূলো নেবার চেষ্টা করব না। কিন্তু আপনাকে দেখলেও লোভ সংবরণ করা কঠিন। সেকথা যাক। আমি যে আপনাকে কী খুঁজেছি, তা কি আর বলব! শেষকালে আপনার অফিস থেকে ঠিকানাটা সংগ্রহ করে কাল একেবারে বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। কাল যা দেখে এসেছি, তা আর জীবনে কোন দিন ভুলব না। সে একেবারে দেব-দর্শন বললেই হয়। আপনার দাদা আর বৌদি স্বর্গের দেবতা বললেই হয়। তা আমি প্রাণভরে পায়ের ধূলো নিয়েছি। ওঁদের কথা শুনেছি। সে তো কথা নয়; যেন অমৃত।

অলংকার শাস্ত্রে চৌধুরীর অধিকার আছে—এমন কথা প্রিয়নাথ আশা করে না। করলে, অবাক হোত। কথা শ্রবণযোগ্য আর অমৃত আস্বাদন-গ্রাহ্য। সুতরাং একটির সঙ্গে অপরটির তুলনা চলে না। কিন্তু সেসব বিচারের তখন অবকাশ নেই। প্রিয় বলল: আপনি কাজটি ভাল করেন নি।

সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরীর উজ্জ্বল মুখখানা মলিন হয়ে উঠল। সে বলল: দাদা-বৌদি বিরক্ত হয়েছেন বুঝি?—একটু চুপ করে পুনরায় বলল: তরু আমাকে আগেই সাবধান করেছিল।

প্রিয়নাথ এতক্ষণে বুঝতে পারল, তার বড় বৌদি যে মেয়েটিকে প্রায় বধূ নির্বাচন করে ফেলেছেন, সে পাত্রীটি এই তরু। সে বুঝতে পারল, অনেক কাহিনী তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। প্রায়ান্ধকার গলিপথে অসংখ্য লোকের দৃষ্টিগোচর হয়ে সে কাহিনী শোনা যাবে না। সে বলল: চলুন, ঐ কার্জন পার্কে গিয়ে বসি।

চৌধুরী বলল ঃ সে কথা মন্দ নয়। তবে তরুকেও ডাকি।

তরু নামে নায়িকা এতখানি হাতের কাছে—একথা প্রিয়নাথ প্রত্যাশা করেনি। চৌধুরী ডাকতেই তরু এগিয়ে এলো। চারু যেমন বেরিয়ে এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবে পানের দোকানের অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো। গরমিলের মধ্যে এই—তরুর মুখে বা হাতে পান ছিল না। কাছে আসতেই চৌধুরী উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল ঃ তরুঙ্গিনী, এই নাও—একেবারে সামনে এনে হাজির করেছি, প্রণাম কর। সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বলেছেন না যে, বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছেড়ে কোথায়…।

সাহিত্য পুরাণ-ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করতে গেলে চৌধুরী কণ্ঠস্বরটা একটু উঁচু পর্দায় রাখে। কারণ ওসব কঠিন বিষয়ে তার অধিকারের কথা সে খুব গোপন করতে চায় না। কিন্তু কেউ শুনে ফেলল কি না—এই ভয়ে প্রিয়নাথ এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। সে তাড়াতাড়ি ও প্রসঙ্গ বন্ধ করতে বলল ঃ সেসব থাক, চলুন ঐ পার্কে গিয়ে বসি।

চৌধুরী একটু ইতস্ততঃ করে বলল ঃ শুনেছি—সন্ধ্যার পরে ঐ কার্জন পার্কে কিছু কিছু উৎপাৎ হয়। এই তরুটা সঙ্গে রয়েছে কিনা।

তরঙ্গিনী সঙ্গে থাকলে সন্ধ্যার পরে কার্জন পার্কে কতখানি বিপদের আশংকা, তাই অনুমান করতে প্রিয়নাথ এতক্ষণে তার দিকে তাকাল। বড়বৌদি প্রসন্নবালা এর মত একটি মেয়েকে বৌ করে নেবার ইচ্ছা করেছেন। আত্মীয় অনাত্মীয় আপন পর সকলেই প্রিয়নাথকে চিরদিন কিছুটা অল্পবুদ্ধি বলে ভাবে। এই কথা শুনে শুনে সে নিজেও নিজেকে তাই মনে করে। তবুও সে ভাবল, প্রসন্নবালার এই ইচ্ছাপ্রকাশের মধ্যে তাঁর আন্তরিকতা বুঝি খুব বেশী নেই। তিনি প্রিয়নাথের মনটা বোধহয় পরীক্ষা করতে চেয়েছেন মাত্র। বোধহয় তিনি দেখতে চেয়েছেন, ঐ মিষ্টির হাঁড়ি

আর রূপের ভাণ্ডার হঠাৎ এসে পড়ার মধ্যে প্রিয়নাথের কিছু অবদান আছে কিনা। প্রিয়নাথের ষড়যন্ত্র অনুমান করেই বোধহয় তুলালচন্দ্র প্রিয়নাথের সঙ্গে নিজে কোন কথা বলেন নি। প্রসন্নবালাকে দিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নিতে চেয়েছেন।

চৌধুরীকে অভয় দিয়ে তিনজন পার্কের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল।

চৌধুরী বলল: আপনাকে বলেছিলাম—প্রিয়দা—একদিন দেখাব? তা আমাদের সব বাড়িতে তো আপনাদের মত বিশিষ্ট লোককে নিয়ে যেতে পারি না। তাই কাল ওকে নিয়ে আপনাদের বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম। তা ওর যেমন কপাল, আপনার দেখা পেলাম না। আজ সকালে আমি একা আবার আপনাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম। শুনলাম, আপনি আজ অফিসে এসেছেন। ভাবলাম, এই পথে ফিরবেন। তাই ওকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

প্রিয়নাথের মনে পড়ল। চৌধুরী বলেছিল, তার ঘরে সুন্দরী স্ত্রী আছে। সে এমন রূপ যে, দেখলে প্রিয়নাথের মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এই তরঙ্গিনীই তবে চৌধুরীবাবুর স্ত্রী। সে আর একবার ভাল করে মাথায় হাত দিয়ে দেখল—খারাপের কিছু লক্ষণ বোঝা যায় কিনা। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করল, চারুশীলার কোথায় স্বামী কোথায় কী, ঠিক নেই। তবুও সারা অঙ্গে এয়োতীর বসন-ভূষণ। কিন্তু চৌধুরীর এত কাছে থেকে তার স্ত্রী তরঙ্গিনীর শাঁখা-সিঁদুর কিছু নেই। সংসারের বিচিত্ররূপ। নানা মুনির নানা মত। আজকাল ছেলে-ছোকরাদের মতিগতির স্থিরতা নেই। কেউ হয়ত সুইট সিক্সটিনের কুমারী পছন্দ করে, কেউবা পরস্ত্রী। তাই ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে সবরকম আয়োজন চৌধুরী হয়ত হাতের কাছে রেখেছে। যে দেবতা যাতে তুষ্ট। তা রাখুক। সে জিজ্ঞাসা করল তা আমাকে এত খোঁজাখুঁজি কেন?

: কি যে বলেন প্রিয়দা! আমার মুখে সব কথা শুনে এই তরু আপনাকে একবার প্রণাম করবার জন্য একেবারে পাগল হয়ে

উঠেছে! বিশ্বাস না হয়, নিজের কানে শুনুন। বলনা তরঙ্গিনী। এখন আর মুখে কথা নেই কেন? জানেন তো, লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ?

ঃ জানি বৈকি! কিন্তু সেই প্রণামের কাজ তো হয়েই গেছে।

চৌধুরী তরঙ্গিনীর পিঠে একটা আঙ্গুলের খোঁচা দিয়ে বলল: চুপ করে বসে আছো? নিজের মুখে বল না। প্রিয়নাথ ভয় পেল, তরঙ্গিনী কি কথা নিজের মুখে বলে বসবে—এই কথা চিন্তা করে। তার বড় বৌদি প্রসন্নবালা হাসি হাসি মুখে যে ইঙ্গিত করেছেন, তাই বলে বসবে না-কি কে জানে! আবার মনে হোল, বড় বৌদির কাছে কি কথা বলে এসেছে—তাও সে জানে না। কিন্তু খোঁচা খেয়েও তরঙ্গিনী কোন কথা না বলে মাথা নিচু করে বসে থাকল। তখন চৌধুরী বলল ঃ তাহলে আমিই বলি। তরু অভিনয় লাইনে আসতে চায়।

এতক্ষণে প্রিয়নাথের বুক থেকে পাষাণ নেমে গেল। সে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল ঃ ভালই তো।

চৌধুরী পুনরায় তরুকে একটা খোঁচা দিয়ে বলল ঃ এই দেখ, আমি বলেছি না? এঁরা সব মানুষ নন, দেবতা। তাহলে আমি বলি, প্রিয়দা, আপনি লালবাঈ-এর জন্য একেই নিন। আপনি শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে···

কিছুই না জানার ভান করে প্রিয় জিজ্ঞাসা করল ঃ তাহলে চারুশীলার কি হবে?

চৌধুরী দুই চোখ কপালে তুলে বলল ঃ সে কি! আপনি জানেন না? চারু তো হাওয়া। তারপর এদিক ওদিক একটু দেখে নিয়ে গোপনীয় কথা বলার মত কানের কাছে মুখ এনে বেশ জোরে জোরেই বলল ঃ একেবারে নচ্ছার। বুঝলেন প্রিয়দা, বেহদ্দ নচ্ছার।

প্রিয়নাথ ছেলেবেলায় ব্যাকরণে নচ্ছার এর সন্ধি প্রকরণ

পড়েছে। কিন্তু অর্থবোধ হয় নি। চারুকে কিছু কিছু দেখেছে এবং জেনেছে। কিন্তু চরিত্রের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের জন্য এই বিশেষণে ভূষিত হোল কে জানে! সে সংক্ষেপে নিরাসক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল: কী হোল?

: কী আবার হবে? সেই ছোকরাকে নিয়ে সে কি ছেনালী, কি ছেনালী!

: তা সে ছোকরার সঙ্গে বসবাস কোথায় করছে সে?

: কোথায় আবার? বিষ্ণুপুরে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি ঘেন্নার কথা!—চৌধুরী বোধহয় চরিত্রের এতখানি অধঃপতন কোনদিন দেখেনি। কিন্তু প্রিয়নাথের মনে বড়ই সংশয়। সে বলল: আমরা যেদিন এলাম, তার আগের দিনই তো সে কলকাতায় চলে এলো?

চৌধুরী তখন গাভী এবং গোবৎসের তুলনা দিয়ে হাসতে লাগল। এতবড় একটা চমকপ্রদ সংবাদ সরবরাহের কৃতিত্বে সে বেশ গর্ববোধ করতে থাকল। ততক্ষণে ঘৃণা তার মন থেকে একেবারে দূর হয়েছে। তখন শুধুই গৌরব। সে গোপনে বলার কপট ভঙ্গিতে বেশ উচ্চস্বরে বলল: নোংরামিতে এ একেবারে সাবিত্রীকেও হার মানিয়েছে।

প্রিয়নাথ আবার সংশয়ে পড়ল। কোন সে সাবিত্রী, যার সব গৌরব চারুশীলার কাছে ম্লান হয়ে গেল?—জিজ্ঞাসা করল: কোন সাবিত্রী?

চৌধুরী বলল: অবাক করলেন, প্রিয়দা। শাস্ত্রের কথা আপনাকে বুঝিয়ে দিতে হবে? সেই বিশ্বামিত্র মুনি বনে তপস্যা করতে গেলে তাঁর স্ত্রী সাবিত্রী দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে কুলত্যাগ করেছিলেন না? কিন্তু মুনি ফিরে এসে অভিশাপ দিয়ে তাকে পাথর করে দিয়েছিল। একে টিট করবে কে?

প্রিয় বুঝতে পারল, পুরাণ-ইতিহাসের কথা এসে পড়েছে। মহর্ষি গৌতমের অনুপস্থিতিতে তাঁর স্ত্রী অহল্যার দেবরাজের

অনুগামিনী হওয়ার কাহিনী। সে তাড়াতাড়ি বলল: আপনি চারুশীলার কথা বলুন।

চৌধুরী বলল: চারুশীলার কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যায়, প্রিয়দা। খবর পেয়ে আমি গিয়েছিলাম। একেবারে কুকুর বেড়ালের মত দূরদূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। যদি বিশ্বাস না-করেন, চলুন আমার সঙ্গে। সে ছোকরার ঢং দেখলে আপনার পিত্তি জ্বলে যাবে। কলেজের মাষ্টারী না ছাই। আর ঐ মেয়েমানুষটার নষ্টামির কথা না হয় নাই বললাম। দুধ নষ্ট হলে ছানা অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু মেয়েমানুষ নষ্ট হলে আর কিছু থাকে না, প্রিয়দা।

*　　　*　　　*

থিয়েটার করা প্রিয়নাথের নেশা। নেশা করলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। প্রিয়নাথেরও তাই মাঝে মাঝে ভালমন্দ বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। তা না হলে থিয়েটারের নটীকে বৌ সাজিয়ে সে প্রমোদ ভ্রমণে যাবে কেন! পরিণাম চিন্তা করেনি। অপরিণাম-দর্শিতার ফল তাকে ভুগতে হয়েছে। বিষ্ণুপুরের হোটেলে চারুশীলা তাকে পরাভবের টিকা পরিয়ে দিয়েছে। কোন এক অজ্ঞাত-কুলশীলের সঙ্গ কামনায় সে প্রিয়নাথকে সঙ্গ-ছাড়া করেছে। তা পরাভব হয়েছে বলে কি প্রিয়নাথ নেশা ছাড়তে পেরেছে? ঐ নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়েই প্রিয়নাথ একদিন নাট্যাচার্য দিলীপ কুমারকে একটি চিঠি লিখে বসেছিল। চিঠিখানা এই:

শ্রদ্ধেয় নাট্যাচার্য,

দর্শকের আসন থেকে রঙ্গমঞ্চে আপনাকে নানা রূপে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। সে রূপের শেষ নেই—কত-রূপ। কিন্তু তা সবই পাদপ্রদীপের আলোতে। 'পাদপ্রদীপ' কথাটি নিতান্তই আলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহার করলাম। আপনি পাদপ্রদীপের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন। আপনার রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপ জ্বলে না। রঙ্গজগতে এই বিস্ময়কর প্রণালীর প্রবর্তন আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য

করেছি। সে সব কথা ছেড়ে দিয়ে আমার নিবেদন, আপনাকে একটি নতুনরূপে দেখতে চাই। দিনের আলোতে একেবারে কাছে থেকে রূপসজ্জা-বিহীন নাট্যাচার্যকে একবার দেখবার বড় সাধ। অনুমতি পেলে সেই সাধ পূর্ণ করব। ইতি—

গুণমুগ্ধ প্রিয়নাথ ভট্টাচার্য।

উত্তরের প্রত্যাশা করেনি। অমন কত গুণমুগ্ধ নিত্য তাঁকে দেখতে চায়। কিন্তু অত দর্শন দেবার তাঁর সময় কোথায়? তবুও অপ্রত্যাশিত ভাবেই একদিন আমন্ত্রণ জানিয়ে দিলীপ কুমারের চিঠি এসে হাজির হোল। সেই চিঠি নিয়ে নির্ধারিত দিনে প্রিয়নাথ নাট্যাচার্যের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হোল।

একজন ভদ্রলোক প্রিয়নাথকে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে জানাল: বড় কর্তা বিশেষ কাজে একটু বেরিয়েছেন। তিনি আপনাকে বসতে বলেছেন। আপনার নাম প্রিয়নাথবাবু তো?

প্রিয়নাথ বিস্মিত হোল। এও বোধহয় বিরাট প্রতিভারই একটি দিক। তা না হলে তার মত একজন সাধারণ মানুষের কথা মনে রেখে তিনি যথাযোগ্য নির্দেশ রেখে যাবেন কেন?

প্রিয়নাথ বসে পড়ে ঘরখানা দেখতে লাগল। দরজা জানলাগুলো বাদ দিয়ে মস্তবড় ঘরখানার চারদিকে বড় বড় আলমারি দিয়ে দেয়াল ঢাকা। সেই আলমারিগুলো সবই বই দিয়ে ভর্তি। প্রিয়নাথের নিজেকে বড় অকিঞ্চিতকর মনে হোল। সে নিজেও অভিনয় করে। কিন্তু তা বুঝি ধৃষ্টতা। তার মনে হোল, কোন একটা নাটকের বই-এর লাইনগুলো মুখস্ত করে আলোর রোশনাই জেলে হাত-পা নেড়ে বলে গেলেই বুঝি অভিনয় করা হয় না। তা না হলে ঐ ভদ্রলোক রাশিরাশি গ্রন্থের পাহাড়ের মধ্যে বসে থাকেন কেন?

প্রিয়নাথ ঘুরে ঘুরে বইগুলো দেখতে লাগল। কত নাটক—ইংরেজী, বাংলা। সেক্সপীয়র থেকে আরম্ভ করে পিরানদেল্লো, ইবসন্, বার্নাডশ, দীনবন্ধু মিত্র, গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল,

ক্ষীরোদপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শচীন সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়—কেউ বাকী নেই। দেশী-বিদেশী কত সাহিত্য সম্ভার, নাট্যশাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র, ইতিহাস, সমাজতন্ত্র; আরও প্রিয়নাথের জানা-অজানা কত গ্রন্থ। প্রিয়নাথ ভাবতে লাগল, অভিনয় করতে গেলে এসব পড়তে হয়? নাকি এসব নাট্যাচার্যের জ্ঞানপিপাসা নিবারণের উপাদান? একজন প্রতিভাদীপ্ত মানুষের দৃশ্যমান জীবনটার অন্তরালে নিরবচ্ছিন্ন সাধনার কথা না জেনে শুধু দেশময় খ্যাতির কথা শুনে ঈর্ষা করে শুধু নিজেকে অপরাধী করা। প্রিয়নাথের হঠাৎ নজরে পড়ল, নটী ডানকানের আত্মজীবনীখানার দিকে। বইখানি তার পড়া। ডানকান দ্বিচারিনী। কিন্তু তার প্রতিভার কথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। নিজেকে সে বড় ভালবাসত। নিজেকে কে না ভালবাসে? তবুও তার মধ্যে কম-বেশী আছে। তার হৃদয়ের মধ্যে প্রবৃত্তি বড় প্রবল ছিল। তার জন্য বিবেকের সঙ্গে সংগ্রামও কম হয়নি। প্রবৃত্তি যেমন ছিল, তেমনই তা নিবৃত্তির দ্বন্দ্বও ছিল। আর তাই নিয়েই ছিল তার আনন্দ আর বেদনা। আমাদের দেশে নটী বিনোদিনী 'আত্মকথা' লিখেছিল। তারও জীবনে বৈচিত্র্যের শেষ নেই। যখন তার নটী-জীবন ফলে ফুলে ভরে উঠল, তখনই সে রহস্যজনকভাবে রঙ্গমঞ্চ থেকে অন্তর্ধান করল। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদধন্য হয়েই বুঝি সে অন্য কোন রঙ্গে মেতে উঠেছিল। দেশের ও দশের রঙ্গজগৎ তাকে ধরে রাখতে পারল না। তা ডানকানই হোক আর বিনোদিনীই হোক, তারা নটী। পর-পুরুষের সঙ্গ করা তাদের পেশা। সে সঙ্গমস্থল রঙ্গমঞ্চ তো বটেই, তার আয়তন ছাড়িয়ে আরও দূরে দূরান্তরে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। সে সঙ্গ কতভাবে হয়, কতরূপে হয়। রূপ থেকে রূপান্তরই তাদের জীবনের পেশা। তাদের জীবন-দর্শন ভিন্ন। সতী-সাবিত্রীর জীবনাদর্শে তারা জীবন-ধর্ম পালন করে না। তবুও তাদের মধ্যে অনন্য প্রতিভা বিস্ময়কর হয়ে ওঠে। চৌধুরীবাবু কার্জন

পার্কে বসে বলেছিল—দুধ নষ্ট হয়ে গেলেও ছানা অবশিষ্ট থাকে ; কিন্তু মেয়েমানুষ নষ্ট হয়ে গেলে আর কিছু থাকে না। তা মেয়েমানুষ নষ্ট হয়ে যাওয়া বলতে, সে কী বলেছিল কে জানে। দুধতো অনেকেই ইচ্ছে করে নষ্ট করে নেয়। দই ছানা—এসবগুতো দুধের নষ্টরূপ। কিন্তু নষ্ট হলেও তার ভিন্ন আস্বাদ। সেই আস্বাদনের লোভে মানুষ ইচ্ছে করেই দুধ নষ্ট করে দেয়। নষ্ট না হলে বিনোদিনীর রূপ আমরা কি দেখতে পেতাম ? নষ্ট হয়ে যাওয়া স্ত্রীলোকের মধ্যেও বুঝি ভিন্ন আস্বাদ থাকে। সেই আস্বাদনের লোভেই মানুষ ঘরে রূপবতী যৌবনবতী স্ত্রী ফেলে রেখে নষ্টামীর প্রলোভনে ছুটে যায়। তারপরে কি হয়, সে কথা ভিন্ন। বৃন্দাবনের ছেলে ফণী দে বিশ্বাস সেই আস্বাদনের লোভে ছুটে গিয়েছিল আর প্রিয়নাথকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। সে এক বিচিত্র ইতিহাস।

এইসব কথা চিন্তা করতে করতেই পেছনে তাকিয়ে প্রিয়নাথ অভিভূত হয়ে গেল। সহাস্য মুখে চুরুট নিয়ে নাট্যাচার্য দিলীপ-কুমার দাঁড়িয়ে। গৌরবর্ণ চেহারা। মাথায় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু কম। ধবধবে সাদা ফিনফিনে ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবী আর পায়ে সাদা নাগরা জুতো। মুখে আপ্যায়নের সুমিষ্ট ভঙ্গি। প্রিয়নাথ একেবারে কাছে থেকে বিশ্ব-বিখ্যাত নটকে দেখে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তার পরেই সচেতন হয়ে প্রণামের জন্য এগিয়ে গেলে নাট্যাচার্য বললেন : ষ্টপ ইট। আপনি আমার অতিথি, বসুন।—বলে নিজে আসন গ্রহণ করলেন। চুরুটটি নামিয়ে রেখে দিলীপকুমার হাসিমুখে বললেন : আমি আপনাকে জানি। একে বরেন্দ্র সন্তান, তাতে আবার ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। আমার সম্মানিত অতিথি। অভুক্ত সেই অতিথিকে বসিয়ে রেখে আমি পাপে লিপ্ত হয়েছি। বলুন, কিসে পাপ-মুক্ত হতে পারি ? প্রিয়নাথের ততক্ষণে বিস্ময়ের আর সীমা নেই ? এতবড় অভিনেতা—যাঁর

প্রতিভার খ্যাতি দেশের সীমানা পার হয়ে চলে গিয়েছে, তাঁর এমন সদাসয় ব্যবহার। সে অতিকষ্টে নিম্নস্বরে হাতজোড় করে বলল: আমাকে আর অভিভূত করবেন না। মাথাটি ভীষণভাবে দুলিয়ে দিলীপকুমার বললেন: আপনি ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। নিশ্চয় শাস্ত্রাদিতে অধিকার আছে। অভুক্ত ব্রাহ্মণ অতিথিকে বসিয়ে রেখে স্বয়ং যমরাজ পাপের ভয়ে কিরূপ বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন, বলুন না? কোন উপনিষদের কাহিনী?

: আজ্ঞে আপনি বোধহয় কঠোপনিষদের নচিকেতা যমরাজ সংবাদের কথা বলছেন?

: এই তো ব্রহ্মতেজ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করেছে। বাজশ্রবস মুনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের শেষে মৃতকল্প গাভীগুলো দিয়ে ব্রাহ্মণ-দক্ষিণা দিচ্ছিলেন বলে বেচারা নচিকেতা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তারই পরিণামে সে চলে গেল যমের দুয়ারে। যমরাজ অনুপস্থিত। তিনদিন পরে ফিরে এলে, অতিথি ব্রাহ্মণ-কুমারকে অভুক্ত দেখে বিচলিত হয়ে উঠলেন। তারপরে অতিথির প্রশ্নে-প্রশ্নে যমরাজের বিড়ম্বনার কথা। তা আপনার প্রশ্ন করবার অধিকার অক্ষয় হয়ে থাকল। তার আগে শুধু বলুন, কী দিয়ে আপ্যায়ন করব? চা?

প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি বলল: আমি চা খাই না।

নাট্যাচার্য গভীর রসবোধের কণ্ঠস্বরে বললেন: তবে কি চা অপেক্ষা গুরুপাক কিছু পানীয়? অপরাধ নেবেন না। সকালবেলা বলে আর সুকুমার বালকের সরল মুখখানা দেখে আমি সেসব ভোজ্য পানীয় পরিবেশনের কথা প্রস্তাব করিনি। আমার নিজের অবশ্য সকাল-বিকাল কিছু নেই—সেসব কথা শুনেছেন বোধহয়? আমার মদ্যপান বিষয়ে ইতর-ভদ্র সকলে মিলে অনেক কাব্য-উপন্যাস সৃষ্টি করেছে—একথা আমি শুনেছি।

প্রিয়নাথ বড় সংকুচিত হয়ে পড়ল। রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলীপকুমারের অভিনীত 'জীবানন্দ' চরিত্রের কথা মনে পড়ল। ঐ চরিত্র অভিনয়ে

নাট্যাচার্যের দেশ-জোড়া খ্যাতি। সে কোন কথা বলতে পারল না। মাথা নীচু করে বসে থাকল।

দিলীপবাবু বললেন : লজ্জা কী ? এর নামই সোমরস। দেবতারা পান করতেন। দেবীরাও বাদ যেতেন না। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখেছেন না ? মহিষাসুর যখন বড় বেশী লাফালাফি আরম্ভ করল, তখন দেবী দুর্গা বললেন, "গর্জ গর্জ ক্ষণং মূঢ় যাবৎ মধু পিবাম্যহম্।" তা মধু মানেই তো ঐ পানীয়। এমন দেবভোগ্য জিনিষের কথা শুনে আপনি এত লজ্জা পেলেন কেন ?

প্রিয়নাথের জড়তা আর কাটতে চায় না। নাট্যাচার্য আবার আরম্ভ করলেন : শুধু দেবদেবী নয়। পরবর্তী যুগেও এর বেশ আদর ছিল। বলরামের চক্ষু দুটি সর্বদাই আরক্ত থাকত। শ্রীকৃষ্ণ পান করতেন—শুনেছি। রামচন্দ্রও বাদ ছিলেন বলে মনে হয় না। তবে মিথ্যে বলব না, সীতাদেবীর কথা সঠিক জানি না।

এতখানি তরলতায় প্রিয়নাথ এতক্ষণে সাহস সঞ্চয় করে ফেলেছে। সে বলল : যুগেযুগে সোমরসের জনপ্রিয়তার কথা আমি জানি। শ্রীরামচন্দ্রের সোমরস পানের কথা আমরা বিলক্ষণ জানি। রঙ্গমঞ্চে দেখেছি। সেই রঙ্গমঞ্চে না হলেও অন্যত্র সীতাদেবী একটু-আধটু প্রসাদ পেয়ে থাকলেও, সেকথা আমরা শুনিনি।

নাট্যাচার্য মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে হোঃ হোঃ শব্দে হেসে বললেন : বিলক্ষণ ! বিলক্ষণ !! এই তো ক্রমে প্রতিভা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছে। ক্ষেত্রটি একেবারে নিরেট নয়, সেকথা আমি মুখখানা দেখেই বুঝতে পেরেছি।

এর মধ্যে যে লোকটি প্রথমে প্রিয়নাথকে অভ্যর্থনা করেছিল, সে চা এবং জলযোগাদি এনে হাজির করাতে দিলীপবাবু বললেন : তা সেসব কথা থাক। এখন বিশেষ আপত্তি না থাকলে চাটুকু খেয়ে নিন। যাতায়াত বাড়লে, সেসব আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা পরে ভাবা যাবে। কি জন্যে এ অধীনের কাছে আগমন বলুন।

প্রিয়নাথ বলল: অন্য কথা ছেড়ে দিলেও বয়সের ব্যবধান অনেক। আমাকে 'তুমি' বললে খুশি হব।

: নিজের থেকে যখন হবে, তখন। জোর করে কিছু হয় না। তা আমি আপনার জন্য কী করতে পারি, বলুন।

: আমি যা চেয়েছিলাম, তা আশাতিরিক্ত পেয়েছি। আর কিছু চাই না। আমি শুধু এমন একটি বিরাট প্রতিভাকে কাছে থেকে দেখতে চেয়েছিলাম। আমাদের জনৈক বন্ধু একদিন বলেছিল, নাট্যাচার্যের কি দুর্ভাগ্য যে, তিনি দিলীপকুমারকে দেখতেও পেলেন না; তাঁর অভিনয়ও দেখতে পেলেন না।

মৃদু হেসে দিলীপবাবু বললেন: সত্যি হোক, মিথ্যে হোক— খোসামোদের কথাগুলো শুনতে বেশ ভাল লাগে। ঘোরতর মিথ্যে বলে বুঝতে পারলেও, রাগ হয় না বা তাকে মিথ্যেবাদী বলে মনে হয় না। ভুল ভাঙ্গিয়ে দিতেও ইচ্ছা হয় না। তবে একটা কথা এই—আমাদের মত নটদের লোকে দূর থেকে দেখতেই ভালবাসে। গৃহস্থ ভদ্রলোকেরা রঙ্গমঞ্চের বাইরে আমাদের সংসর্গ এড়িয়ে চলেন।

: একথা কিছু কিছু সত্য হলেও আপনি তার ব্যতিক্রম। দেশের বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ আপনার অন্তরঙ্গ। দেশবন্ধু আপনার অনুরাগী, পরমশ্রদ্ধেয় দেশ-গৌরব ভাষাতত্ত্ববিদ আপনার বন্ধু। রাখালদাশবাবু আপনার অন্তরঙ্গ ছিলেন। শরৎচন্দ্র আপনার সাহচর্যে সুখী হতেন। দিলীপবাবুর সঙ্গেও আপনার সৌহার্দ্য! এমনকি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও আপনার মেলামেশার কথা আমরা শুনেছি।

: তাহলে তো অনেক কথা শুনেছেন। কিন্তু আপনার বাড়িতে কোনদিন গিয়ে হাজির হলে, বৈঠকখানায় বসিয়ে অন্দরে যাবার দরজাটি বন্ধ করতে ভুলবেন না।

: এমন সৌভাগ্যের কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। যদি তেমন ভাগ্য কোনদিন হয়, তখন ভেবে দেখব—কোন্ দরজা খুলব আর কোন্ দরজা বন্ধ করব। আমার বড়দা দুলালচন্দ্র আপনার

একজন এ্যাডমায়ারার। আপনার কোন বই তাঁর বাদ যায় না। আমাদের বাড়িতে আপনার মস্তবড় ফটো টাঙ্গান আছে।

ঃ শুনে সুখী হলাম। ভাল কথার সতি-মিথ্যে সবই ভাল। আপনার বড়দার সঙ্গে দেখা হলে আরও সুখী হব।

ঃ অভয় দিলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব।

ঃ তা অভয় দিলাম।

ঃ লোকে বলে—আপনি খুব দাম্ভিক। আমি কিন্তু তার কিছুমাত্র পরিচয় পেলাম না।

ঃ আমার অনেক দোষের কথা লোকমুখে শুনেছি। কিন্তু কপটতার অপবাদ কেউ দেয়নি। আজ আপনি তাও দিলেন। আমার ব্যবহারে যদি নিজের চরিত্র প্রকাশ না হয়ে থাকে, তবে সে দোষটা আমার নয়। আমি সত্যিই দাম্ভিক। আমি দম্ভ করে বলি, আমি কী করতে এই সংসারে এসেছিলাম ? সে কি দাড়িগোঁফ লাগিয়ে 'হালুমবীর' সাজব বলে ? সত্যি যদি আমার প্রতিভা থাকে, তবে তা বিকাশের ক্ষেত্র কোথায় ? আমি নট, কিন্তু আমার জন্য নাটক কোথায় ?

ঃ পিরানদেল্লো লিখেছিলেন, "নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র।" আপনার জন্য লিখতে হবে—"নাটকের সন্ধানে একজন নট।"

দিলীপবাবু তাড়াতাড়ি হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন ঃ অপূর্ব আপনার রসবোধ। আপনার সঙ্গে কথা বলার আনন্দ আছে।

প্রিয়নাথ বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলল ঃ আরও একটি কথা না বলে পারছি না। ধৃষ্টতা হলে ক্ষমা করবেন। যে দেশে দীনবন্ধু, মাইকেল, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন, সে দেশে নাটক নেই বলতে বেদনা বোধ করি।

নাট্যাচার্য বললেন ঃ রবীন্দ্রনাথ কাব্যের অবসরে নাটক লিখেছেন। মিসটিক নাটক, রূপক নাটক, আবার 'তপতী'র মত বাস্তব-ঘেঁষা নাটক। কিন্তু তার মধ্যে একটি কথা। শুধু নাটক থাকলেই তো

হবে না। সেই নাট্যরস গ্রহণ করবার যোগ্য দর্শক চাই। চেষ্টা করে দেখেছি। রবীন্দ্রনাথের নাটক দর্শক নেয় না। তারা ঐ 'হালুমবীর' দেখেই হাততালি দিতে ভালবাসে। এমন একটি তরল নাটক দেখে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "ভদ্রলোকের পক্ষে এতক্ষণ এসব ধৈর্য ধরে দেখা চলে না। তোমরা আগে দর্শক তৈরী কর।"

একটু চুপ করে থেকে তিনি আবার বললেন: সেসব কথা থাক। আমি বলেছি যে, আমি আপনাকে জানি। কি করে জানি, সেই কথা বলি।

প্রিয় অত্যন্ত কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে থাকল আর নাট্যাচার্য বলতে লাগলেন: আমার মঞ্চে আপনার সখের দলের অভিনয় হচ্ছিল। বইখানার নাম আমার মনে নেই। অমন অনেক অভিনয় হয়। দেখবার কৌতূহল বড় একটা হয় না। সেদিন কোন ভদ্রলোকের অনুরোধে কোন কারণে আমাকে বক্সে যেতে হয়েছিল। হঠাৎ নজর পড়ল মঞ্চের ওপরে। আপনাকে দেখলাম। আশ্চর্য হলাম। না, আপনার লজ্জিত হবার কিছু কারণ নেই। আপনার অভিনয় দেখে আমি অভিভূত হইনি। নাটকের বিষয়বস্তু আমাকে বিপাকে ফেলে দিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ দেখলাম। এই বছরের গোড়ার দিকে! কী বই, তা কি আপনার মনে আছে?

: আছে।

: নাটকটি কার লেখা?

মাথাটি নীচু করে প্রিয়নাথ বিনয়ের সঙ্গে বলল: সে সামান্য ব্যাপার—আমারই লেখা।

: অসামান্য ব্যাপার—এমন কথা আমিও বলছি না। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা—একজন পেশাদার অভিনেতা যদি অন্য নারীতে আসক্ত হয়, তবে তার ঘরে গৃহলক্ষ্মী বুঝি আত্মহত্যা করবে?

প্রিয়নাথ মাথা নীচু করে ফেলল। সে মাথা আর তুলতে পারে না। দিলীপবাবু আবার জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার নাটকের

বক্তব্যকে আমি চ্যালেঞ্জ করছি না। এই প্রশ্নটা আমার এক কৌতূহল।

প্রিয়নাথ কিছু উত্তর দিতে পারে না। নাট্যাচার্য একটু হেসে প্রিয়নাথের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন : নাটক রচনার আগে নাট্যকার মশাই কি এ অধীনের জীবন-চর্চার বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন ?

অনেক কষ্টে শক্তি সঞ্চয় করে প্রিয়নাথ মাথাটা নীচু করেই বলল : বিরল প্রতিভাদের বিষয়ে সাধারণ মানুষের যেমন কৌতূহল থাকে, আমিও তার ব্যতিক্রম নই।

ছোট একটা নিঃশ্বাস চেপে নাট্যাচার্য প্রিয়নাথের দিকে তাকালেন। মুখের সেই হাসিটি তখন আর নেই। তিনি বললেন : বিরল প্রতিভাদের বিষয়ে কৌতূহল থাকাটা মন্দ কথা নয়। কিন্তু সেই কৌতূহল যখন অন্তঃপুরের দরজা ভেদ করে, ভয়ের কথা তখনই। সেই কৌতূহলের সীমা কোথায়, তাই দেখবার জন্য আমি চেয়ারে বসে পড়েছিলাম। দেখলাম, বিশেষ কোন তর্কের মধ্যে না গিয়ে নাট্যকার মশায় নায়িকা গৃহলক্ষ্মীকে ধরে বেঁধে যমালয়ের দিকে রওনা করে দিয়ে আপন কর্তব্য শেষ করলেন।

প্রিয়নাথের চৈতন্য লোপ হবার অবস্থা। নাটক-লেখা তার কাজ নয়। তবুও লিখেছিল। ভেবেছিল, সকলকে তাক লাগিয়ে দেবে। তা অনেকেই তার নাটকের প্রশংসাও করেছিল। কিন্তু এতখানি বিড়ম্বনা তার কপালে আছে, সেকথা ভাবতে পারেনি। দিলীপবাবুর কথা যেন শেষ হতে চায় না। তিনি আবার আরম্ভ করলেন : আপনার নাটকের যবনিকা পড়ে গেল। কিন্তু আমার মাথাটা পরিষ্কার হোল না। সেই দিনই আপনার সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছিলাম। নামটাও মনে ছিল। তাই আপনার চিঠিখানা পেয়েই ভেবেছিলাম, যোগাযোগ মন্দ নয়। তা এই আলাপ-আলোচনার পরে আপনার নাটকের দ্বিতীয়-পাঠ লিখবেন নাকি ?

প্রিয়নাথের চুরি যেন ধরা পড়েছে—এইভাবে বোকার মত মুখ করে তাকাল। নাট্যাচার্য বললেন : গৃহলক্ষ্মীদের একমাত্র সুখ বুঝি পতি-দেবতাদের সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ষোল আনা ভোগদখল করা ? কিন্তু এর মধ্যে তার সুখ বা আনন্দ কিসে ? নিজের প্রতিষ্ঠা না অন্যের সংশোধন ? এবং কোনটির ব্যতিক্রম হলে, মৃত্যু ছাড়া আর পথ নেই ? এবং সে মৃত্যু যদি আপন ইচ্ছায় না আসে, তবে নাট্যকার মৃত্যু-দূতকে ডেকে আনবে ?

প্রিয়নাথ এতক্ষণে অপরাধীর মত মৃদুস্বরে বলল : আমি কোন চরিত্র লক্ষ্য করে নাটক রচনা করিনি। তবু যদি তেমন কিছু ঘটে থাকে তবে তা নিতান্তই আকস্মিক। অপরাধ হয়ে থাকলে, আমাকে ক্ষমা করবেন।

: কি আশ্চর্য ! অপরাধ হতে যাবে কেন ? অভিনেতা—দিলীপ কুমারকে দশজনে কীভাবে, তা মোটামুটি বোঝা যায়। কিন্তু মানুষ —দিলীপকুমারকে তাঁরা কীভাবে নেয়, তাই জানবার জন্যই এত কথা বললাম।

সাক্ষাতকারের সকল আনন্দ যেন ম্লান হয়ে গেল। নিতান্ত বিরস সুরে প্রিয়নাথ বলল : অনেকক্ষণ আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করেছি। এবার উঠি।

দিলীপবাবু বললেন : নষ্ট করার মধ্যেও একটা আনন্দ আছে। মূল্যবান একটা ঘড়ি নষ্ট করে ফেলে শিশু কত আনন্দ পায়। সে আনন্দও মিথ্যে নয়। সেই আনন্দই তুমি আজ আমাকে দিলে। ভবিষ্যতে আবার দিলে, আবার সুখী হব।

নষ্টের মধ্যে আনন্দের কথা শুনে প্রিয়নাথ চমকে উঠল। এতো তারই চিন্তার প্রতিধ্বনি। সে ভেবেছিল, ভাল জিনিষ নষ্ট করে মানুষ তার মধ্যে নতুন আস্বাদনের সন্ধান করে। নাট্যাচার্য বললেন, শিশুরা সুন্দর একটি ঘড়ি নষ্ট করে আনন্দ লাভ করে। বড়োরা আরও কত কি সুন্দর জিনিষ ভেঙ্গেচুরে তচনচ করে দিয়ে আনন্দ

খুঁজে বেড়ায়। এই আনন্দ কত রূপে কিসের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকে কে জানে! এর মধ্যেই প্রিয়নাথের মনে আনন্দ—নাট্যাচার্য তাকে 'তুমি' সম্বোধন করেছেন। সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে পায়ের ধূলো নিল। এবার দিলীপবাবু আপত্তি করলেন না।

দুজনে দুপা এগুতেই একটা অস্বাভাবিক কণ্ঠ বলে উঠল : আবার এসো।—প্রিয়নাথ সচকিত হয়ে এদিকে-ওদিকে তাকাতেই দিলীপবাবু বললেন : কাকাতুয়ার মুখে চারুর কথা। চারুশীলার সখ। ও পাখি সেই কিনেছিল। কথাও তারই শেখান। চারু সকলকে কাছে টানতে জানে।

এতক্ষণে প্রিয়নাথের মনে পড়ল—নাট্যাচার্যের সঙ্গে চারুশীলার যোগাযোগের কথা। সে আরও কিছু শোনবার প্রত্যাশায় দিলীপ বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কিছুদিন ধরে চারুশীলাকে ঘিরে যা কিছু ঘটেছে, তার কতখানি তাঁর জানা আর কতখানি অজানা, কে জানে! যতখানি জানা, তা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে ; সে কথা সে কিছু জানে না। নাট্যাচার্যের সঙ্গে চারুশীলার যোগাযোগ আছে—একথা সে জানে। কিন্তু সে যোগাযোগের গতি-প্রকৃতির কথা সে কিছু জানে না। সেসব ঘটনার সঙ্গে প্রিয়নাথ জড়িয়ে রয়েছে—একথা নাট্যাচার্য জানেন কি-না, তারই ঠিক কি! বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হোল না। দিলীপবাবু বললেন : চারুকে দেখেছ ত ?

প্রশ্নটি গোলমেলে। চারুর সঙ্গে প্রিয়নাথের যোগাযোগের কথ। তিনি জানেন কিনা, তা জানা নেই। সে চুপ করেই থাকল। দিলীপবাবু এবার প্রিয়নাথের সকল সংশয় দূর করে প্রশ্ন করলেন : চারুশীলার অভিনয় দেখেছো তো ?

প্রিয়নাথ এতক্ষণে মুক্তি পেয়ে উত্তর দিল : অনেক দেখেছি। আজকাল আপনার সঙ্গে প্রধান নারী-চরিত্রে তাকেই তো দেখি।

: তার সঙ্গে তোমার আলাপ হোল না। সে নেই। ওকে ধরে

রাখা শক্ত। ওর মধ্যে কেমন যেন একটা মত্ততা আছে। কোন কিছুর ওপরই ও বেশীদিন মনটা ধরে রাখতে পারে না। ও কী যেন একটা চায়, কিন্তু পায় না। ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে সেই আলেয়ার সন্ধান করে বেড়ায়। তার অভিনয় তোমার কেমন লাগে ?

ঃ আপনার শিক্ষা। চমৎকার।

ঃ সেই আমাকে নিয়েও কিন্তু সে খুশি থাকতে পারল না। একদিন বলে বসল—এ্যামেচার ক্লাবে অভিনয় করবে। বিচিত্র সাধ। কিসের প্রত্যাশা, কে জানে!

উভয়কুল বজায় রেখে কিছু একটা বলতে হবে—এইভাবে সে বলল ঃ সে কথা জানি।

প্রিয়নাথের উত্তরের দিকে লক্ষ্য না করে দিলীপবাবু বললেন ঃ সেইভাবে কোন এক সখের দলে অভিনয় করতে গিয়ে এক ছোকরার সঙ্গে মেলামেশা হোল। সে ছেলেটি নাকি ওর অভিনয়কে তারিফ করেছিল কিন্তু ওর রূপযৌবনকে উপেক্ষা করেছিল। চারুর ধারণা, ওর রূপ যে কোন পুরুষের মন গলাতে পারে। ছোকরার দুর্ভাগ্য, সে গলল না। তাই তাকে বিষ্ণুপুরে যেতে হোল। আর বিষ্ণুপুরে গিয়ে পরিত্যক্তও হোল। অন্য কে একজন নাকি ওকে দিদি বলে ডেকেছে ; তার সঙ্গেই আছে।

তাকে ধরে নিয়ে বিষ্ণুপুরে যাবার বিচিত্র কারণটির কথা জেনে প্রিয়নাথ স্তম্ভিত। একথা দিলীপবাবু কার কাছে শুনেছেন, কে জানে! সে তো চারুর রূপ যৌবনকে উপেক্ষা করে নি। একজন পুরুষের অন্তরে নারীর জন্য যতখানি ব্যাকুলতা থাকার কথা, তা তার আছে। তবে লোলুপতা বোধহয় নেই। চারু যদি মনে মনে সেই কথা ভেবে থাকে, তবে সে অসহায়। চৌধুরী নাট্যাচার্যকে এইসব কথা বলেছে কিনা, তারই বা ঠিক কি। ওসব দালাল জাতীয় মানুষ সব পারে। একটু চুপ করে থেকে দিলীপকুমার বললেন ঃ ওসব সাময়িক বিলাস। দাদা-দিদির বন্ধনে ধরা দেবার মেয়ে চারু নয়।

কী কথা বলবে কিছুই ভেবে না পেয়ে প্রিয় বলল : তার অভাবে আপনার খুব অসুবিধে হচ্ছে মনে হয় ?

: কেন ? অসুবিধে কিসের ? বিচ্ছেদ বেদনা ? না কি তার সতীপনা নষ্ট হয়ে যাবার যন্ত্রণা ?

প্রিয়নাথ ফাঁপরে পড়ল। তাড়াতাড়ি বলল : সেসব কথা নয়। অভিনয়ে তার চরিত্রগুলি নিয়ে···

একটু হেসে নাট্যাচার্য বললেন : তবু ভাল। আমি ভেবেছিলাম, আমার দাম্পত্যজীবনের বিপর্যয়ে তুমি বিড়ম্বিত হয়েছ। আমার কোন মেথডিক্যাল দাম্পত্যজীবন নেই। তা বলে নারীর প্রয়োজনকে আমি অস্বীকার করি না। যেমন তেমন ভাবে সে প্রয়োজন মিটে গেলেই হোল। তাছাড়া আমার সঙ্গে অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রীর অভাব হয় না।

তাঁরা এতক্ষণে আবার নিজের জায়গায় এসে বসেছেন। নাট্যাচার্য নতুন একটি চুরুট ধরিয়ে একমুখ ধোয়া ছেড়ে আস্তে করে বললেন : তুমি কি স্ত্রীলোকের সতীপনায় বিশ্বাস কর ?

অদ্ভুত প্রশ্নে প্রিয়নাথ হতবাক হয়ে গেল। তার মুখে কথা নেই। তিনি আবার বললেন : আমি বিশ্বাস করি না। যন্ত্রণায় উদভ্রান্ত নারী এবং পুরুষের মিলনটাকে আমি নিতান্তই যন্ত্রণা-মুক্তির জন্য জৈব যোগাযোগ ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না। কাব্যে সাহিত্যে এই ব্যাপারটিকে নিয়ে যত রূপ রস ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা নিতান্তই অর্থহীন বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়।—নাট্যাচার্যের এই বিচিত্র জীবন-দর্শনের কথা শুনে প্রিয়নাথ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তিনি আবার বললেন : কী একটা যন্ত্রণা নিয়েই বুঝি চারু স্থির হতে পারছে না। প্রয়োজন মত ঠিক জিনিষটি পেলে, সে বুঝি সত্যবানের গৃহকোণে সাবিত্রী হয়ে বিরাজ করতে পারত।

প্রিয়নাথ আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল : ঠিক মনোমত জিনিষটি খুঁজতে খুঁজতে প্রয়োজনটাই যে শেষ হয়ে যাবে।

ঃ প্রয়োজন শেষ হলে তো ল্যাঠাই চুকে গেল। আর খোঁজা-খুজির বিড়ম্বনা কেন? কিন্তু প্রয়োজন কি কোনদিন শেষ হয়? সে মানুষের জীবন-প্রবাহের সঙ্গে একেবারে গাঁটছড়া বাঁধা।

ঃ ক্ষমা করবেন, অনুমতি পেলে আরও দু'একটা কথা বলি।

ঃ অনুমতি দিলাম।

ঃ বন্যজীবন থেকে মানুষ যখন সমাজ গড়তে আরম্ভ করল, তখন থেকেই নারী এবং পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তিটাকে সংযত করে আনবার চেষ্টা হয়েছে। তার জন্য নানা পথের সন্ধানও তারা করেছে। বৈবাহিক প্রথার প্রবর্তন তারই ফলশ্রুতি—এই আমার বিশ্বাস।

ঃ অর্থাৎ ঐ সতীপনার আদর্শ স্থাপন করল। মুনি-ঋষিরা শ্লোক রচনা করলেন ঃ

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ
আত্মবৎ সর্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ ॥

পরনারীকে মাতৃবৎ, পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ এবং সর্বভূতে আত্মবৎ। কোন সুদূর অতীতে এই শ্লোক লেখা হয়েছিল। তখন থেকেই পরনারীতে মানুষের আসক্তির কথা স্বীকার করা হয়েছে। সাবধান-বাণী সেইজন্যই। কিন্তু ঐ শ্লোকটির মধ্যেই পরনারীর অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করা হয়েছে। সর্বভূতে আত্মবৎ হলেতো আর পরনারী বলে জ্ঞান থাকে না, ব্রাদার। সংসারে সকলেই আপন জন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণেরও এই দশা হয়েছিল।

প্রিয়নাথ অবাক হয়ে নাট্যাচার্যের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল ঃ এতবড় বিপ্লবের কথা আমার মাথায় আসবে না। আমি বুঝতে পারি না।

ঃ বুঝিয়ে আমি দিচ্ছি। সতীপনার আদর্শ হিসেবে পঞ্চকন্যার কথা বলা হয়েছে।

ঃ 'অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাম্ স্মরেন্নিত্যম্ মহাপাতকনাশিনী ॥

ঃ বর্তমান সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে এই পাঁচ সতীর কোনটিকে আদর্শ বলে মেনে নেওয়া চলে কি ?

ঃ অসুবিধে কোথায় ?

ঃ অসুবিধে অনেক। আমি ঐ শ্লোকের প্রথম সতীর উদাহরণ দিই। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একখানা নাটক লিখেছিলেন। তার নাম 'পাষাণী'। সে নাটকের নায়িকা 'অহল্যা'। জান বোধ হয় ?

প্রিয়নাথ বলল ঃ জানি এবং সেই নাটক মঞ্চস্থ করে আপনার বিড়ম্বনার ইতিহাসও শুনেছি।

ঃ কিন্তু কেন সেই বিড়ম্বনা ? রায়মশায় কি ভুল লিখেছিলেন ? বাল্মিকী-রামায়ণ অবলম্বন করেই তিনি নাটক লিখেছিলেন। বাল্মিকী-রামায়ণে আছে, গৌতম-জায়া, অহল্যা দেবরাজ কুতূহলাৎ ইন্দ্রের অনুগামিনী হয়েছিলেন। অনেক পরে কৃত্তিবাস বাঙ্গালীর মানসিকতা বিচার করে তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার কথা ভেবে অহল্যার সতীত্ব রক্ষা করলেন। দেবরাজ ইন্দ্রকে গৌতমের রূপসজ্জায় সাজিয়ে দিলেন। তাহলেই দেখ—সতীপনার বিচার পদ্ধতি চিরকাল এক থাকে না। সর্ব দেশেও এক হয় না।

প্রিয়নাথ বলল ঃ তাই আপনি বলতে চান—এটা বিধির বিধান নয় ?

ঃ তোমার আপত্তি না থাকলে, আমি তাই বলতে চাই। দেশ এবং কালের ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে মানুষের রচিত একটা সংস্কার।

আলোচনা যেন কেমন একটা পথে এগিয়ে চলেছে। প্রিয়নাথ এসব চায়নি। সে একজন ছাপোষা লোক। পেটের দায়ে চাকরি করে। আর নেশার টানে থিয়েটার করে। থিয়েটারের নেশাতেই সে নাট্যাচার্যের দর্শন প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু বিরাট সেই প্রতিভা এবং ব্যক্তিত্বের মধ্যে একী বিচিত্র জীবন-দর্শন। চারুশীলার কথা তার মনেও ছিল না। দিলীপবাবুর সঙ্গে তার যোগাযোগের কথাও তার মনে ছিল না। আর থাকলেও সে যোগাযোগের গভীরতা

কতখানি, তা সে জানত না। নটী ডানকান আর নটী বিনোদিনীর চিন্তায় সে কিছুটা আচ্ছন্ন হয়েছিল—একথা ঠিক। কিন্তু চারুর কথা বিন্দুবিসর্গও তার মনে আসেনি। বনের এক কাকাতুয়া খাঁচায় আশ্রয় নিয়ে অস্বাভাবিক গলায় 'আবার এসো' বলে চারুশীলার কথা টেনে নিয়ে এলো। ওটা নাকি চারুরই কথা। চারুই নাকি ঐ কাকাতুয়া কিনে এনেছিল। ঐ কথাও নাকি সেই শিখিয়েছিল। জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বনের পাখি খাঁচায় বসে চেনা-অচেনা সকলকে পুনরাগমনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে চলেছে। এ বাড়ি থেকে কেউ দূর দূর করে বিতাড়িত হলেও খাঁচার অবোধ পাখি বলবে 'আবার এসো'। প্রিয়নাথ আবার আসবে কিনা, তা পরের কথা। কিন্তু এবার বিদায় নেওয়াই ভাল। কিন্তু তার আগে চারুশীলা প্রসঙ্গের কথাটা বুঝি জানিয়ে যাওয়াই ভাল। ভাল হলেও কাজটি সহজ নয়। কিন্তু ভবিষ্যতে নাট্যাচার্য সব ইতিহাস জেনে ফেললে? তখনও সান্নিধ্য বজায় থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিলেই হবে। আর জানলেই বা ক্ষতি কী? তিনি তো নারীর সতীত্ব বিশ্বাস করেন না। সব ইতিহাসের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে কোনদিন যদি চারু এসে উপস্থিত হয়, তবে নাট্যাচার্য মনে মনে তাকে দ্বিধাহীন ভাবে গ্রহণ করবেন।

* * *

দুলালচন্দ্রের বৈঠকখানা আবার একদিন মুখর হয়ে উঠল। হরিপদবাবু ভয়ানক সংবাদ নিয়ে এসেছেন। তা সংবাদ যত ভয়ঙ্কর হোক, হরিপদবাবু বিচলিত হন না। এসব খবরকে তিনি বলেন, 'ভার্জিন নিউজ'। অর্থ এই—এ সংবাদ এখনও কেউ জানে না।

সেদিনও তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হননি। আসতে দেরি হয়েছে। এসেই তাঁর রীতি অনুযায়ী মূল সংবাদ গোপন রেখে অন্য প্রসঙ্গ বললেন। বললেন: এখন ইলিশ মাছ খুব সস্তা হবে।—শীতকাল; ইলিশ মাছের চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যায় না। এর মধ্যে ঐ

মাছের এত সস্তা হবার কথা শুনে সকলেই বেশ কৌতূহল বোধ করল। অনেকেই নিজ-নিজ জিভটা একটু নেড়ে-চেড়ে একটু-আধটু ঢোক গিলে হরিপদবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। ছুলালবাবু জিজ্ঞাসা করলেনঃ এই শীতকালে তুমি ইলিশ মাছের সন্ধান পেলে কোথায় হরিপদ? হরিপদবাবু বললেনঃ কেন? শীতকালে কি ইলিশ মাছ পাওয়া যায় না? খুব যায়। তা হলে সেই কাণ্ডের কথা বলি। আমরা তখন বাওয়ালী মণ্ডল লেনে থাকি। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট ঐ বড় রাস্তা বার করবে।

ঘোষবাবু জিজ্ঞাসা করলেনঃ বড় রাস্তা?

হরিপদঃ ঐ তো যে রাস্তার নাম হয়েছে, প্রতাপাদিত্য রোড। তখনও কালী টেমপল রোড তৈরি হয়নি। মায়ের বাড়িতে যেতে হলে, তখন ভরসা ছিল—হালদার পাড়া রোড।

ছুলালবাবু বললেনঃ কলকাতার ইতিহাস থাক। তুমি ইলিশ মাছের কথা বল।

হরিপদঃ বাবা তখন মায়ের মন্দিরে পূজো-আর্চা করেন। মণ্ডল বাড়ির কর্তারা রঘুনন্দন বলতে অজ্ঞান। শীতকাল, অকালে বাদল নেমেছে। তা সোনাকর্তা বাবাকে ডেকে বললেন, রঘুনন্দন, এ বিপদে তুমি ছাড়া গতি নেই। গুরুদেব ইলিশ মাছ ভাজা দিয়ে খিঁচুড়ি খেতে চেয়েছেন।

ঘটনার গভীরতা বোঝাবার জন্য হরিপদবাবু গলার স্বরটা একটু ফ্যাসফেসে করে বললেনঃ সে গুরুদেব আর কেউ নয়; দিনমণি হংসবাহন। সদ্য হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন। পরমহংস তো।

শ্রোতারা কেউ দিনমণি হংসবাহনের উল্লেখে বিচলিত হোল না। সদ্য হিমালয় থেকে নেমে-আসা একজন পরমহংসের কথায় এতখানি শৈথিল্য ভাব হরিপদ প্রত্যাশা করেননি। কিন্তু প্রথমেই মানুষটাকে একেবারে হেলাফেলার মধ্যে রেখে দিলে, কাহিনীটা

অকিঞ্চিৎকর হয়ে যাবে—এইরূপ আশঙ্কা করে বললেন : ঐ দিনমণি হংসবাসন হিমালয়ে ত্রৈলঙ্গস্বামীর অন্তরঙ্গ ছিলেন তো।

ত্বলালবাবু গড়গড়ায় গোটা তুই টান দিয়ে হেসে বললেন : দিনমণি হংসবাহনের মাহাত্ম্য বিষয়ে আমাদের সকল সন্দেহ তুমি দূর করেছ। তিনি ত্রৈলঙ্গস্বামীর ক্লাসফ্রেণ্ড ছিলেন—সে কথাও জেনেছি। হিমালয়ের গঙ্গায় গোমুখে কিম্বা গঙ্গোত্রীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যায় না। সুতরাং ইলিশ মাছ খেতে ইচ্ছা করলে, মহাপুরুষরা হিমালয় থেকে নেমে আসবেন--এটা কিছু বিচিত্র নয়। তুমি তোমার বিচিত্র কাহিনীটি বল।

হরিপদবাবু একটু দম নিয়ে বললেন : মনিব বড় মুখ করে বলেছে। বাবার মাথায় তো আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তা তিনিও তো সাধারণ লোক নন। তিনি তার গুরু কদম্ব বাবাকে স্মরণ করলেন।

ঘোষবাবু বললেন : গুরুদেবের নাম-মাহাত্ম্য আছে নাকি ?

হরিপদ : আছে না ? ঐ প্রথম বর্ষা নামলে যে ক'দিন কদমফুল পাওয়া যায়, সেই ক'দিন শুধু কদমফুল খেয়ে থাকতেন। ব্যাস্—সারা বছরে আর কিছু খাত্ত-খাওয়া নেই। একফোঁটা জল নয়, একটা কাঁচা লঙ্কা পর্যন্ত নয়। এমন মিতাহারী। সেইজন্য অনেকে মিতাহারী বাবাও বলত।

ত্বলালবাবু দেখলেন, একগুরু থেকে আর একগুরু—এইভাবে উপক্রমণিকাই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলল। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন : তোমার গুরু মাথায় থাকুন। তুমি ইলিশ মাছের কথা বল। তোমার পিতৃদেবের কর্মকুশলতায় এবং দিনমণি হংসবাহনের অশেষ কৃপায় সেদিন বাজারে শুধুই ইলিশ মাছ ছিল—সে কাহিনী আমরা বুঝতে পেরেছি। এখন ইলিশ মাছ সস্তা হবে কী করে সেই কথা বল।

হরিপদবাবু বললেন : আজ বিকেলে দেখবেন, বাজারে শুধুই ইলিশ মাছ। কিন্তু আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, ওমাছ ছোঁবেন না।

বরুণবাবু নির্বাক হয়ে কানের পেছনে হাত রেখে বসে আছেন। ইলিশ মাছের সংবাদে তিনি বিচলিত হন না। তাঁর ভার্জিন নিউজের অপেক্ষা। হরিপদর দেওয়া খবর তিনি বিশ্বাস করেন না, কিন্তু না শুনেও উপায় নেই।

সকলে যখন কৌতূহল নিয়ে হরিপদর মুখের দিকে তাকিয়ে, তখন তিনি বললেন: গঙ্গার স্রোতে হাজার হাজার মড়া ভেসে চলেছে, আর তারই লোভে সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ঝাঁকে-ঝাঁকে ইলিশ মাছ। জেলেদের মুস্কিল হয়েছে—মাছ তুলতে গেলে মড়া চলে আসে।

কথাটাকে উপহাস মনে করে সকলে হোঃ হোঃ করে হেসে উঠল। হরিপদবাবু বললেন: হাসির কথা নয়। হাজারে হাজারে মড়া।

মড়া-সংবাদে সকলে যখন কৌতূহলের চরমে পেঁৗছাল তখন তিনি সেই রহস্যময় ভার্জিন নিউজটি প্রকাশ করলেন। সংবাদ ভয়ানক—ডায়মণ্ডহারবারে বোমা পড়েছে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। খবরের পর খবরে সকলে সচকিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে সবই আনন্দ-সংবাদ। ব্রিটিশ সিংহ ক্রমে কাবু হয়ে পড়ছে। কিন্তু এযে ঘরের কাছে মৃতদেহ। এতদিন যাহোক যুদ্ধটা সেই কোন সুদূর ইউরোপ আর আফ্রিকা খণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এ আবার কী আপদ! সতীনাথ তো মুখ পাংশুবর্ণ করে উঠে পড়ল। তার বৌ ছেলেমেয়ে সবই দেশের বাড়িতে। সে বাড়িটি সর্ষেতে। ডায়মণ্ডহারবারের একেবারে কাছে। তার বাড়ির সব লোকেরা এতক্ষণে ঝাঁকে-ঝাঁকে ইলিশ মাছের খাদ্য হয়ে গঙ্গার স্রোতে ভেসে চলেছে কি না, কে জানে! সতীনাথের অবস্থা অনুমান করে দুলালচন্দ্র তাকে বসতে বললেন আর হরিপদকে জিজ্ঞাসা করলেন: সংসারে এত জায়গা থাকতে ডায়মণ্ডহারবারে বোমা ফেলতে এলো কে?

হরিপদ কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করে বলল: লোকে বলছে—এম. এন. রায়। কিন্তু আমি সেকথা বিশ্বাস করি না।

দুলাল : আমাদের কপাল ভাল যে, তুমি সেকথা বিশ্বাস কর না। কিন্তু তুমি কোন কথাটা বিশ্বাস কর, তাই বল না।

হরিপদ উৎসাহিত হয়ে বলল : এতো জলের মত পরিষ্কার।—তারপর আবার একটু এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বলল : এ সুভাষবাবুর কাজ। তিনি তো হিটলারের কাছে বসে আছেন। হিটলার তাঁকে 'মাই মাষ্টার' বলে। রেডিও শোনেন না? এখানে তো ওসব সেণ্টার ধরবার উপায় নেই। সেইজন্য আমরা চন্দননগরে গিয়ে সুভাষবাবুর বক্তৃতা শুনে আসি। ওখানে প্রভুদের কিছু বলবার উপায় নেই।—এই কথা বলে সে ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি কদলীর বিকল্প হিসেবে দেখিয়ে দিল।

ঘোষবাবু : এ প্রভুদের না থাকলেও ফরাসী প্রভুদের আছে তো? আর ওরা তো ব্রিটিশের বন্ধু—মিত্রপক্ষ।

সতীনাথবাবু মুখখানা কালো করে বেরিয়ে গেলেন। এ সংবাদ শোনার পরে তাঁর পক্ষে বসে থাকা অসম্ভব। বৌ ছেলেমেয়ে সবই দেশে—সেই সর্ষেতে ; ডায়মণ্ডহারবারের একেবারে কাছে। বরুণবাবুও আজ আর বেশী দেরী করলেন না। কানের পেছন থেকে হাতখানা নামিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। মোট কথা ডায়মণ্ডহারবারে বোমা পড়াতে সকলের যুদ্ধের আনন্দ একেবারে মাটি হয়ে গেছে। যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে এতদিন বেশ চলছিল। এ আবার কী আপদ এসে পড়ল।

এর মধ্যে নন্দদুলাল এসে পড়ল। আফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে মাঝে মাঝে আসে। বিন্দুমাসীমার বড় ছেলে নন্দদুলাল আর তারই বড় সোহাগের স্ত্রী প্রিয়নাথের রাণী বৌদি। দুলালচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন : হ্যারে নন্দ, ডায়মণ্ডহারবারে না-কি বোমা পড়েছে?

নন্দ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বলল : এমন বিচিত্র কথা কে বলল?

দুলাল : এই তো হরিপদ বলছে।—নন্দ গম্ভীর হয়ে বলল : উনি

ঠিকই বলেছেন। তবে মুক্তোতে আর হীরেতে মিশিয়ে ফেলেছেন। ওঁর দোষ কী? উনিতো জহুরি নন।

কথার রহস্যে সকলে তার দিকে তাকিয়ে থাকল। হরিপদ একটা আসন্ন বিপর্যয় আশংকা করে কিছুটা বিচলিত হয়ে উঠল। নন্দ মৃদু হেসে বলল: বোমা ডায়মণ্ডহারবারে না পড়ে পার্লহারবারে পড়েছে। তা পার্ল আর ডায়মণ্ড-এ তফাৎ থাকলেও সাধারণের কাছে আলাদা করা মুস্কিল। জাপানীরা পার্লহারবারে বোমা ফেলেছে।

পার্লহারবার নামে একটি স্থান পৃথিবীর মানচিত্রে কোন একটি জায়গায় থেকে হরিপদবাবুর সঙ্গে এই হঠকারিতা করল। সংবাদ পরিবেশন করে তিনি যখন পরিবেশটা একেবারে আয়ত্ব করে ফেলেছেন, তখনই এই বিশ্বাসঘাতকতা। তবুও মানরক্ষার শেষ চেষ্টা করে তিনি বললেন: ভাববেন না যে, ঐ ডায়মণ্ডহারবার জায়গাটি একেবারে মায়ের কোলের মত নিরাপদ। হিটলার ওখানেও এসে পড়ল বলে—একথা আমি বলে দিলাম।

তা বোমাগুলো ডায়মণ্ডহারবারে না পড়ে পার্লহারবারে পড়ে হরিপদবাবুর সঙ্গে যত বেইমানিই করে থাকুক, সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু এতক্ষণে সতীনাথবাবু স্ত্রী-পুত্রকে রক্ষা করতে সর্ষের দিকে বোধহয় রওনা হয়ে গেলেন।

নন্দ বলল: এটা চার্চিলের দ্বিতীয় জয়। ১৯৩৯-এর আগষ্ট মাসে সোভিয়েত জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি হোল। কিন্তু ঐ চার্চিল এমন কৌশল করল যে, ১৯৪১-এর ২২ জুন হিটলার রাশিয়ার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপরেই দেখুন—ক'দিন যেতে না যেতেই আমেরিকাকে হাত দুখানা ধরে যুদ্ধে নামিয়ে দিল। এখন রাশিয়া এবং আমেরিকা উভয়েই মিত্রপক্ষ।

ঘোষবাবু বললেন: শত্রু-মিত্র বিচার করব কী করে? কোনটা আমাদের শত্রুপক্ষ আর কোনটা মিত্রপক্ষ তা বিচার করব কী করে?

নন্দ বলল: শত্রু-মিত্র বিচারের জন্য শাস্ত্রকারেরা শ্লোক রচনা করেছেন। রাজদ্বার শ্মশান ইত্যাদিতে গিয়ে প্রকৃত মিত্রের পরীক্ষা হয়। এরাও শ্মশানে গিয়েই বুঝি সেসব বিচার-আচার করবে।

দুলাল বলল: কিন্তু জাপানের সঙ্গেতো আমেরিকার শান্তি আলোচনা হচ্ছিল। তার মধ্যে এ কাণ্ড কী করে ঘটল?

নন্দ: জাপানী রাজদূতেরা এখনও আমেরিকায় বসে আছে। ওরা কৌশল বেশ ভালই করেছে। শান্তি আলোচনায় ওদের ভজিয়ে রেখে এদিকে বোমা ফেলতে আরম্ভ করেছে। আলোচনা ভেঙ্গে গেল বলে আমেরিকা যখন টেলিগ্রাম পাঠাল, তখন সে টেলিগ্রাম ডেলিভারী দেবার জায়গা ভেঙ্গে চুরমার।

দুলালচন্দ্র বললেন: সেসব যাই হোক, জাপান এবার যুদ্ধটাকে একেবারে এশিয়া খণ্ডে টেনে নিয়ে এলো।

হরিপদ উৎসাহিত হয়ে বলল: তাইতো বলছিলাম—ডায়মণ্ড-হারবারে বোমা পড়তে বড় একটা দেরী নেই। এই কলকাতায়ও বোমা পড়বে। কলকাতা ছাড়তে হবে, চিন্তা নেই। আমি বললাম, লিখে রাখুন।

দুলালবাবুর কাছে সরে গিয়ে গোপন সৎ পরামর্শের ভঙ্গীতে হরিপদ বলল: রিজেণ্ট পার্কের জমিগুলো এবার ছেড়ে দিন। কলকাতার জমি-জায়গা কেনাবেচা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। যে দাম পান, দিয়ে দিন।

জমি-জায়গা কেনা-বেচা করানই হরিপদর পেশা। সহজ কথায় বলে—জমির দালালী। রিজেণ্ট পার্কে দুলালবাবুর অনেক জমি রাখা আছে। হরিপদর হাতেও অনেক ক্রেতা আছে। কিন্তু আরও বেশী দামের আশায় দুলালচন্দ্র সে জমিগুলো ছাড়তে রাজী হচ্ছিলেন না। হরিপদ চায়, বোমার ভয় দেখিয়ে সেই জমিগুলো কেনা-বেচা করিয়ে দুটো পয়সার মুখ দেখে। তাই বোমাগুলো যত কলকাতার দিকে এগিয়ে আসে, তাই ভাল।

প্রতাপাদিত্য রোড তৈরী হবার সময়ে বাওয়ালী মণ্ডল লেনের সেই পৈত্রিক বাড়িখানা ভাঙ্গা পড়েছে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের কাছ থেকে পাওয়া টাকা-পয়সাও প্রায় শেষ হয়ে এলো। কিন্তু নিজের মাথা গোঁজার জায়গা কিছু করা হয়নি। সেই কতদিন আগে তার বাবা ৺রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ফরিদপুর জেলার কোন একটা গ্রাম থেকে কয়েকখানা তালপাতার পুঁথি মাত্র সম্বল করে কালীঘাটের মায়ের মন্দিরে এসে হাজির হয়েছিলেন। সঙ্গে মাতৃহীন একমাত্র কিশোর সন্তান হরিপদ। হরিপদর বাবা সকাল বিকাল মায়ের মন্দিরের চত্বরে ঘোরাঘুরি করে। কখনও বা হালদার পাড়া রোড ধরে কালীঘাট ট্রাম ডিপো পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে রঘুনন্দন যজমান সংগ্রহ করে দু'বেলা দু'মুঠো পিতা-পুত্রের অন্নের সংস্থান করতেন। রাতে মায়ের মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে কোনওভাবে রাতটা কাটিয়ে দিতেন। ঐ রঘুনন্দনের মত আরও অনেকে ঐ ভাবে নাটমন্দিরে রাত কাটাত। নাটমন্দিরের রঙ্গশালায় এইভাবেই কত জীবনরঙ্গের অভিনয় হয়ে যেতো। তারপরে শানগরের জঙ্গলের মধ্যে বাওয়ালীর মণ্ডল মশায়দের হাতে পায়ে ধরে একটু মাথা গোঁজার আশ্রয় তৈরী করেছিলেন। তখন কিশোর হরিপদ মাঝে মাঝে ঘর বন্ধ করে ট্রাম ডিপোর দিকে চলে যেত। তখন ঐ ট্রাম ডিপোই কলকাতার দক্ষিণ সীমানা। কলকাতা শহরের শেষ। তার দক্ষিণ দিকে কেবলই জঙ্গল। একতলা দোতলা সব বাস দাঁড়িয়ে থাকত। অনেক দোতলা বাসের আবার ছাদ থাকত না। ভ্রমণ-বিলাসীদের হাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা। বাসের ড্রাইভার কনডাকটার সবই পাঞ্জাবী। হরিপদ অবাক হয়ে তাদের গতিবিধি কথাবার্তা শুনতো। ঐ খানেই হরিপদ বিনা কাজে ঘোরাঘুরি করে খুব আনন্দ পেতো। বাসের পুরনো টিকিটগুলো হরিপদ সংগ্রহ করে নিয়ে আসতো। কী কাজে লাগবে, কে জানে! দিন এইভাবে কেটে যেতো। একদিন হরিপদ অনেকগুলো বাসের টিকিট কুড়িয়ে নিয়ে হালদার

পাড়া রোড ধরে মায়ের মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছে—এমন সময় রাস্তায় দেখল একটা বাড়ির সামনে অনেক লোকের ভিড়। বাড়িটার মধ্যে অনেক পুলিশ। হরিপদ রাস্তার লোকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। সকলের চোখে মুখে একটা আতঙ্ক। হরিপদ সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নেবার চেষ্টা করতে লাগল। এমন সময় কে যেন এসে তার হাতখানা ধরে ভিড় থেকে সরিয়ে নিল। সে তাকিয়ে দেখে, বরেণ পাণ্ডা—তার নতুন কাকু। তার বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে তাদের বাসায় যান। বরেণ-কাকু জিজ্ঞেস করলেন: তুমি এখানে কি করছ, হরিপদ?

হরিপদ বলল: ওখানে অত পুলিশ এসেছে কেন, নতুন কাকু?

: ওখানে দাঁড়াতে নেই। এখানে কি করতে এসেছ?

: আমি একটু ট্রাম ডিপোর দিকে গিয়েছিলাম। তা অত পুলিশ কেন?

বরেণ পাণ্ডা এদিক ওদিক একটু দেখে নিয়ে নীচু গলায় বলল: ঐ বাড়ির একটি ছেলে একজন সাহেবকে গুলি করেছে; নিজেও মরেছে। তাই পুলিশ এসেছে।

হরিপদ দূর থেকে এক আধজন সাহেবকে দেখেছে। দেখতে বেশ সুন্দর। কাপড়-চোপড় পোষাক পরিচ্ছদ সবই অন্যরকম। দেখতে বেশ লাগে। তা অমন একজন সাহেবকে ও বাড়ির ছেলেটা গুলি করতেই বা গেল কেন? আর নিজেই বা মরল কেন? সে জিজ্ঞেস করল: ও বাড়ির ছেলেটা সাহেবকে গুলি করতে গেল কেন নতুন কাকু?

বরেণ পাণ্ডা হরিপদর মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদু হাসতে হাসতে বলল: ঐ সাহেব খবরের কাগজে স্বদেশী-ওয়ালাদের নামে নানা কথা লিখত, তাই।

: তা সকলেই তো কত কিছু লেখে। তাই বলে গুলি করবে?

: ওসব তুমি বুঝবে না, বাবা। ওসবের মধ্যে থাকতে নেই। তুমি বাড়ি চল।

নকুলেশ্বরের মন্দিরের সামনে দিয়ে তারা মায়ের মন্দিরের কাছে এসে পড়তেই রঘুনন্দনের সঙ্গে দেখা হোল। সঙ্গে সঙ্গে বরেণ পাণ্ডা তাকে বলল : কাল যে ষ্টেটস্‌ম্যানের ওয়াটসন সাহেবকে গুলি করেছে না? সে তো ঐ লাহিড়ীদের বাড়ীর ছেলে। মণি লাহিড়ী।

রঘুনন্দন জিজ্ঞাসা করল : কোন লাহিড়ী বাড়ী?

: ঐ যে বয়েজ ট্রেনিং-এর মাঠের পাশে বাড়ী। হালদারদের বাড়ীর উল্টো দিকে।

: তা তুমি কি করে জানলে?

: ওরে বাবা! ওদের বাড়ীতে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। আবার ঐ বড় রাস্তার দিকে একটা বাড়ির ছেলেও নাকি ছিল। তার নাম অনিল ভাদুড়ী। কে এক গোপাল চক্রবর্তী—তাঁর না কি ভাগ্নে। তোমার ছেলে তো সেইসব গণ্ডগোলের মধ্যেই দাঁড়িয়েছিল। আমি ধরে নিয়ে এলাম।

রঘুনন্দনের মুখখানায় উদ্বেগের ছায়া পড়ল। তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—তুমি এভাবে একা একা ঘুরে বেড়িও না, বাবা। কলকাতা শহর—বড় ভয়ানক জায়গা।

বরেণ বলল : না-না, ছেলেমানুষ একটু বেড়াবে-টেড়াবে বৈ-কি। জগৎ-সংসার চিনে নিক।—এই কথা বলে বরেণ তার নিজের কাজে চলে গেল। ছেলের হাত ধরে রঘুনন্দন মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললেন। হঠাৎ থেমে জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি মাকে দর্শন করেছ?

: অনেকবার করেছি। কিন্তু মায়ের চরণ দর্শন হয় না কেন বাবা?

: এতো বড় কঠিন প্রশ্ন! আমার মনে হয়, মাকে ঐ ভাবেই

পাওয়া গিয়েছে। এই কালীঘাট মহাপীঠ। এখানে সতীর দক্ষিণ চরণের চারটি আঙ্গুল পড়েছিল। দেবীর নাম কালিকা। দেবী থাকলেই ভৈরব থাকবেন। কালীঘাটের ভৈরব নকুলেশ্বর। তুমিতো নকুলেশ্বর মন্দির দেখেছ।

ঃ তা সে সতীর পায়ের আঙ্গুল কোথায় পড়েছিল, বাবা?

ঃ তা কি করে বলব? কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন—

"এই কলিকাতা কালিকা ক্ষেত্র কাহিনী ইহার সবার শ্রুত।

বিষ্ণুচক্র ঘুরেছে হেথায়, মহেশ্বরের পদধূলে পূত।"

তারপর এগিয়ে যেতে যেতে রঘুনন্দন বলতে লাগলেন: যশোহর-রাজ প্রতাপাদিত্যের কাকা রাজা বসন্তরায় কালীঘাটের আদি মন্দির তৈরী করিয়েছিলেন। এখন যে মন্দির দেখতে পাচ্ছ, তা বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায় ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে তৈরী করেন। লোকে বলে, তারও আগে না-কি এই আদি গঙ্গারই তীরে আরও উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে মায়ের আদিমন্দির ছিল। বর্গীরা তখন না-কি সেখানে নরবলি দিত। আর এই দেখ, রাধাকৃষ্ণের মন্দির। বাওয়ালীর কর্তাদের উদয়নারায়ণ মণ্ডল এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের কথা। এই কালীঘাটের কালী বড় জাগ্রত। সাহেবরা পর্যন্ত ভোগরাগনৈবেদ্য দিয়ে মায়ের পূজো দিত। হরিপদ বলল: তবে তো সাহেবরা ভাল লোক। তবে ও বাড়ির ছেলেরা তাদের মারতে গেল কেন?

ঃ ওসব ছেলেরা দেশ স্বাধীন করতে চায় কি না, তাই।

দেশ স্বাধীন করা মানে কি এবং ও ছেলেরা তা কেন চায় এবং চায় বলে ঐসব ভাল মানুষ সাহেবদের মেরে ফেলার কী দরকার, এত সব কথা হরিপদ বুঝতে পারে না।

এর মধ্যে তারা শানগরের মহাশ্মশানের কাছে এসে পড়েছে। রঘুনন্দন বললেন: এই মহাশ্মশানে কত মহাপ্রাণের স্মৃতিসৌধ রয়েছে। তাঁদের নশ্বর দেহ এইখানে শেষ হয়েছে। তুমি তাঁদের

কথা সব বইতে পড়েছ। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মহাপ্রাণ অশ্বিনী কুমার দত্ত, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল—এঁদের সকলেরই মরদেহ এইখানে ভষ্মীভূত হয়ে একে তীর্থস্থান করে রেখেছে। এইতো কিছুদিন আগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও এইখানেই চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥'

দেশজুড়ে লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা উঠছে। দেশবন্ধুর চিতাভষ্মের ওপরে কত বড় স্মৃতি-সৌধ তৈরী হবে।

হরিপদ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত দু'খানা এক জায়গায় করে কপালে ঠেকাল দেখে রঘুনন্দন অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন : তোমাকে একদিন সব ঘুরে ঘুরে দেখাব।

কেওড়াতলার শ্মশানের দক্ষিণে মহিষুরের রাজার স্মৃতি-সৌধও হরিপদকে দেখালেন। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ডানদিকে মহা-শ্মশানের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—অনেকগুলো চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে। হরিপদর খুব ইচ্ছা হয়েছিল, শবদাহ দেখবে। সে কোন-দিন দেখেনি। কিন্তু রঘুনন্দনের কী হোল কে জানে, ছেলের হাত ধরে তাড়াতাড়ি জায়গাটা পার হয়ে গেলেন।

রাত্রে ছোট একখানা তক্তাপোশের ওপরে দুজনে শুয়ে থাকত। গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ অন্ধকারে গাছ-গাছালির মধ্য থেকে ধ্বনি উঠত—'বলহরি হরিবোল'। হরিপদর ঘুম ভেঙ্গে যেত। বাবাকে জড়িয়ে ধরত। রঘুনন্দনও ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বলতেন : ভয়কি! শ্মশানে মড়া নিয়ে যাচ্ছে। তবু হরিপদর ভয় দূর হোত না। সে জিজ্ঞাসা করত : ওরা অমন করে হরিবোল বলে কেন বাবা?

রঘুনন্দন জানে না, কেন অমন করে বলে। কিন্তু ঐ রকমই নিয়ম। মড়া কাঁধে নিয়ে হরিনাম বলার পদ্ধতিও বদলে যায়।

কিন্তু শুধু এভাবে বলার জন্যই হরিনামও কী ভয়ানক হয়ে ওঠে। সে হরিনাম শুনলে কিশোর বালক ঘুম ভেঙ্গে ভয়ে চমকে ওঠে। মহাশ্মশানের কাছে বাসা। দেশ-দেশান্তর থেকে শব নিয়ে আসে দাহ করতে। আদি-গঙ্গার তীরে মায়ের মন্দিরের কোলে শ্মশান। এই শ্মশানে দাহ করলে আত্মার মুক্তি। তাই দিবারাত্রি ঐ ধ্বনি শোনা যায়। হরিনামের যত প্রকার পদ্ধতি আছে—এটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ যেন মানুষের জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে সাবধান-বাণী ঘোষণার মত। তা সাবধান হলে কী হবে। সাবধান হয়ে তো ঐ যাত্রাকে রোধ করা যাবে না। রঘুনন্দনকেও একদিন অমনি করেই যাত্রা করতে হবে। সেদিন ছেলেটা অনাথ হয়ে যাবে। কে তাকে দেখবে? দেখবার কেউ না থাকলে যাত্রা স্থগিত থাকবে না। রঘুনন্দনেরও থাকেনি। সেদিন অমনি ধ্বনি দিয়েই প্রতিবেশীরা সকলে মিলে তাঁকে দড়ির খাটিয়াতে শুয়িয়ে কাঁধে তুলে নিয়েছিল। তখন বাওয়ালী মণ্ডল লেনের বাসাটা আর কুঁড়ে ঘর ছিল না।

ছোট্ট একখানা পাকাবাড়ি। সেদিন সেই ধ্বনি শুনে হরিপদ জড়িয়ে ধরবার জন্য তার বাবাকে পায়নি। জড়িয়ে ধরবার মত যে ছিল, সে একজন তরুণী—তার স্ত্রী। হরিপদ সেই তরুণীকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা খুঁজতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই নারী সেদিন জ্ঞান-চৈতন্য-হারা হয়ে সেই মৃতদেহকে জড়িয়ে ধরে পড়েছিল। কিছুতেই ছাড়ান যায় না। সংসারের এমন বিচিত্র গতি যে, অনেকদিন পরে ঐ হরিপদই একদিন দুলালচন্দ্রকে বলেছিল—নিত্যরোগ, রোজ ব্যাধি। এমন বৌ নিয়ে আমি কী করব? অমন বৌ মরলেও শান্তি। তা হরিপদর শান্তি হয়েছিল। বৌ তাকে মুক্তি দিয়েছিল। তারপরে একদিন ছেলে. দুটোকে কোন এক আশ্রমে রেখে এসে, চীনেম্যান ডেন্টিষ্টের কাছে গিয়ে কালো দাঁতগুলো সাদা করে ফেলেছিল। তারপরে মাথায় টোপর পরে যা সকলে করে, হরিপদও তাই করেছিল। সেই হরিপদ এখন ভার্জিন নিউজ সংগ্রহ করে আর

দুলালচন্দ্রের বৈঠকখানায় বসে বসে চা খায় আর রিজেণ্ট পার্কের জমির ক্রেতা খুঁজে বেড়ায়। যে জমিটার ওপরে দুলালচন্দ্রের অতবড় বাড়িখানা হয়েছে, সেটা হরিপদই সংগ্রহ করে দিয়েছিল। সেই লেনদেন থেকেই দুলালের সঙ্গে হরিপদর পরিচয়। তারপরে একদিন কলকাতার মানচিত্র থেকে হরিপদর বাড়িখানা মুছে গেল। সেই থেকে হরিপদ সকলের আশ্রয়ের সন্ধান দিলেও নিজে নিরাশ্রয়।

তা সেসব আগেকার কথা। যুদ্ধ-দেবতা ধরণীর অনেক অকল্যাণ করে থাকতে পারে কিন্তু মঙ্গলও কম করেনি। হরিপদর আশ্রয় হয়েছে। প্রতাপাদিত্য প্লেসে বেশ একখানি বাড়ি করেছে। এ সেই হরিপদবাবু।

এ সেই হরিপদবাবু। তিনি গলার স্বর নীচু করে দরজার বাইরেটা একবার দেখে বললেন: সুভাষবাবুর অন্তর্ধানের দিনটি মনে আছে তো?

দুলাল: এই তো জানুয়ারী মাসে। তারিখটা মনে নেই।

হরিপদ অর্থপূর্ণ হাসিতে রহস্য সৃষ্টি করে একটু চুপ করে থাকলেন। তারপরে বললেন: ২৬শে জানুয়ারী। যোগাযোগটা দেখেছেন একবার? ঐ দিনই কংগ্রেসের স্বাধীনতা দিবস। আর দেখতে হবে না। তারিখটা দেওয়ালে লিখে রাখুন।

ঐ তারিখটার বিষয় হরিপদ এখনই কী ঘোষণা করে বসবে, সেই অজ্ঞাত আশংকায় শ্রোতারা ব্যাকুল হয়ে হরিপদর মুখের দিকে তাকালে সে বলল: আর দেখতে হবে না। এ নির্ঘাত সুভাষবাবুর কাণ্ড। আগামী বছর ২৬শে জানুয়ারী লাটপ্রাসাদে তেরঙ্গা পতাকা উড়বে। হিটলারের সঙ্গে পাকাপাকি কথা হয়ে গেছে। একেবারে রীতিমত চুক্তি।

দুলালবাবু মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন: চন্দননগরের রেডিওতে এই কথা শুনে এলে বুঝি?

হরিপদ: বিশ্বাস করতে হয় করুন, না হয় না করুন। কিন্তু একটা কথা বলে গেলাম। এবার তল্পি গোটাতে হবে।

একে-একে সকলেই চলে গেলেন। দুলালবাবু একা গড়গড়ার নল হাতে তুলে নিয়ে ভাবতে লাগলেন। কার তল্পি কে গোটায়, কে জানে! এতদিন যাহোক যুদ্ধটা সুদূর ইউরোপ-আফ্রিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরেজের দুর্গতিতে মনে মনে উল্লাসবোধ করায় কিছু অসুবিধে ছিল না। হিটলারের দাপাদাপিতে চারদিকে ত্রাহি-ত্রাহি রব উঠেছে। তা উঠুক। হিটলার ততদিনে রুশদেশের পশ্চিমাংশকে দলিত-মথিত করে একেবারে লেনিনগ্রাদের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছে। তাতেও দুলালবাবুর বৈঠকখানায় আনন্দ ম্লান হয়নি। কিন্তু এবার এশিয়ার নতুন সূর্য জাপান যুদ্ধের তাণ্ডবকে আমন্ত্রণ করে পূর্বখণ্ডে নিয়ে এলো। আমেরিকাকেও যুদ্ধে নামিয়ে দিল। মূর্তিমান কৃতান্তের মত যুদ্ধ-দানব ভারতের শিয়রে এসে দাঁড়াল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান মিত্রপক্ষে ছিল। মিত্রপক্ষ মানে ব্রিটিশের পক্ষে। সেই পক্ষকে মিত্রপক্ষ বলতে হবে। এও ভাগ্যের এক বিচিত্র পরিহাস। এবার জার্মানীর সঙ্গে জাপানের অনাক্রমণ চুক্তি হয়েছে। তা চুক্তিরই বা মূল্য কী? জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ারও তো অনুরূপ চুক্তি ছিল। কোথায় থাকল চুক্তি আর কোথায় থাকল কা? জাপানতো জার্মানীর মিত্র। তা হিটলারের অনুরোধে জাপান রাশিয়ার ব্লাডিফষ্ঠকে কোন সৈন্য-সমাবেশ করল না। লেলিনগ্রাদেই হিটলারের সমাধি রচিত হবে কি-না, কে জানে! নেপোলিয়নের মত অমন দুর্ধর্ষ বীর ঐ রাশিয়াতেই নিজের সমাধি রচনা করেছিল। হিটলারেরও বোধহয় তাই হবে।

দুলালবাবু গড়গড়ার নল মুখে নিয়ে এইসব ভাবছিলেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখেন, দরজার সামনে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। তাঁর পেছনে এক ভদ্রমহিলা এবং তারও পেছনে একটি অবিবাহিতা তরুণী। দুলালবাবু ভদ্রলোককে দেখেই চিনতে পারলেন। ওঁরা আগে

যেখানে ছিলেন, সেখানকার প্রতিবেশী। আলাপ-পরিচয় ব একটা ছিল না। হঠাৎ এতদিন পরে তাঁকে দেখে অভ্যর্থনা ক বসতে বললেন। ভদ্রমহিলা এবং মেয়েটিকে ভেতরে নিয়ে যাবা জন্য প্রিয়নাথকে ডাকাডাকি আরম্ভ করলেন। প্রিয়নাথ এ ভদ্রলোকদের দেখে একেবারে চক্ষুস্থির। সে সব পরিচয় জানে মেয়েটি প্রিয়নাথকে দেখে জড়সড় হয়ে পড়ল।

প্রিয়নাথ, ভদ্রমহিলা এবং মেয়েটিকে নিয়ে বড়বৌদি প্রসন্নবালা কাছে পৌঁছে দিল। তারপরে সেদিন যা ঘটেছিল তা বড় বেদনা দায়ক। দুলালচন্দ্র আর প্রসন্নবালা সেদিন চোখের জলেই ওঁদেরকে বিদায় দিয়েছিলেন। তা তাদের কোন দোষ ছিল না। গোত্র-দেবত রুষ্ট হয়ে সেদিন ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। কেউ দোষী নয়, কেউ অপরাধী নয়, তবু দোষ ঘটে গেল।

সে দোষের পরিণাম ভবিষ্যতে যা হবার তা হবে। কিন্তু প্রিয়নাথ সেদিন বড় বেদনাকাতর মনটি নিয়ে ভদ্রলোকের পেছনে পেছনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা আগে আগে চলেছেন। পেছনে একটু দূরে মেয়েটি চলেছে। প্রিয়নাথ কিসের আকর্ষণে কে জানে, পেছনে পেছনে এগিয়ে যাচ্ছিল। মেয়েটি পেছন ফিরে একবার প্রিয়নাথকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রিয়নাথের মনে হোল, মেয়েটি কিছু বলবে। সে একটু এগিয়ে যেতেই মেয়েটি তার মুখোমুখি হোল। মা-বাবার চোখের কোলে তখনও হয়ত জলের চিহ্ন ছিল। কিন্তু মেয়েটির তা নয়। সে স্বাভাবিক গলায় জিজ্ঞাসা করল: প্রিয় কাকা, আনন্দদা আর আপনার বোধহয় একই গোত্র, না?

কালীঘাটের বাসায় থাকতে আনন্দলালের অন্তরঙ্গতার সূত্র ধরে প্রিয় দু' চারবার অনু'দের বাসায় গিয়েছে। কিন্তু কোনদিনই আলাপ হয়নি। সেদিন 'প্রিয়কাকা' সম্বোধন শুনে বুঝে নিল, আনন্দলালের সূত্রে সে মেয়েটিরও কাকা হয়ে উঠেছে। মেয়েটি অর্থাৎ অনু

'আনন্দদা' বলে। প্রায় সকল অন্তরঙ্গতার প্রথম সোপান ঐ 'দাদা'। তারপরে কালে-কালে সেই দাদা কতরূপ যে পরিগ্রহ করে, তার ঠিক নেই। অনুও আনন্দকে 'দাদা' বলে পরিচয়ের প্রথম পাঠ নিয়েছিল। ক্রমে সেই ডাকা-ডাকির রূপান্তরের একটা সুপ্ত ইচ্ছেও হয়ত ছিল। তারপরে সকলের অজ্ঞাতে সেই সম্বন্ধটা যখন চরম পরিণতির দাবী নিয়ে উপস্থিত হোল, ঘটল তখনই বিপর্যয়। সে বিপর্যয় প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের চোখে দেখল। দুলালচন্দ্র আর প্রসন্নবালা চোখের জলে জানালেন,—বিবাহ অসম্ভব। উভয়ের একই গোত্র। বংশ পরিচয়ে, 'গোত্র' নামে একটি জিনিষ আছে, সেকথা অনু জানে। কিন্তু তার একটা মানুষের জীবনকে একেবারে ভেঙ্গে চুরে দেবার মত নির্দয় ক্ষমতার কথা জানা ছিল না। সেই কথা জেনেই অনু ঐ বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে। বোধহয় ঐ গোত্রটির প্রতিই সে বিরূপ হয়ে উঠেছে। এতবড় নিষ্ঠুর, এতবড় নির্দয় সেই গোত্র-দেবতার বিধান? তাই সে আলাপ-পরিচয়-হীন প্রিয়নাথকে জিজ্ঞাসা করল: আনন্দদা আর আপনার বোধহয় একই গোত্র?

প্রিয়নাথ সংক্ষেপে জানাল: হ্যাঁ।

' : তবে আর আপনি চোখের জল নিয়ে আমাদের পেছনে পেছনে এসেছেন কেন?

অনিমার চোখে মুখে কেমন যেন একটা বেদনা-কাতর অভিমান! সে জিজ্ঞাসা করল— আনন্দদা কোথায়?

: আণ্টু বোধহয় বাড়ি নেই।

অনুর ঠোঁটের কোণে একটু যেন বিদ্রূপের হাসি দেখা গেল। সে বলল: তা বাড়িতে থাকলে কি আমি খেয়ে ফেলতাম?

প্রিয়নাথ বুঝতে পারল, আনন্দ বাড়িতে অন্তরালে উপস্থিত থেকেও প্রত্যাখ্যাত হবার কথা সব নিজের চোখে দেখেছে—একথা অনু জানে। প্রিয় চুপ করে থাকল। আনন্দকে রক্ষা ব্যবস্থার

কোন কথা তার মনে এলো না। তখন অনু আবার বলল : আনন্দদা সামনে এলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম। তার সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা জানি না। আপনার সঙ্গে আনন্দদার অন্তরঙ্গতার কথা আমি জানি। তাঁকে আমার হয়ে একটা কথা বলবেন ?

ঠিক এইসময়ে ভদ্রলোক পেছন ফিরে দেখেন, অনু নেই। তিনি ব্যস্ত হয়ে একটু ফিরে এসে প্রিয়নাথের সঙ্গে মেয়েকে কথা বলতে দেখে বড়ই অপ্রসন্ন হলেন। ভাল-মন্দ স্থানে মেয়ের কথা বলার পরিণাম তিনি অনেক মূল্য দিয়ে জেনেছেন। তিনি বললেন : এতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে কী করছ ?

অনু প্রিয়নাথের মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে বলল : আর বল হোল না। চলি।

প্রিয়নাথ অবোধের মত দাঁড়িয়ে থাকল। অনু চলে গেল। বাড়ী ফিরবে বলে প্রিয়নাথ ফিরে দাঁড়াতেই আনন্দলাল এসে উপস্থিত। প্রিয় বলল : তুই একেবারে একটা অমানুষ। আনন্দ বোধহয় অভিযোগটা স্বীকার করে নিয়েই জিজ্ঞাসা করল : অনু কী বললরে, প্রিয়কা ?

: অনু বলল, তোর মত এমন একটা নচ্ছারের সঙ্গে ওর প্রেম হয়েছিল—এটা বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা।

মুখখানা বড়ই মলিন করে আনন্দ বলল : কেন মিছেমিছি মিথ্যে কথা বলছিস ? অনু একথা বলতেই পারে না।

: মেয়েটার এতবড় সর্বনাশ তুই কেন করেছিস ?

: আমি তোকে ছুঁয়ে বলছি, আমি অনুর কোন সর্বনাশ করিনি।

: একটা মেয়ের এতখানি সান্নিধ্য পেয়েও তুই তার সর্বনাশ করিস নি—একথা আমি বিশ্বাস করব ?

: ঐ একমাত্র ব্যতিক্রম প্রিয়কা, ঐ একমাত্র ব্যতিক্রম। তা ও কী বলল—একটু বল্ না ?

ঃ ও কী বলল, সেটা আমার মুখ থেকে শোনার চেষ্টা না করে ওর সঙ্গে একবার দেখা করে জেনে আয়।

ঃ তুই কি পাগল হয়েছিস? এর পরে আমি আর ওদের মুখ দেখাতে পারি?

ঃ তা যদি না পারিস, তবে প্রেম করতে গিয়েছিলি কেন?

ঃ আমি কি আর প্রেম করব বলে প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছিলাম? তুইতো জানিস, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা আমার জীবনের নেশা। কিন্তু এই মেয়েটা যে একেবারে ভিন্নরূপে দেখা দেবে—তা কে জানতো! তা যদি জানতাম, তবে না হয় গোত্রটা আগেই জেনে নিতাম।

এমন সময়ে অবনী সেইখানে এসে উপস্থিত। এই অবনী প্রিয়নাথের দাদা। বয়সে দু বছরের বড়। সম্পর্কেও দাদা। কিন্তু বন্ধুভাবাপন্ন। অবনী, প্রিয় আর আনন্দ পারিবারিক বন্ধনে যাই হোক, তিনজনে অন্তরঙ্গতায় বন্ধুস্থানীয়। অবনী পেশায় ডাক্তার। দার্জিলিং-এর পাহাড়ী অঞ্চলে চাকরী করে। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছে। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে কেনাকাটা করতে যাচ্ছে। সে বিদেশে থাকে। আনন্দলালের চরিত্রের পরিচয় জানা থাকলেও সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কিছুই জানে না। সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেই প্রিয় আর আনন্দকে দেখে জিজ্ঞাসা করল: ওরা কারা এসেছিল রে? বড়দা আর বড় বৌদি কান্নাকাটি করছিলেন। তোদের খোঁজাখুঁজি করেছেন। তাড়াতাড়ি বাড়ী যা।

আনন্দ তাড়াতাড়ি বলল: তুই বাড়ী যা, প্রিয়কা। আমি একটু ঘুরে আসি।—বলেই সে কোথায় চলে গেল। প্রিয় বলল: বাছার প্রেম করবার সখ আছে কিন্তু জের টানবার ক্ষমতা নেই।

অবনী বলল: ও কি এখনও সেই সব করে চলেছে নাকি? আজতো আবার মেজদা আসবেন। কমলা ভাগ্নীও আসবে শুনতে

পাচ্ছি। বড়দা ডাকাডাকি করছেন। বাড়ি যা। আমি ঘুরে আসছি।

অবনীর স্ত্রী বাসন্তী বলল: রাণীদি তোমার খোঁজে এসেছিল, ঠাকুর পো। তোমাকে একবার যেতে বলেছে।

প্রিয়র মনে পড়ল, বেশ কয়েকদিন বিন্দুমাসীমার বাসায় যাওয়া হয়নি। নন্দদা কোথায় বালীগঞ্জের দিকে বাসা ঠিক করেছে। সে বলল: নন্দদা নাকি বাসা বদল করে চলে যাচ্ছে?

অবনী বলল: তোদের অত্যাচারেই নন্দদা দূরে চলে যাচ্ছে।

প্রিয় ভয় পেল—অত্যাচারটা রাণী বৌদির ওপরে বলে সকলে ধরে নিল কিনা কে জানে! সেদিন অন্ধকারের মধ্যে বস্ত্রহরণের কথাতো কেউ জানে না। অবনী বলল: তোরা সব দল বেঁধে লুচি আর পটলভাজা খেয়েই বেচারা নন্দদাকে তাড়ালি।

কথাটা শুনে প্রিয়নাথ নিশ্চিন্ত হোল। সে বলল: সেসব আর এখন খাওয়া হচ্ছে কোথায়? তা ওরা সব কবে যাচ্ছেন?

বাসন্তী বলল: তা সেসব গেলেই রাণীদির কাছে জানতে পারবে।

বাসন্তীর মুখে হাসির রেখা দেখে প্রিয়নাথ গম্ভীর হয়ে বলল: রাণী বৌদি ছাড়া অন্যের কাছে শোনা যাবে না বুঝি?

বাসন্তী বলল: তোমাকে খোঁজাখুঁজি করছিল। তাঁর সঙ্গে দেখা তো করবেই—তাই বলছিলাম। এতে তুমি রাগ করছ কেন?

তিনজনেই হেসে উঠল। নিজ নিজ কাজে সকলে বিদায়ও নিল। অবনী কাল সস্ত্রীক কর্মস্থলে চলে যাবে। তার জন্য কোন পক্ষেই কোন ব্যাকুলতা নেই। না অবনীর, না প্রিয়নাথের। কিন্তু চিরদিন এমনটি ছিল না। তারা যখন ছোট ছিল, তখন অবনী প্রথম লেখাপড়া শিখবার জন্য কলকাতায় চলে এলো। তখন অবনীর হয়ত নতুন পরিবেশের মাদকতা ছিল। কিন্তু প্রিয়নাথের কোন সান্ত্বনা ছিল না। সে সংসারের সকলের অজ্ঞাতে গোপনে চোখের জল

ফেলতো। অবনী বয়সে এবং বুদ্ধিতে বড়। সে বলেছিল, এক বছর পরে ফিরে আসবে। এক বছর কতদিনে হয়, তা দুজনের একজনও জানত না। অবনী জ্যেষ্ঠের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে বলেছিল, একশ দিনে এক বছর হয়। সেই বুদ্ধি দিয়েছিল, দেওয়ালে রোজ একটা করে দাগ দিয়ে রাখতে। চোখের জল ফেলে ফেলে প্রিয়নাথ অনেক দিন পর্যন্ত দেওয়ালের একটা নিভৃত স্থানে একটা করে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে রাখত। ক্রমে সে দাগ দেবার কথা ভুলে যেতে লাগল। তবুও মাঝে মাঝে দাগগুলো গুণে দেখত—একশ হতে কত দেরী। তার দাদা অবনীভূষণের পড়াশুনো সাঙ্গ করে ফিরে আসতে কত দিন বাকি। তারপর সে দাগগুলোই অক্ষয় হয়ে দেওয়ালের গায়ে লেগে থাকল। সেগুলো কেউ আর গুণে দেখতো না। তা সেসব পড়াশুনো শেষ হয়েছে। প্রিয়নাথ নিজেই কবে কলকাতায় চলে এসেছে। কত মিলন, কত বিচ্ছেদ হয়ে চলেছে। কিছুই কারও অন্তরে আর রেখাপাত করে না। সকলেরই নিজস্ব পরিবেশ গড়ে উঠেছে। নিজ নিজ গণ্ডি নিয়েই প্রত্যেকে ব্যস্ত। অবনীভূষণের স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে। তাদের ভাল-মন্দ, রোগ-ব্যাধি, পড়াশুনো, কেনাকাটা, শ্বশুরবাড়ির নতুন আত্মীয়তা। সেখানে শ্বশুর, শালা, শালী আরও কত কিছু।

সেখানে অবনীভূষণের নিজের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা জগৎ। তার নতুন মর্যাদা, নতুন সমারোহ। আনন্দলাল, হৈমবতী, অনু ইত্যাদি জ্ঞাত-অজ্ঞাত কত কিছু নিয়ে আপন পরিবেশ রচনা করেছে। প্রিয়নাথও চুপ করে বসে নেই। সকলেই নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়লে সেও ঐ বিন্দু-মাসীমার বাড়ীতে কিসের লোভে ছুটে ছুটে যায়। চারুশীলার রূপ-যৌবনকে অবহেলা করার অভিযোগে সে বিষ্ণুপুরে টেনে নিয়ে যায়। তারপরে আবার কোথাকার কে এক ছোকরা দিদি বলে ডেকে টানাটানি করল। চারুর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

ওদিকে নাট্যাচার্য বললেন, ওসব সাময়িক বিলাস। দাদা-দিদির বন্ধনে ধরা দেবার মেয়ে চারু নয়। কীসের বন্ধনে সে ধরা দেয়, কে জানে। যোগ্য স্থান পেলে সে নাকি সত্যবানের গৃহ-কোণে আদর্শ সাবিত্রী হয়ে থাকতে পারত। তা তেমন যোগ্য স্থান কোথায় সৃষ্টি হয়ে আছে, তা প্রিয়নাথ জানে না। তার জানবার দরকারও নেই।

এই সব নানা কথা চিন্তা করতে করতে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল।

*　　*　　*

হরিপদবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে। অনেকেই কলকাতা ছেড়েছে। কলকাতায় বোমা পড়েছে। তা কলকাতার মানুষেরা বোমা-পড়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেনি। তার অনেক আগেই কলকাতা ছাড়তে আরম্ভ করেছে। সেই জাপানীরা যেদিন পার্লহারবারে বোমা ফেলে তছনছ করে দিল, তারপর থেকেই নিত্য নতুন চমক্। ভারতের অসহায় নরনারী এই বিপর্যয়ের মধ্যে একটা আনন্দের আস্বাদন লাভ করল। এশিয়া মহাদেশের বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে কয়েকটা শতাব্দী ধরে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ ইত্যাদি মিলে যেমন খুসী শোষণ-শাসন করেছে। সেইসব দেখে-শুনে এদেশের সকলেই ভেবে নিয়েছিল, পৃথিবীর রাজশক্তি পশ্চিম গোলার্ধে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। হাজার হোক, জাপান দেশটা এশিয়ার মধ্যে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেখে এশিয়ার জনগণ কিছুটা গৌরব বোধ করেছিল। সেই যুদ্ধে জাপান মিত্র পক্ষে ছিল। যুদ্ধ জয়ে জাপানের কৃতিত্বের কথা মনে মনে স্বীকার করলেও এই অভ্যুত্থানকে মিত্রপক্ষ সুস্থচিত্তে গ্রহণ করতে পারে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেই জাপান ব্রিটিশ-আমেরিকার শত্রু-রূপে দেখা দিল। তার প্রথম প্রকাশ পার্লহারবারে। সে দিনটা ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে পার্লহারবার পতনের পরে নতুন সংবাদের

জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয় নি। মাত্র তিন চার দিনের মধ্যেই সমগ্র বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে একটি সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। হরিপদবাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে বললেন, ব্রিটিশের বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে গেছে। লণ্ডনের প্রিন্স মারা গেছে।

এ আবার কি বিচিত্র সংবাদ! দুলালবাবু জিজ্ঞাসা করলেন: কোন প্রিন্স?

: বাকিংহাম প্যালেসে বোমা পড়েছে। জাপানের কাণ্ড।

: তোমার মাথা। জাপান ওখানে বোমা ফেলবে কী করে?

: তা ফেললে আমি কী করব? ওদের অসাধ্য কিছু নেই। একেবারে চিমনির মধ্য দিয়ে বোমা ফেলেছে। প্রিন্স খতম।

: এ সংবাদ তুমি কোথায় পেলে?

: আমি এইমাত্র পত্রিকা-অফিস থেকে শুনে এলাম।—তারপরেই হিঃ হিঃ করে হাসতে হাসতে হরিপদবাবু অতি কষ্টে বললেন: শীতের সকালে বৌ-ছেলে-মেয়ে নিয়ে আরাম করে ফায়ার প্লেসের কাছে বসেছিল। এর মধ্যেই বোমা পড়বি তো পড় একেবারে চিমনির মধ্যে। জর্জ দি সিক্সথ্ অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন! কিন্তু ছেলে খতম। দুলালবাবু সন্দিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন; কিন্তু ষষ্ঠ জর্জের তো ছেলে নেই?

এই সৃষ্টিছাড়া কথা শুনে হরিপদবাবু ফাঁপরে পড়লেন। কিন্তু বিপাক নিয়ে বসে থাকলে তাঁর চলবে না। এমন একটি চমকপ্রদ সংবাদকে তিনি অকালে নষ্ট হতে দিতে পারেন না। তিনি বললেন: ছেলে না থাকলে মরল কী করে?

সত্যি কথা। জীবন না থাকলে মৃত্যু অসম্ভব। মৃত্যু যখন হয়েছে, তখন জীবন নিশ্চয়ই ছিল। অনেক সময় মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনী মৃত্যুর দ্বারা নিজের অস্তিত্বকে প্রমাণ করেছিল। দুলালবাবু গড়গড়ার নল টানতে লাগলেন। হরিপদর সংবাদ-দানের বৈচিত্র্য তিনি জানেন। হরিপদর

মুখে কী সংবাদ কী রূপ ধরেছে, কে জানে। তিনি চুপ করেই থাকলেন। সত্যি সংবাদ যদি কিছু থাকে, একটু পরেই জানা যাবে। তা জানা গিয়েছিল। শুধু দুলালবাবু কেন, সারা বিশ্বের লোক জানতে পেরেছিল। যা মরেছিল, তা মানুষ নয়, জাহাজ। তাও একটি নয়—দুটি। মাত্র দু'ঘণ্টার ব্যবধানে 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্' আর 'রিপালস্' নামে দু'টি জাহাজ সাগরের অতলান্ত জলের নীচে চলে গেল। জাপানের কাণ্ড। যুদ্ধ আরম্ভ হবার পরে ব্রিটিশের এতবড় বিপর্যয় আর হয় নি। চার্চিল সাহেবের বুকের পাঁজরা ভেঙ্গে গেল। ঘুম ভাঙ্গিয়ে নাকি তাকে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। সাহেব সে সংবাদ বিশ্বাস করেন নি। সংবাদ-দাতা কোনও মতে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছিল। তা অবিশ্বাস্য বৈকি! জাহাজ তো নয়, দু'টি ভাসমান দুর্গ! প্রথমটি পঁয়ত্রিশ হাজার টনের ব্যাটলসিপ আর দ্বিতীয়টি বত্রিশ হাজার টনের ক্রুজার। ষোল ইঞ্চি মোটা ইস্পাতের প্লেট দিয়ে মোড়া। জাপানীরা অন্ধি-সন্ধি জেনে নিয়ে একেবারে জাহাজের চোঙের মধ্য দিয়ে বোমা ফেলেছে। একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। ১৯৪১ সালের ১০ই ডিসেম্বর সকালে পরিষ্কার সূর্যালোকে এই ঘটনা ঘটে গেল। তারপর থেকেই চলল একের পর এক উল্লাস অভিযান। পর্বতগাত্র থেকে স্খলিত তুষারের মত যেখানে নেমে পড়ে, সেখানেই সব একাকার। কয়েকদিনের মধ্যেই তারা গুয়াম, ফিলিপিনের সুজান, বোর্ণিও, হংকং, মিন্দানাও, ওয়েক দখল করে ক্রমে বর্মায় এসে হাজির হোল। তখন বর্মা থেকে পলায়নের পালা। গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই, পথ নেই, ঘাট নেই। তবুও কাতারে কাতারে মানুষ দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে। দেহ রক্তাক্ত হোল। তবুও চলার বিরাম নেই। ঝরা পাতার মত আগণিত জনস্রোত চলেছে। একদিন তারা দু'মুঠো অন্নের জন্য সেই বরমা মুলুকে গিয়ে হাজির হয়েছিল। অনেকেরই দু'মুঠোর জায়গায় দশমুঠোর সংস্থান হয়েছিল। সেসব পড়ে থাকল।

এবার শুধু প্রাণটা নিয়ে রওনা হোল। তা-ও বুঝি থাকে না। তাও ভবিতব্যের হাতে। অনেকে রোগের হাতে, অনেকে ডাকাতের হাতে, অনেকে পথের দুর্গমতার হাতে জীবন দিল। বাকিরা জীর্ণশীর্ণ দেহ নিয়ে কোন মতে প্রাণটা বাঁচিয়ে দেশে ফিরে এলো।

তাদের মুখে বরমা মুলুকে ধ্বংসলীলার কাহিনী শুনে আর এখানেও সেই দুর্যোগ আসন্ন মনে করে, কলকাতার লোকেরা পালাতে আরম্ভ করল। গাড়ি-ঘোড়ার জন্য অপেক্ষা করবার সময় নেই। যে যেদিকে পার, পালাও। পালাতে হবে সেইটেই বড় কথা। কোথায়—সে প্রশ্ন অবান্তর। টালার লোকেরা পালিয়ে টালীগঞ্জে এলো; আর টালীগঞ্জের লোকেরা টালায় গিয়ে নিরাপদ হোল।

বিন্দুবাসিনীকেও পালাতে হবে। এই মহাবিশ্বে তিনি কোথায় যে কী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিলেন—তার আদি অন্ত নেই। একেবারে বদ্রিনারায়ণের গিরি-কন্দর থেকে আরম্ভ করে সেই বরমা মুলুক পর্যন্ত। তাঁর এক কন্যাস্থানীয়া না কি পেগুতে ছিল। জামাই সেখানে দীর্ঘদিন অবস্থান করে নানারূপ বিষয় কার্যাদির দ্বারা অনেক অর্থ সংগ্রহ করেছিল। সে সব সংগৃহীত বিত্ত ফেলে রেখে সেই জামাই একদিন তাঁর স্ত্রী আর মেয়ের হাত ধরে এসে উপস্থিত হোল। বর্ধমানে তাদের পৈত্রিক বাড়ি অরণ্য হয়ে পড়েছিল। জামাই এসে বন কেটে বসত তৈরি করল। আর সেইখানে প্রিয়নাথের জন্য বিধাতা পুরুষ ফাঁদ পেতে বসে থাকলেন।

*　　　*　　　*

নন্দদুলাল তখন প্রিয়নাথদের পাড়া ছেড়ে বালীগঞ্জের নতুন বাসায় উঠে গেছে। বালীগঞ্জ অঞ্চলে তখন লেক তৈরী করে পানা-পুকুর ভর্তি করে-করে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। বাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা পেনসন কমিউট করে সেই টাকা দিয়ে দিয়ে বাড়ী করে তাতেই থাকেন আর নতুন-কাটা লেকের ধারে হাওয়া খেয়ে বাকী জীবনটা

একটু বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেন। তা নন্দদুলাল তেমনি একখানা বাড়ির দুখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে। এটা শোনা কথা। প্রিয়নাথের এখনও সেখানে যাওয়া হয়নি। বাসা ছেড়ে যাবার আগের দিন কী একটা ছুটি ছিল। দুপুরবেলা প্রিয়নাথ নন্দদুলালের বাসায় গিয়েছিল। নন্দ বাড়ীতে ছিল না। প্রিয়কে দেখেই বিন্দু মাসিমা বললেন: আয় বাবা, প্রিয়নাথ। কালতো আমরা নতুন বাসায় চলে যাচ্ছি। তা আমাদের ভুলে যাবি নাতো বাবা?—প্রিয় বলল: ভুলে যাব না মাসিমা। তবে এখানে যেমন রোজ আসতাম, তেমন কি আর হবে? অনেকটা দূর তো? তবে মাঝে মাঝে যাব বৈকি!

মাসিমা বললেন: এখন কোথায় আর রোজ আসিস? আজকাল তো আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিস।—এইকথা বলে বিন্দুবাসিনী নিজের ঘরখানার দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন—হৈম বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। তার জামা কাপড় ঠিক-ঠাক নেই। তিনি কটাক্ষে একবার প্রিয়নাথের দৃষ্টিটা পরীক্ষা করে নিয়ে বললেন: হৈম রোজই বলে, প্রিয়দা আজকাল আর বড় আসেন না! তা আমি বলি, তোর প্রিয়দার কত কাজ! রোজ আসবার সময় কোথায় তার? তা তুই একটু বোস বাবা—এই কথা বলে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর রানী বৌমার ঘরের দরজা বন্ধ। কী ভাবলেন কে জানে, দরজায় করাঘাত করে বললেন: বৌমা, প্রিয় এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে খোলা দরজার সামনে হাসিমুখে রানী বৌদিকে দেখা গেল। সামনের দাঁতে একটু দাগ ছিল। তাতে রাণী বৌদি হাসলে প্রিয়নাথের খুব ভাল লাগত। রাণী বলল: ওরে বাবা! এ যে একেবারে গরিবের বাড়ীতে হাতির পা। এসো, এসো, প্রিয় ঠাকুরপো।—রাণী কী একটা শিল্প করছিল। বাড়তি সুতোটা সেই দাগওয়ালা দাঁত দিয়ে কেটে বলল: বৌদির কথা মনে পড়ল তাহলে?

ঃ মনেতো দিনরাতই পড়ে রাণী বৌদি।

ঃ ওমা! সে কি কথা? লোকে শুনলে কী বলবে?

ঃ তাহলে আপনার মনে পাপ আছে রাণী বৌদি।

রাণীর মনে পড়ল—বেশ কিছুদিন আগে, একদিন সে স্নান করতে করতে প্রিয়নাথ এসে পড়েছিল, আর রাণী একলা বাড়ীতে দরজা খুলে দিয়েছিল। সেদিন আবার আলো নিভে গিয়েছিল। সেই নিকষ কালো অন্ধকারের মধ্যে দরজার কড়া নড়ে উঠেছিল। প্রিয়নাথ ভয় পেয়ে ভেবেছিল, নন্দদা এসেছে। তখন রাণী হেসে বলেছিল—তাহলে তোমার মনে পাপ আছে প্রিয় ঠাকুরপো। রাণী বৌদি হাসিমুখে একনজরে প্রিয়নাথকে দেখে নিয়ে বলল: আমার অস্ত্র দিয়েই আমাকে ঘায়েল করলে? তা বেশ করেছ। দাঁড়াও, দরজাটা বন্ধ করে দিই।

প্রস্তাব শুনে প্রিয়নাথ আকাশ থেকে পড়ল। আলস্যে আধশোওয়া হয়েছিল। এক ঝট্‌কায় দাঁড়িয়ে দুই চোখ বড় বড় করে বলল: আমি আগে বেরিয়ে যাই। তারপরে আপনি দরজা বন্ধ করুন।

সে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই রাণী বৌদি দুহাত দিয়ে প্রিয়নাথের ডান হাতখানা ধরে বড়ই মিনতির সুরে বলল: তুমি বেরিয়ে যাবে কেন? বাড়িঅলার ছেলেমেয়েগুলো এসে বিরক্ত করে, তাই দরজা বন্ধ করতে চেয়েছি।

রাণী দরজা বন্ধ করে দিল। দুইজনই ফিরে গিয়ে নিজ-নিজ জায়গায় বসল। কিন্তু প্রিয়নাথ গুম্ হয়ে বসেই থাকল। বাড়িঅলার ছেলেমেয়েদের অত্যাচারের হাত থেকে রাণী-বৌদির এই বিচিত্র প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সে মোটেই সমর্থন করতে পারেনি। ভরদুপুরে দরজা-বন্ধ ঘরের মধ্যে দুইজনে বসে থাকলে; যদি লোকের মনে প্রশ্ন জাগে, তবে দোষ দেবে কাকে? রাণী প্রিয়নাথকে একটু দেখে নিয়ে বলল: অমন মুখ-গোমরা করে বসে থেকে কাজ নেই। তারচেয়ে

দরজা খুলে দিচ্ছি, চলেই যাও।—প্রিয়নাথ গম্ভীর হয়েই বলল : তা রাগ করলে কী হবে! চলে যাওয়াই উচিত। এ পাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন কেন, বলুন?—রাণী বলল : তুমি বিশ্বাস কর, প্রিয় ঠাকুরপো, তোমার দাদা কি করছেন না করছেন—তা আমি কিছুই জানি না।

এইবার একটু হেসে প্রিয় বলল : আপনার অনুমতি না নিয়েই নন্দদা এসব করেছে না কি!

কথাটা রাণীর পক্ষে আস্বাদ করবার মত। কথাটার মধ্যে তৃপ্তি আছে। আবার কথাটার মধ্যে কপটতাময় অবিশ্বাস প্রকাশ করবার মধ্যেও আনন্দ আছে। তাই সে বলল : তোমরা সব তেমনই পুরুষ মানুষ! মেয়ে মানুষের কথা শুনবে? সে আর এ জন্মে হবে না, ভাই।

রাণী আরও কিছু বলত। কিন্তু তার আগেই বিন্দুবাসিনী দরজায় করাঘাত করে বললেন : ও বৌমা, ওপরের বৌমা এসেছে।—ওপরের বৌমা মানে—বাড়িঅলার গিন্নি। তার ছেলে মেয়েদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই রাণী না কি দরজা বন্ধ করেছিল। কিন্তু ললাটে দুঃখ থাকলে খণ্ডাবে কে? সন্তান-সন্ততির হাত থেকে রক্ষা পেলেও জননীর কাছে নিস্তার নেই। জনৈক শ্রীহট্টবাসী চিড়ে ভেজাবার জন্য কিছু জলের খোঁজে নদীর জলে পা দিয়েই জলজ কীট জাতীয় কিছু দেখে ভেবেছিল—কুমীরের ছানা। তাই বলেছিল, নিজে আছ গভীর জলে। সন্তানকে পাঠিয়েছ শিকারের বার্তা সংগ্রহে। ছানাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে মা-কুমীরের ভয়ে লোকটি শুকনো চিড়ে খেয়ে খিদে মিটিয়ে ছিল। রানী বৌদিও দরজা খুলে দিলে। কিন্তু ততক্ষণে প্রিয়নাথের অঙ্গ হিম হয়ে যাবার অবস্থা। ওপরের গিন্নি এসেছে, একথা সত্যি। কিন্তু সেই গিন্নি রাণীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিল কি না—সেকথা ইতিহাসে পরিষ্কার লেখা নেই। বিন্দুবাসিনী হয়ত দরজা-বন্ধ ঘরের মধ্যে দুইজনের

অবস্থানের একজন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখবার জন্যই ঐ গিন্নীর চোখের সামনে দরজাটা খুলতে বলেছিলেন। তা যা চেয়েছিলেন, তাই হোল।

দরজা খুলতেই বিন্দুবাসিনী, রাণী বৌমা আর প্রিয়নাথকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করলেন। বোধ হয় বন্ধঘরে নিরালা অবস্থানের কোন গন্ধ আছে কি-না, তাই শুঁকে দেখলেন। বাড়িঅলা গিন্নির চোখে মুখে কিছু প্রতিক্রিয়া হোল কি-না তাও লক্ষ্য করলেন। কী পেলেন না পেলেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু অন্নদাতা ছেলের সোহাগের বৌকে প্রসন্ন করবার জন্য তাকে মুক্তিদানের কপট ছলনায় বললেন : প্রিয় রোদে-রোদে পুড়ে মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে এলো। তা আমি বললাম বৌমার ঘরে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে একটু চুপচাপ শুয়ে থাক। বৌমাকে বললাম, ওর কপালে একটু ওষুধ-টষুধ লাগিয়ে দিতে। তা কিরে, বাবা! মাথাটা একটু কমেছে?

মাসিমার উপস্থিত বুদ্ধি এবং সংকট মোচনের ব্যাকুলতায় প্রিয়নাথ একটু কৃতজ্ঞতাই বোধ করল।

বাড়িঅলা গিন্নী কথাটাতে প্রিয়নাথের প্রতি ব্যথায় কাতর হয়ে উঠলেন। তাঁর স্বামী পুলিসের সামান্য চাকরি করে অত বড় একখানা বাড়ি করেছে। প্রচুর টাকা ভাড়া পাওয়া যায়। কর্মস্থলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তৎপরতায় মধ্যজীবনেই চাকরীর অবসান হয়েছে। এমন কর্ম-কুশল পুরুষকারের সুগৃহিনী সংসারের সব গতিপথকে অত সরল ভাবলে, এত লক্ষ্মীর আশীর্বাদ বর্ষিত হোত না। একজন যুবতী বৌ স্বামীর অনুপস্থিতিতে দুপুরবেলা দরজা বন্ধ করে একজন পুরুষ মানুষকে নিয়ে থাকলে, তিনি তার অর্থ বোঝেন। তাই খেদভরা গলায় বললেন—তবে ওদেরকে কেন মিছিমিছি ডাকাডাকি করলেন, দিদি? তা দাওনা, বৌমা, একটু ওষুধ-টষুধ লাগিয়ে। আহা বেচারা!

বাড়িঅলা গিন্নীর কোমল কণ্ঠে রাণীর সারা শরীরে আগুন জ্বলে

উঠল। সে বলল: কেন মা, আপনি এতগুলো মিথ্যে কথা মিছেমিছি বললেন? প্রিয় ঠাকুরপোর মাথার কোন যন্ত্রণা হয়নি। আর আপনিও কিছু ওষুধ লাগাবার কথা বলেননি। এসো, প্রিয় ঠাকুরপো —এই কথা বলে হতচকিত প্রিয়নাথের হাতখানা ধরে তাকে সবলে টেনে নিয়ে ধপাস্ করে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় ওঁদের চোখের সামনে দরজা বন্ধ করে দিল।

* * *

সেই দিনই রাত্রে কলকাতায় বোমা পড়ল। সে দিনটি ছিল ১৯৪২ সালের একুশে ডিসেম্বর। শহরবাসিকে আতংকিত করে কেঁপে কেঁপে সাইরেণ বেজে উঠল। সে যেন মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের শিয়রে বসে অসহায় মায়ের আকুল কান্না।

দুলালবাবুর মস্তবড় তিনতলা বাড়িটাতে আশ্রিত-পরিজন মিলিয়ে অনেক লোক। সকলে প্রাণের ভয়ে নীচে নেমে এলো। দুলালবাবু এ আর পি-র কর্তাদের ধরে চারিদিকে ব্যাফল ওয়াল তুলে বোমার হাত থেকে বাঁচবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেইখানেই সকলে আশ্রয় নিল। বাড়ির ওপরে বোমা পড়লে রক্ষা নেই। কিন্তু কাছে পিঠে পড়লে, বোমার টুকরো ব্যাফল ওয়াল ভেদ করে আসতে পারবে না। মন্দের ভাল। সাইরেণ বাজলেই প্রসন্নবালা দেবীর শরীর বিকল হয়ে উঠত। ঘন ঘন একটা জায়গায় যাবার প্রয়োজন হোত। তিনি সেইখানে যাতায়াত করতে করতে লক্ষ্য করলেন, সকলেই এসেছে কিন্তু প্রিয়নাথ আসেনি। তিনি সাইরেণের মত কাঁপা-কাঁপা গলায় সেই কথা বলতেই আনন্দলাল প্রিয়নাথকে খুঁজতে গেল।

ওদিকে প্রিয়নাথ ততক্ষণ ছাদে দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কলকাতার আলকাতরার মত তামসী রূপ দেখতে আরম্ভ করেছে আলো-বিহীন তিনখানা বিমান আকাশে ভেসে চলেছে। তারা অদৃশ্য হয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। হঠাৎ গুম গুম শব্দ করে তুবড়ির ফুলকীর মত আকাশে উঠতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেইখান থেকে

বড় বড় লাল লাল গোলাকার ফুটবলের মত কী যেন আকাশে উঠে যেতে লাগল।

প্রিয়নাথের মনে হোল, সকালবেলা উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পর পর অনেকগুলো সূর্য হঠাৎ অসম্ভব গতিবেগ অর্জন করে ওপরে উঠে গেল। দুইচোখ মেলে প্রিয়নাথ যখন অবাক বিস্ময়ে এইসব দেখছে, তখন সেখানে এসে হাজির হোল তিনু, প্রিয়নাথের অধ্যাপক-দাদার নব-পরিণীতা মেয়ে। ছেলেবেলায় টাইফয়েড হয়ে মেয়েটির শ্রবণ-শক্তি নষ্ট হয়েছিল। সব কথা ভাল শুনতে পেত না। আর পেত না বলেই, সব কিছু জেনেশুনে বুদ্ধিমতী হতে পারেনি। তা বুদ্ধিহীনা তিনু যতই নিরুদ্বেগ হোক, তাকে দেখে প্রিয়নাথ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করল: তুই এখানে এসেছিস কেন?

সে কথায় বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে তিনু নিবিষ্টমনে তুবড়ির খেলা দেখতে লাগল। প্রিয়নাথ তিনুকে নীচে পাঠাবার জন্য যখন সাধ্য-সাধনা করছে, তখন উদ্বেগে আকুল হয়ে সেখানে ছুটে এলো নৃপতি—তিনুর নব-পরিনীত বর। তার প্রথম প্রেমের আকুলতা। সে তিনুর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে নীচে নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। আর সেই সময়েই প্রসন্নবালার বিশেষ প্রতিনিধি আনন্দলাল এসে উপস্থিত। রাগলে আনন্দলালের তোতলামি আরম্ভ হয়। রাগে আর ভয়ে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে সে বলল: তো-তো-তোদের আক্কেলটা কি? কা-কা-কার মাথায় বোমা পড়বে ঠি-ঠি-ঠিক নেই, ছা-ছা-ছাদের উপর এসে বাহাদুরি হচ্ছে। ওদিকে মা চ্যা-চ্যা-চ্যাচামেচি করছে।

নিরুদ্বেগ কণ্ঠে প্রিয় বলল: বোমা কোথায় রে আণ্টু? চল্ দেখে আসি।—এবার আনন্দর এত রাগ হোল যে, আর কথাই বলতে পারল না।

'কিসের মধ্যে কী, পান্তাভাতে ঘি'। প্রিয়নাথ আনন্দলালের কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল: ওদিকে কাল পাড়া

অন্ধকার করে গ্রেটাগার্বোতো চলল। সে খবর জানিস?—এর মধ্যে দুলালচন্দ্র ফটাস ফটাস চটির শব্দ তুলে একেবারে ছাদে এসে উপস্থিত। তিনি আসতে না আসতেই সকলে সুড়সুড় করে ছাদ থেকে নেমে গেল। সকলকে ডেকে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি প্রসন্নবালার কাছ থেকে ছুটি মঞ্জুর করিয়েছিলেন। সকলে নেমে যাওয়াতে তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা হোল। তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছু কথা দেন নাই। তাই নিজে ছাদে দাঁড়িয়ে চিরদিন ধরে দেখে-আসা আলো ঝলমল রূপসী কলকাতার রূপান্তরের তামসী রূপ দেখতে লাগলেন। কিসের থেকে তিনি বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন, তা ভগবান জানেন। তাঁর স্থির প্রত্যয় ছিল, বোমার আঘাতে তাঁর মৃত্যু হবে না। তিনি শুধু ভাবতেন প্রসন্নবালার জন্য। গ্রহাচার্য গণনা করে বলেছিল—প্রসন্নবালার মৃত্যুযোগ আছে। সেই ভয়ে কাঁটা হয়ে কত শান্তিস্বস্তয়ন, কত পুজো-পাট। এত সব করে কুপিত গ্রহের রুদ্ররোষ শান্ত করা হয়েছিল। তাতেই বুঝি গ্রহ-দেবতাগণ দুলালচন্দ্রের প্রতি কুপিত হয়ে ছিল। তাই সেই সর্বনাশা পরিণাম। তা সে সব কথা থাক। মৃত্যু যেমন সহজ, তেমন কঠিন। কোন কোন মৃত্যু-পথযাত্রীর জীবন-যন্ত্রণা দেখে মনে হয়, তার মৃত্যু হয় না কেন। মরণ কি সংসারে নেই? মৃত্যু তাকে পরিহার করে চলে। আবার মৃত্যু কত সহজ। প্রিয়নাথ দেখেছে—কলকাতার পথে ঘাটে মৃতদেহ। দেশে আকাল লাগাল। সে অনেক পরের কথা। গ্রামগঞ্জ থেকে কাতারে কাতারে মানুষ কলকাতায় এসে জমা হতে লাগল। একটু ফ্যান দাও, একটু ফ্যান দাও—করতে করতে এই বাংলা দেশে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মরে গেল। রাস্তায় রাস্তায় মৃতদেহ। পুলিসের লোকেরা মড়াগুলো নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যেত। সকাল বেলায় সব পরিষ্কার। ডাক্তার সার্টিফিকেট না দিলে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে একটি মৃতদেহ পোড়ান যায় না। কিন্তু প্রিয়নাথ দেখেছে, রাতের নির্জনতায় কুড়ি

পঁচিশটা মৃত শিশু একটি চিতায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোন্ ডাক্তার সেইসব শিশুদের চিকিৎসান্তে সার্টিফিকেট দিয়েছিল, কে জানে! একদিন প্রিয়নাথ রাস্তায় একটি দৃশ্য দেখেছিল। একটি শিশু তার মায়ের স্তন্যপান করছিল। কিন্তু মা একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ নির্বিকার নিরাবরণ। কাছে গিয়ে প্রিয়নাথ লক্ষ্য করে দেখেছিল, মায়ের দেহ প্রাণহীন। মৃত মায়ের বুকের ওপরে শুয়ে হতভাগ্য সন্তান চর্মসার একটি স্তন মুখে নিয়ে মাতৃদুগ্ধের আস্বাদন লাভের প্রত্যাশায় অন্তিম চেষ্টা করে যাচ্ছে। অনেকদিন পর্যন্ত প্রিয়নাথের মুখে অন্ন রোচেনি। এসব পরের কথা। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বলেছিল—ইংরেজ ভারত ছাড়! ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা নয়। ইংরেজ সে ধৃষ্টতা ক্ষমা করেনি। তার তখন জীবন-মরণ সমস্যা! হিটলার বোমাবৃষ্টি করে তাদের স্বদেশকে ছারখার করে দিচ্ছে। 'ভারত ছাড়' বললেই অমনি তল্পি গুটিয়ে দেশে চলে যাবে কেন! ভারতবাসীকে সেই ধৃষ্টতার মূল্য দিতে হোল, পঞ্চাশ লক্ষ প্রাণ বলি দিয়ে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে যদি পঞ্চাশ লক্ষ প্রাণ বলি হয়ে থাকে, তবে বেশ একটা ছন্দ আছে বলতে হবে। কাব্য সাহিত্যের দেশ কিনা—তাই ছন্দ মিলিয়ে ইতিহাস রচিত হয়। আঠার দিন ধরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছিল। দুই পক্ষ মিলিয়ে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। তাই নিয়ে অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত তৈরী হোল। তার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত ভগবদ্গীতারও সেই অষ্টাদশ অধ্যায়। এতো সেই ভারতভূমি। তাই এখানে ছন্দ মিলিয়ে-মিলিয়ে ইতিহাস রচিত হয়।

মসনদে তখন নবাব নাজিমুদ্দিন। লরী লরী চাল নিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে গঙ্গায় ফেলে দিল। ফজলুল হক সাহেব বুঝি তেমন সম্ভাবনার অনুমান করে মসনদ ছেড়েছিলেন। উত্তরাধিকার নাজিমুদ্দিনের। পেটের ভাতে টান পড়ল। কাতারে কাতারে মানুষ গিয়ে ইংরেজের ফৌজি জমানায় ভর্তি হতে লাগল। ইংরেজ সরকার

কানে ধরে সহযোগিতা আদায় করে নিল। এত কাণ্ড করেও ঠেকান গেল না। ষ্ট্যালিনগ্রাডে হিটলারের বিপর্যয়ে যা একটু শুভ লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, জাপানের অগ্রগতিতে এখন একেবারে নাভিশ্বাস উঠেছে। ওদিকে সাইগন থেকে রেডিওতে যত বলে 'আমি সুভাষ বলছি' ব্রিটিশ সরকার তার থেকে দশগুণ বেশী বলে—সুভাষের নামে মিথ্যা রটনায় বিশ্বাস করো না।

শত্রুপক্ষকে ছলনার ফন্দি-ফিকিরের শেষ নেই। নিত্য নতুন সময়ের প্রবর্তনও তেমনই একটি ফন্দি। যুদ্ধের আগে দু'রকমের সময়ের হিসেব ছিল। একটি নাম 'ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম'। তা সারা ভারতের জন্য। ঐ সময়ের সঙ্গে চব্বিশ মিনিট যোগ করে কলকাতার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা ছিল। তার নাম 'লোকাল টাইম'। কলকাতার ইস্কুল, কলেজ, কোর্ট কাছারি সব লোকাল টাইম হিসাবে চলত। শত্রুপক্ষকে সময় সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করবার জন্য একটা নতুন সময় প্রবর্তন করা হোল ; তার নাম 'বেঙ্গল টাইম'। শীতের দিনে সূর্যোদয় হতে না হতেই সেই বেঙ্গল টাইম অনুসারে নটা বেজে গেল। যে যার মত কাজে বেরিয়ে পড়ল। খবরের কাগজটা পর্যন্ত পড়বার সময় নেই। সেই সাত সকালে বেরিয়ে পড়ে ট্রামে যেতে যেতে প্রিয়নাথ জানতে পারল—কাল বোমা পড়েছে। সে বুঝতে পারল, কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে যে তুবড়ির খেলা দেখেছে, তা আর কিছু নয়, জাপানি বোমা।

বোমাটা পড়ে ফেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত লাল টুকরোগুলো ছিটকে ওঠাই নিকশ কালো অন্ধকার আকাশের চিত্রপটে অনভিজ্ঞ প্রিয়নাথের কাছে মজাদার তুবড়ির খেলা হয়ে উঠেছিল। আর নতুন ওঠা সূর্যের মত বড় বড় লাল লাল গোলাকার বলগুলোও আর কিছু নয়, এ্যান্টি এয়ারক্র্যাফটের গোলা। প্রিয়নাথ ভাবতে লাগল, সে জানত না বলেই অমন প্রাণঘাতি বীভৎস কাণ্ড সে প্রাণ ভরে দেখতে পেরেছে। শরৎচন্দ্র আঁধারের রূপ দেখেছিলেন,

জাহাজের খোলে গড়াগড়ি খেতে খেতে। সাইক্লোনের সময়ে প্রমত্ত সমুদ্রের রূপ দেখেছিলেন। প্রিয়নাথও নয়ন ভরে কলকাতায় বোমা-পড়া দেখল।

*　　　　*　　　　*

যে ভদ্রলোক প্রিয়নাথকে গতরাত্রে বোমা-পড়ার সংবাদ দিয়েছিলেন, তিনি এদিক-ওদিক একটু দেখে নিয়ে নিম্নস্বরে বললেন : কাল রাত্রে অনেক লোক মরেছে। লরী-লরী মড়া কাল রাতের অন্ধকারে সরিয়েছে।

প্রিয়নাথ ভাবল, সে জানত না বলেই অমন দুর্লভ দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। আর মৃত্যু? মড়া দেখতে দেখতে মৃত্যুটা যেন মানুষের কাছে সহজ হয়ে আসে। দিনে-রাত্রে পথে ঘাটে অত মড়া দেখলে তাই বুঝি হয়। জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধানটা ক্রমে কমে আসে।

অফিসে পা দিতেই প্রিয়নাথ দেখল, বড় বড সব কর্তাব্যক্তিরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁরা সব লাল মুখো সাহেব। সুধীন এসে পাশে দাঁড়াল। সুধীন দাসগুপ্ত, প্রিয়নাথের প্রিয় পাত্র। সে মৃদুস্বরে বলল : আপনি এসেছেন প্রিয়দা? আপনার দেরী দেখে আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কোথায় কী হোল কে জানে! কাল যা কাণ্ড!

প্রিয় বলল : বড় সাহেবরা সব বেরিয়ে পড়েছে দেখছি।

সুধীন বলল : কালকের ঘটনার পরে উপস্থিতির সংখ্যা দেখতে বেরিয়েছে। সব লোক কলকাতা ছেড়ে পালাল কি-না, তাই দেখছে। টেবিলে টেবিলে সব কাগজ দিয়েছে। ওভারসীজ বণ্ড সই করতে হবে। পৃথিবীর যে কোন জায়গায় যাবার জন্য তৈরী থাকতে হবে। সই করলে কর, না হয় বিল্বপত্র।

প্রিয়নাথ বিল্বপত্রের মর্মার্থ জানে। বিদেশে রওনা হবার সময়ে প্রিয়জনেরা বেলপাতার গন্ধ শুঁকিয়ে দেয়। কলকাতা রওনা হবার

সময়ে প্রিয়নাথের মাও দিয়েছিলেন। তাই বিল্বপত্র বলতে বিদায়ের চিহ্ন। চাকরি থেকে বিদায়। যারা ওভারসীজ বণ্ডে দস্তখত করবে না, ম্লেচ্ছ সাহেবরা বুঝি প্যান্টের পকেট থেকে বেলপাতা বার করে তার আঘ্রাণ প্রদান করবে ?

যুক্তিপ্রসাদ ব্রিগেডিয়ার সাহেবের এক নম্বর আরদালী। সে ছুটতে ছুটতে এসে কপালে তর্জনীটা ঠেকিয়ে বলল : সাব জলদি সেলাম দিয়া। পইলে একদফে সেলাম দিয়া। উস বখত আপ আয়া নেই।

সাহেবরা প্রিয়নাথদের কোনদিন সেলাম দেয় না। প্রিয়নাথরাই চিরদিন ঘুরে ঘুরে সাহেবদের সেলাম জানায়। তবুও বলার এই রীতি। সাহেব ডেকেছে—একথা না বলে, ওরা বলে—সাব সেলাম দিয়া। তাই সাহেব সেলাম জানিয়েছে শুনে প্রিয়নাথরা গদগদ হয়ে ওঠে না। শঙ্কিত হলেও হতে পারে। প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি পা চালালে সুধীন এসে আস্তে বলল : এ্যাটেণ্ডেন্সের কথা জিজ্ঞাসা করবে বোধহয়। খাতাখানা নিয়ে যান। খুব সাবধান! একেবারে আগুন হয়ে আছে।

খাতাখানা নিয়ে প্রিয়নাথ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল। তার মনে নানা চিন্তা। সদ্য বিলেত থেকে আসা ব্রিগেডিয়ার সাহেব। মুখে একটা পাইপ থাকে। চিবিয়ে চিবিয়ে ইংরেজিতে কথা বলে। সে কথা প্রায় দুর্বোধ্য। কী কথা জিজ্ঞাসা করবে, তাই বা কে জানে! আফিসের হাজিরার কথা হতে পারে। বোমার কথা হতে পারে। ওভারসীজ বণ্ডের কথা হতে পারে, অথবা দেরিতে আফিসে আসার কথাও হতে পারে। তা এতসব চিন্তা করার অখণ্ড অবসর নেই। সে সাহেবের টেবিলের সামনে হাজির হয়ে বাউ করে হাতটা কপালে ঠেকিয়ে মুখে বলল : গুড মর্নিং স্যার, গুড মর্নিং স্যার।

যুগপৎ এতগুলো বিনয়-নম্র অভিবাদনে সাহেব বিন্দুমাত্র বিগলিত

হয়েছেন—প্রিয়নাথের এমন কিছু মনে হোল না। ফাইলের দিকে তাকিয়েই পাইপ মুখে দুর্বোধ্য উচ্চারণে সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন: ডিড্ ইউ নো এ, কে, ব্যাড্রি?

বোমার কথা নয়, হাজিরার কথাও নয়। এ আবার কি বিচিত্র প্রশ্ন? তা বিচিত্র বলে তো উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। প্রিয়নাথ ভাবল, এ, কে ব্যাড্রি নামে ভদ্রলোক সাহেবের বন্ধুস্থানীয়, না হয় আত্মীয়-স্থানীয় না হয়ে যায় না। তবে তা যদি হয়, সে ভদ্রলোককে না জানাটা অপরাধ হতে পারে। ওদিকে জানি বললেও বিপদ আছে। তা বিপদের কথা পরে ভাবলেও হবে। এখন সাহেবকে প্রসন্ন করতে হলে; এ, কে, ব্যাড্রিকে জানিই বলতে হবে। বেশী কথা চিন্তা করবারও সময় নেই। সে এ, কে, ব্যাড্রিকে চেনে— এমন একটা গৌরবময় হাবভাব চোখে-মুখে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করে বলল: সিওর স্যার।

ফল হোত বিপরীত। সাহেবের ফাইল পড়া বন্ধ হোল; মুখ তুলে প্রিয়নাথের দিকে তাকাল। লাল মুখখানাতে যেন রক্ত ফেটে পড়তে চায়। দুই চোখে ঘোর সংশয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। প্রিয়নাথ হতভম্ব। একভাবে প্রায় মিনিটখানেক সাহেব প্রিয়নাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে পরিষ্কার উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করল: ডু ইউ ফীল প্রাউড অফ ইট্?

ততক্ষণে প্রিয়নাথের মুখ থেকে আনন্দের সব চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে। সাহেব তার দিকে তাকিয়েই আছে। প্রিয়নাথ শুনেছে, সাহেবদের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে ওরা বোকা মনে করে। ভাল হোক, মন্দ হোক, কিছু একটা বলে ফেলতে হয়। প্রিয়নাথ তাই করল। সে বলল: ইয়েস স্যার।

সাহেবের মুখে আরও বিস্ময়। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ দু'টি মেলে সাহেব প্রিয়নাথকে একনজর দেখে নিয়ে পুনরায় ফাইল পড়তে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ প্রিয়নাথ দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু সাহেব

আর কোন কথা বললেন না। প্রিয়নাথ আস্তে আস্তে সরে এলো।

আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে প্রিয়নাথ ফিরে আসতেই সুধীন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল: কি ব্যাপার, প্রিয়দা! এত গুরুগম্ভীর কেন? সাহেব কী বলল? আমাদের এ্যাটেণ্ডেন্সতো ভালই।

প্রিয়নাথ গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল: ব্যাড্রি সাহেব কে, বলতে পার?

সুধীন বলল: ব্যাড্রি নয়ত। ট্রাফিকে বার্ড সাহেব আছে।

: সাহেব পরিষ্কার বলল—এ, কে, ব্যাড্রি।

: তাহলে সে নয়। তার নাম এ, এন, বার্ড। কেন? কি ব্যাপার?

: সাহেব জিজ্ঞাসা করল, আমি এ, কে, ব্যাড্রিকে চিনি কিনা। আমি কিছু চিন্তা না করে বলে ফেললাম, ইয়েস স্যার। তাই শুনে সাহেব কটমট করে তাকিয়ে থাকল।

সুধীন বলল: আচ্ছা দাঁড়ান। আমি ব্যাড্রি সাহেবের নাড়ি-নক্ষত্র বার করে দিচ্ছি।—এই কথা বলে সে বেরিয়ে গেল আর একটু পরেই ব্রিগেডিয়ার সাহেবের এক নম্বর আরদালী যুক্তিপ্রসাদকে এনে প্রিয়নাথের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। প্রিয় জিজ্ঞাসা করল: হ্যারে যুক্তি, ব্যাড্রি সাহেবকে জানিস?

যুক্তি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে বলল: সাহেব না আছে। এক উ মিস্ ব্রাডি আছে।—এই কথা বলতে বলতেই সাহেবের ঘরে বেল বেজে উঠল। যুক্তিপ্রসাদ বেগে প্রস্থান করল।

সুধীন বলল: ব্যাপারটা বুঝলেন প্রিয়দা? মিস্ ব্রাউডির কথা বলছে। তা মিস্ ব্রাউডির নাম কি এ. কে. ব্রাউডি নাকি?

: তা কি করে জানব? ওর নাড়ি-নক্ষত্র কে জানতে গেছে? সাহেবের কাছে রোজই আসে। ফষ্টিনষ্টি করে। সাহেব তো বুড়ো মানুষ আর ও মাগীটাতো ওর মেয়ের বয়সী।

সুধীন বলল : আপনিও যেমন প্রিয়দা ! নিজের জরু-জারা দেশে রেখে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসেছে। ও কি এখন বয়স মিলিয়ে মিলিয়ে ফষ্টিনষ্টি করবে নাকি ? তা সে বুড়িই হোক আর ছুঁড়িই হোক, আপনি কি তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার চেষ্টা করেছেন নাকি কখনও ?

প্রিয়নাথ আকাশ থেকে পড়ল। সে বলল : আমার দায় পড়েছে ? সাহেবই তো একদিন ওর সঙ্গে নিউ মার্কেটে যেতে বলল।

সুধীন গম্ভীর হয়ে বলল : কাজটি ভাল করেননি প্রিয়দা। ঐ যে মেয়ের বয়সী বললেন ? ঐ জন্যই ছেলের বয়সী ছোকরাদের ওপরে ওর সন্দেহ। ওর সঙ্গে আপনাকে নিউ মার্কেটে পাঠিয়ে ও টেষ্ট করেছে। ওর মনে খট্‌কা লেগেছে।

এই কথা বলতে বলতেই দরজার সামনে যুক্তিপ্রসাদ এসে হাজির। তার সঙ্গে সেই বিতর্কিত মিস ব্রাউডিকে দেখে প্রিয়নাথের দুই চোখ একেবারে ছানাবড়া। মিস ব্রাউডি দরজার সামনে দাঁড়াতেই সকলের সম্মিলিত দৃষ্টির ফোকাস তার ওপরে পড়ল। সদ্য হোম থেকে আসা সুন্দরী যৌবনবতী মিস ব্রাউডি। সকলের দৃষ্টিতে মিস ব্রাউডি কোন বিড়ম্বনা বোধ করেনি। তার প্রারব্ধ যৌবনের উগ্রতা যেন বসনের বেড়াজালকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে চায়। মূর্তিমান বিদ্রোহীর মত। সে লীলায়িত ভঙ্গিতে স্লিভলেস বাহুটি তুলে তর্জনী নেড়ে প্রিয়নাথকে ডাকল। ভাগ্যের এমন বিচিত্র পরিহাস—অমন মোহিনী রূপবতী যুবতীর ডাক লক্ষ্য করে প্রিয়নাথের অন্তরাত্মা খাঁচা-ছাড়া হয়ে গেল।

সুধীন এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে মিস ব্রাউডিকে দেখছিল। এতক্ষণে সম্বিৎ ফিরে আসতে বলল : দেখুন, বলেছিনা প্রিয়দা ? আপনি গিয়েছেন ঐ আগুনের ফুলকিতে হাত দিতে।

সুধীন কী বলেছিল আর তার অনুমান কতখানি অভ্রান্ত, তা

বিচারের অবসর নেই। কালিমাখা মুখখানা নিয়ে প্রিয়নাথ হাজির হতেই রূপসী গোটা দুই মুক্তোর মত দাঁত বার করে মৃদু হেসে বলল : কাম এ্যালং।

দ্বিতীয় কোন কথা না বলে মেম্‌-সাহেব হাঁটতে আরম্ভ করল। মিস ব্রাউডি আগে আগে চলেছে। উপযুক্ত ব্যবধান বজায় রেখে প্রিয়নাথ পেছনে পেছনে চলেছে। অন্য সময় হলে প্রিয়নাথ অগ্রবর্তিনীর লীলায়িত গতিছন্দ লক্ষ্য করত। কিন্তু মানসিক নির্যাতনে সে ম্রিয়মান। কোন অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে, তা সে জানে না। পেছনে যেতে যেতে প্রিয়নাথের সেই যাত্রাদলের পালাগানে সাবিত্রী-সত্যবানের কাহিনী মনে পড়ল। যমরাজ সত্যবানের প্রাণপুষ্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে আর পেছনে পেছনে সাবিত্রী। সত্যবানের প্রাণপুষ্পের সঙ্গে সাবিত্রীর প্রাণটাও বুঝি সেই যমরাজের হাতে।

তারপরে এক সময়ে মিস ব্রাউডির যাত্রা শেষ হোল। অনেক অলিন্দ, অনেক বারান্দা, অনেক সিঁড়ি অতিক্রম করে তবে যাত্রা শেষ হয়েছে। একটা দরজার সামনে তারা দাঁড়াল। প্রিয়নাথ ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল, বোর্ডে নাম লেখা রয়েছে—পি. ডবলিউ গ্রেহাম, সিকিউরিটি অফিসার।

মিস ব্রাউডি আবার লাল টুকটুকে দুটি ঠোঁট একটু ফাঁক করে মোহিনী হাসি হেসে বলল : হিয়ার ইট্‌ ইজ। কাম ইন, প্রিয়া।

এমন মোহন রূপের এমন মোহময় ডাকে প্রিয়নাথের অন্তরে কিছু আনন্দ হয়নি। মস্ত বড় স্প্রিং-এর দরজাটা বাঁ হাত দিয়ে ঠেলে মিস ব্রাউডি ডান হাতখানা প্রসারিত করে দিল। সেই প্রসারিত বাহুবন্ধনে প্রিয়নাথ ধরা দিল। যৌবনপুষ্ট দেহখানার অঙ্গে অঙ্গে প্রিয়নাথের দেহ মিশে গেল। কিন্তু প্রিয়নাথের দেহে তখন যেন কিছু সার নেই। প্রিয়নাথের কাছে তখন ঐ মেম্‌-সাহেবের দেহখানাও যা, একটা কাঠও তাই। কোন রোমাঞ্চ নেই, কোন শিহরণ নেই।

কী এক অজানিত উদ্বেগে সে কণ্টকিত হয়ে আছে। তার দেহ অসার, পাথর। মিস ব্রাউডির বাহুলগ্ন হয়েই প্রিয়নাথ সিকিউরিটি অফিসার মিষ্টার গ্রেহামের টেবিলের সামনে এসে হাজির হোল।

প্রিয়নাথকে অবাক করে দিয়ে গ্রেহাম সাহেব পরিষ্কার বাংলায় বলল : আসুন প্রিয়নাথবাবু, বসুন।—তারপরে মিস ব্রাউডির দিকে তাকিয়ে বলল : থ্যাঙ্ক। ভাবখানা এই, মেম-সাহেব অসাধ্য সাধন করেছে। শিকার করতলগত হয়েছে। মিস ব্রাউডি সাহেবের দিকে তাকিয়ে তাকে কৃতার্থ করবার ভঙ্গিতে ফিক করে হেসে প্রিয়নাথকে বলল : থ্যাঙ্ক। মীট ইউ এগেন।

প্রিয়নাথ বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। গ্রেহাম সাহেব মৃদু হেসে তাকে বসিয়ে বলল : আপনার সাহেব ব্রিগেডিয়ার ফাউলার আমাকে সব বলেছেন।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলল : আই কনগ্র্যাচুলেট ইউ। আপনি তো মশায়, আপনার সাহেবকে একেবারে বশ করে ফেলেছেন, দেখলাম। আমাদের একটু দেখবেন।

মনোহারী কথায় প্রিয়নাথ বিন্দুমাত্র উল্লসিত না হয়ে অজানা আশংকায় কাঠ হয়ে থাকল। তারপরেই সাহেব প্রিয়নাথের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল : আপনার সাহেব মিলিটারি অফিসার। তিনি তো করবেনই। আমিও আপনাদের মনে মনে রিগার্ড করি। তারপর মুখখানা একটু প্রিয়নাথের দিকে এগিয়ে এনে নিম্নস্বরে বলল : যা করি মশায়, চাকরির খাতিরে। আসলে আমারও জন্ম ইণ্ডিয়াতে। আপনাদের মনের যন্ত্রণা আমি বুঝি।

এত বিনয়বাক্যে প্রিয়নাথের উদ্বেগ আরও বেড়ে গেল। তারপরেই গ্রেহাম সাহেব ঢিলেঢালা ভাবে প্রশ্ন করল : অনিল ভাদুড়ি আপনার কে, মিষ্টার ভট্টাচার্য ?

প্রিয়নাথের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। চোখের সামনে

থেকে একটা কালো পরদা সরে গিয়ে বিরাট একটা অগ্নি বলয় ভেসে উঠল। তার মনে হোল, সাহেব মধুর হেসে তার হাত দুখানা ধরে ঐ বলয়ের মধ্যে ঠেলে দেবে। তার পরে তার মধ্যে অন্তহীন অজ্ঞাত যন্ত্রণার দিন। এ, কে, ব্যাড্রি ব্রিগেডিয়ার সাহেবের কোন বন্ধু নয়, আত্মীয় নয়। তার মেয়ের বয়সী সুন্দরী যুবতীও নয়। সে আর যাই করুক, বাহুলতায় জড়িয়ে গ্রেহাম সাহেবের ঘরে পৌঁছে দেয় না। সে তার নিজেরই আত্মীয় মৃত অনিল কুমার ভাদুড়ি।

সে আজ কতদিনের কথা। সেই ১৯৩২ সাল। দেশের কাজে তার জীবন উৎসর্গের কথা এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল। এতদিন পরে সেই ইতিহাস একটা ঘৃণিত প্রেতিনীর রূপ ধরে আজ নিরন্ন প্রিয়নাথের উদরান্নের পথ অবরোধ করে দাঁড়াল। মিস ব্রাউডি মধুর মধুর হেসে তার দেহের রোমাঞ্চকর ছোঁয়া লাগিয়ে যেখানে পৌঁছে দিয়ে গেল, সেখান থেকে মুক্তির বোধহয় একটাই পথ আছে। সে পথটা একেবারে লৌহ-কপাটের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে।

* * *

সংসারে অনেকের অনেক কিছু প্রিয় জিনিষ থাকে। কিন্তু সব থেকে প্রিয় নিজের জীবনটা। সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যে, কবি তার কাব্যে, সাধারণ গৃহী তার অনুতাপে অনেক সময় তাপিত এই মরুতে জীবন-যন্ত্রণার কথা বলেন। কিন্তু এই ধরণীর প্রতি প্রত্যেকের একটা গভীর মমত্ববোধ আছে। তা আছে বলেই সংসারটা টিকে আছে। নিজ-নিজ চেষ্টায় সকলেই যদি আপন বন্ধন অটুট রাখবার চেষ্টা না করত তবে হয়ত একলা সৃষ্টিকর্তার পক্ষে কোটি-কোটি জীবকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হোত না। শুধু বেঁচে থেকেও পরিত্রাণ নেই। সুখ চাই, শান্তি চাই, আনন্দ চাই, সার্থকতা চাই। তা না হলে, কোথায় থাকল স্বামী, কোথায় থাকল ছোট ছেলেটা;

নিজের প্রাণটা নিয়ে পালাবার জন্য বিন্দুবাসিনী পাগল হয়ে উঠবেন কেন! তাঁর অন্নদাতা ছেলে থাকল, ছেলের বৌ থাকল। তিনি তাঁর পেটের শত্রুকে নিয়ে বোমার রাজ্য থেকে পালাবার জন্য দিনের বিশ্রাম আর রাতের ঘুম পরিহার করলেন।

তিনি দুলালচন্দ্রকে বলতেন 'বড় দুলাল' এবং নন্দদুলালকে 'ছোট দুলাল'। দূর সম্পর্কের দুই ভাইয়ের মধ্যে একটা গভীর আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠার জন্যই তাঁর এই নাম বৈচিত্র্যের আবিষ্কার। আত্মীয়তার গভীরতা অন্যত্র থাক বা না থাক, অন্তত নামের মধ্যে বজায় থাক।

নিজের জীবনের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করতে তিনি লজ্জা বোধ করেছেন। তাই প্রাণরক্ষার জন্য তিনি পেটের শত্রুকে অবলম্বন করলেন। পেটের শত্রু মানে তাঁর মেয়ে হৈম। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন: এই পেটের শত্রুকে নিয়ে আমি কি করি? এ বোমার রাজ্য থেকে কোথায় পালাই?—শত্রু কথাটা অবশ্যই ভালবাসার অর্থে। তাঁর আগের বাড়িঅলার ছেলে প্রিয়কে বলেছিল, তিনি নাকি হৈমকে প্রিয়নাথের হাতে দিতে চান। মেয়ে বলেছিল, আমি তো তার বোন। আনন্দলাল মেয়েকে বলেছিল, তুমি তো আমারও পিসি—গঙ্গাজলের শিশি। তা সেই শিশি থেকে গঙ্গাজল নিয়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে আনন্দলাল বিন্দুবাসিনীর কোন দুর্গম যাত্রাপথকে পবিত্র করছিল, তা প্রিয়নাথ জানত না।

পেটের শত্রুর জন্য মায়ের উদ্বেগের কথা শুনতে শুনতে একদিন নন্দদুলাল বলেছিল: তা আমি না হয় তোমার পেটের শত্রু না হয়ে মিত্রই হলাম। কিন্তু তোমার ঐ মেয়ে একদিন তোমার ঐ সাধের দেওয়া নাম সার্থক করে তুলবে—দেখে নিও।

মা বললেন: তা বাবা, সন্তান পেটে ধরলেই জ্বালা। তবুও সন্তান ধারণ করতে হয়। রক্ষা করতে হয়।

কথাটার মধ্যে বোধহয় শ্লেষ ছিল। নন্দদুলালের বিয়ের পরে

পাঁচ বছর কেটে গেছে, তবুও সন্তানাদি হয় নি। বিন্দুবাসিনীর বোধহয় গর্ব এই, উদাসী সন্ন্যাসী স্বামীকে বারবার ঘরে টেনে এনে এনে তিনি পরপর মা ষষ্ঠীর কৃপাধন্যা হয়েছেন। শেষকালে স্বামী বুঝি একেবারে বেঁকে বসেছিল। তখন তিনি নিজে বদ্রিনারায়ণের পর্বতকন্দরে স্বামীকে দর্শন করে, আশীর্বাদরূপে ছোট ছেলেটাকে নিয়ে এসেছিলেন। একে বলে নিষ্ঠা। কিন্তু ছেলে নন্দদুলাল ষোল আনা আয়োজন হাতের কাছে পেয়েও ব্যর্থ হয়েছে।

পুত্রবধূ দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রশ্নোত্তর শুনছিল। জনান্তিকে কিছু ঈশারায় সংলাপ হয়েছিল কিনা, কে জানে। নন্দ উৎসাহিত হয়ে বলল: রক্ষা করার ক্ষমতা কোথায় তোমার? ঐত তোমার কোল-পোঁছা ছেলে হাওয়া হয়ে গেল! রক্ষা করতে পারলে?

বিন্দুবাসিনীর চোখে জল এসে গেল। কোলপোঁছা ছেলে বলতে সেই ছোট ছেলেটি। সেই পরামাণিককে সঙ্গে নিয়ে স্বামীর খোঁজে বেরিয়ে বদ্রিনারায়ণের পথে তাঁর দেখা পেয়ে আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে এসে যথা সময়ে যে ছেলেটিকে কোলে পেয়েছিলেন, সেই ছেলে। তা সে ছেলেও নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তখনকার দিনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার ফল কাগজে ছাপিয়ে বড় বড় কাঠের বোর্ডে লাগিয়ে সিনেট হলে টাঙ্গিয়ে দিত। দিনের পর দিন তা অবিকৃত অবস্থায় দেওয়ালে টাঙ্গান থাকত। দিনের আলোতে বা রাতের অন্ধকারে তা বিকৃতও হোত না, অদৃশ্যও হোত না। তা সেই পরীক্ষার ফল জানতে গিয়ে সেই ছেলে আর ফিরে এলো না। সে ফেল করেছিল, তাই। কয়েক দিন অনেক খোঁজাখুঁজি, প্রচুর চোখের জলের পরে বিন্দুবাসিনী বলেছিল: ওর দেহে যে সন্ন্যাসীর রক্ত! ও ঘরে থাকবে কেন?

দুষ্ট লোকে অন্য কথা বলেছিল। কিন্তু তা অপ্রাসঙ্গিক। খবর পেয়ে সেই পরামাণিক কাজকর্ম ফেলে কোন দূর দেশ থেকে ছুটে এসেছিল। সেও খুঁজতে কোন জায়গা বাকি রাখেনি। থানা-

পুলীশ-হাসপাতাল-রেলস্টেশন সব খুঁজেছে। হাওড়া যাবার জন্য ভাগীরথীর ওপরে সেই ভাসমান ব্রিজটা—যাকে লোকে বলত পণ্টুন-ব্রিজ, সেটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। খুলে দিলে গঙ্গা দিয়ে জাহাজ যাতায়াত করত আবার লাগিয়ে দিলে তার ওপর দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া যাতায়াত করত। বড় বড় দোতলা বাসগুলোও তার ওপর দিয়ে হেলেদুলে এপার-ওপার করত। ব্রিজের ওপরে যে ফাঁকগুলো থাকত, তা আবার কচুরিপানা দিয়ে ভর্তি করে দিত। তা এতসব খোঁজাখুঁজি করেও সে ছেলেকে পাওয়া যায়নি। শেষকালে বিন্দুবাসিনীকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সেই পরামাণিক তাঁকে বলেছিল: দেখে নেবেন, ও আসবে। যেদিন হয় ও না এসে পারবে না। ওর সঙ্গে যে আমারও যোগাযোগ রয়েছে। বদ্রিনারায়ণের বাবার কাছ থেকে আপনার জন্য ওকে চেয়ে এনেছিলাম।

বিন্দুবাসিনী চোখের জল মুছে তাড়াতাড়ি বলেছিলেন: সেসব কথা থাক।

তা সে ছেলে এসেছিল। অনেকদিন পরে। এসে সকলকে অবাক করে দিয়েছিল। সন্ন্যাস-রক্তের প্রভাব কিনা কে জানে, সে আবার গৃহত্যাগ করেছিল। কিন্তু গৃহত্যাগ করেছিল বলে সংসার ত্যাগ করেনি। বোধহয় অন্য কিছুর প্রভাব। সে বিদেশে স্ত্রী পেয়েছিল সন্তান পেয়েছিল, আরও বুঝি কত কী সব পেয়েছিল। সেসব অনেক কথা। সব কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল, তা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

*　　*　　*

ছেলের ওপরে ভরসা করে থাকলে বোমার হাত থেকে পরিত্রাণের পথ নেই—একথা বিন্দুবাসিনী বুঝে নিলেন। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা তিনি বড় দুলালের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন। দুলালচন্দ্রের

বৈঠকখানা তখন বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে। হরিপদবাবু বলেছিল, কলকাতায় বোমা পড়বে, কলকাতা ছাড়তে হবে। তাঁর কথা সত্যি হয়েছে। সেই আনন্দে তিনি মত্ত। তিনি বললেন: আমার কথা সত্যি হোল কিনা? গঙ্গা দিয়ে হাজারে হাজারে মড়া ভেসে চলেছে কিনা? কাল কত হাজার মরেছে জানেন?

মৃতদেহ কেউ গণনা করেনি। সুতরাং কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সকলে চুপ করে থাকল। ঘোষবাবু বললেন: তা ইলিশ মাছগুলো কবে পাব?

হরিপদ: আর ইলিশ মাছ খেয়ে কাজ নেই। এবার ইলিশ মাছের বদলে হাজারে হাজারে কুমির এসে পড়বে মড়া খাবার জন্য। ভাল চানতো পালান।

এই কথা বলে তিনি চলে যাচ্ছিলেন। আবার ফিরে এসে বললেন: এখনও কিছুই হয়নি। অনেক বাকি। রেঙ্গুনের খবর পেয়েছেন?

রেঙ্গুনের কত খবর আছে। হরিপদর বক্তব্য কোনটা, তা জানা না থাকায় সকলেই বলল যে, তারা শোনেনি। হরিপদ তখন রেঙ্গুনের বোমাবর্ষণের বৃত্তান্ত জানাল। জাপানী বোমারু বিমান যখন রেঙ্গুনের আকাশে দিনেরবেলা ঘুরে বেড়াতে লাগল, তখন হাজার হাজার রেঙ্গুনবাসী পথে বেরিয়ে পড়ল। তারা ভেবেছিল, তাদের শত্রু ইংরেজ। জাপান তাদের বন্ধু। সুতরাং জাপান তাদের প্রতি নৃশংসতা করবে না। কিন্তু সেদিন দিনের আলোতে জাপানী বোমাবর্ষণে রেঙ্গুনের রাস্তায় রাস্তায় কেবল মৃতদেহের স্তূপ।

যাবার সময়ে হরিপদবাবু বললেন: যুদ্ধের সময়ে ওসব খাতির-টাতির নেই। তাই বলছিলাম, পালান। যে যেদিকে পারেন, পালান।

হরিপদ চলে যাবার পরে বরুণবাবু কানের পেছনে হাত রেখে বললেন: বোমা না হাতী। টেলীগ্রাফ আফিসের কাছে কয়েকটা পটকা পড়েছে।

দুলালবাবু বললেন: কয়েকটা পটকা এই সময়ে জোগাড় করে রেখে দাও। কালীপুজোর সময়ে ছেলেপুলেগুলো খেলা করবে।

ঘোষবাবু বললেন: উনি আর কোথায় যাবেন ছেলেপুলে খুঁজতে?

বরুণবাবু তখন কানের কাছ থেকে হাত নামিয়ে ফেলেছেন। কথাটা না শোনার ভান করে বললেন: আমাদের আফিসটা শুনছি, কলকাতার বাইরে চলে যাবে।—এই কথা বলে তিনিও উঠে পড়লেন।

*   *   *

ঘরটা ফাঁকা হতেই আবার কোন উপসর্গ এসে পড়বার আগেই বিন্দুবাসিনী চলে এলেন। দুলাল জিজ্ঞাসা করলেন: মাসীমা কিছু বলবেন?

বিন্দু একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন: কি আর বলব বাবা, বড় দুলাল? এখন কী করি বল্? কোথায় যাই?

দুলালচন্দ্র বললেন: কোথায় আবার যাবেন? ঘরে বসে দুর্গানাম করুন।

দুর্গানামের মাহাত্ম্য যতই নির্ভরযোগ্য হোক, এখন তার ওপরে ভরসা করে বসে থাকা সম্ভব নয়। তিনি বললেন: তাতো করবই, বাবা। কিন্তু পেটের শত্রুকে নিয়ে কী করি?

ভাবখানা এই যে, উদ্বেগটা শুধু নিজের জন্য হলে, মা দুর্গার ওপরে না হয় ভরসা করা যেত কিন্তু মেয়ে জড়িত থাকায় তা সম্ভব নয়। হঠাৎ দুলালচন্দ্রকে বিচলিত করবার পক্ষে একটা প্রসঙ্গ তাঁর মনে হোল। তিনি বললেন: আমাদের যা হয় হবে, তার জন্য ভাবি না। কিন্তু বড় বৌমার কথাতো না ভেবে পারি না। তারত রাশিচক্র নিয়ে গোলমাল।

তিনি ভাবলেন, অব্যর্থ-অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। বড় দুলালের সদর ঘাঁটিতে একবার নাড়া দিতে পারলে, তার নিজের পরিস্থিতিটা

অনুকূল হয়ে আসবে। বড় দুলালের আদর্শ অনুসরণ করতে ছোট দুলালকে বাধ্য করা যাবে।

অনেকদিন আগে দুলালচন্দ্রের সঙ্গে প্রসন্নবালার বিয়ে হয়েছিল। তখন নাকি প্রসন্নবালা নাবালিকা ছিলেন। দুলালচন্দ্র সেই সময়কার প্রসন্নবালার না-না বালিকা-সুলভ আচরণের কথা উল্লেখ করে মাঝে মাঝেই হাস্যরসের সৃষ্টি করতেন। তা সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাঁরা বড় একটা ছাড়াছাড়ি হননি। রাশিচক্রের বিরূপতা যতই থাক্ এবং তারজন্য যতই সাবধানতার প্রয়োজন থাক্, বিচ্ছেদের মূল্য দিয়ে সেই নিরাপত্তা সংগ্রহে তিনি রাজি ছিলেন না। তিনি চুপ করে গড়গড়ার নল টানতে থাকেন।

বিন্দুবাসিনী দেখলেন, সোজাসুজি কথা বলাই ভাল। তিনি বললেন, সোমত্ত মেয়ে থাকলেই নাকি ভাবনার কথা বেশী।— তারপরেই বর্মা দেশের এক শোনা-কাহিনী তিনি বললেন। ওখানকার স্থানীয় একটি গৃহস্থ মেয়ে সৌন্দর্য-প্রতিযোগীতায় শ্রেষ্ঠা হয়েছিল। জাপানী সৈন্যরা তাকে ধরে নিয়ে যায়। কয়দিন পরে তার নাকি মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। এই কথা বলেই প্রায় কেঁদে ফেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: আমার কি হবে বাবা, বড় দুলাল? ভাবখানা এই, যেন ঘরের বাইরে জাপানী সৈন্যরা তাঁর মেয়েকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

দুলাল বললেন: তা হৈমকে নিয়ে কোথায় যেতে চান? নন্দ রাজি হবে তো?

: ছোট দুলাল বলেছে, আমার সঙ্গে তো টাকার সম্পর্ক, তা আমি দেব। আরও কত কী বলল, তা তোকে আর কী বলব বাবা?

দুলালচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন: তা আপনি কোথায় যেতে চান?

: অরুরা তো রেঙ্গুন থেকে চলে এসেছে। ওরা বর্ধমানে আছে। ওরাই বারবার করে যাবার জন্য চিঠি লিখছে।

কথাটা সত্যের অপলাপ। অরুরা বারবার যাবার জন্য লেখেনি।

একবারই লিখেছে। তাও বিন্দুবাসিনী বারবার লেখার পরে। দুলাল জিজ্ঞাসা করলেন : অরু কে ?

: ওমা! অরুকে ভুলে গেলি বাবা? অরুন্ধতীর কথা তোর মনে নেই! তোর সেই বিন্তীমাসীর মেয়ে। আমিই তো ওদের বিয়ে দিয়েছিলাম। তারপরে জামাই পেগুতে গিয়ে বেশ ভাল অবস্থা করেছিল। মস্ত বড় ব্যবসা—সে বিরাট ব্যাপার। তা মিথ্যে বলব না, ওরা আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে।

: সেখানেই চলে যান তাহলে!

: তোকে জিজ্ঞাসা না করে আমি তো কিছু করতে পারি না! তাই বলছিলাম, প্রিয় যদি আমাদের রেখে আসে ?

: প্রিয় তো আপনাকেও খুব মান্যগণ্য করে। আপনিই বলুন না ?

: তোকে জিজ্ঞাসা না করে কি আমি বলতে পারি ?

প্রিয়নাথ বিন্দুবাসিনীকে মান্যগণ্য করে ঠিকই। কিন্তু সেই মানা এবং গণনার মূল খুঁজতে গিয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েন। সূত্রটা ঠিক ধরতে পারেন না। মাঝে মাঝে মনে হয়, রানী বৌমাকে দিয়ে বলাতে পারলে কাজটা পাকা হয়। কিন্তু সে আশা দুরাশা। তিনি নিজের মেয়েটার ওপরে কোন ভরসাই করতে পারবেন না। সেও তো পারে, প্রিয়নাথকে বলে কয়ে ঠিকঠাক করতে! কিন্তু মেয়েটির কোন কাজের বুদ্ধি যদি থাকে!

* * *

গ্রেহাম সাহেবের কাছ থেকে প্রিয়নাথ যখন বেরিয়ে এলো, তখন সন্ধ্যা সাতটা বাজে। আফিসে লোকজন নেই। শুধু এ. আর. পি সেকশনে খুব ব্যস্ততা। সদ্য বোমা পড়েছে। তাই ব্যস্তভা আর সাবধানতার শেষ নেই। সেকশনটা নতুন খুলেছে। তার নাম এয়ার রেড প্রটেকসন সেকশন। বোমা পড়লে তারা নাকি রক্ষা করবে। তারাই সারা কলকাতাকে অন্ধকার করে দিয়েছে। রাস্তার

আলোগুলোতে টুপি পরিয়ে দিয়েছে, যাতে ওপর থেকে দেখা না যায়। বোমারু বিমান ওপর দিয়েই আসে তো! নির্দেশ দিয়েছে, সব বাড়ির মধ্যের আলোগুলোতে নিজ-নিজ খরচায় টুপি পরিয়ে দিতে হবে। সাইরেণ বেজে উঠলেই এ. আর. পির লোকেরা সব রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। কোন বাড়ি থেকে একটু আলোর চিহ্ন বেরিয়ে এলেই ঝামেলার শেষ নেই। মোটর গাড়ি বাস লরী কিছুতেই হেড-লাইট জ্বালাবার হুকুম নেই। ছোট ছোট আলো জ্বেলে যাবে। তারও ওপরের দিকটা কালো রং দিয়ে ঢাকা। ঘোমটা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শত্রুকে বিভ্রান্ত করার এত চেষ্টা করেও কিন্তু প্রতিরোধ করা গেল না। বোমা পড়লই। জ্যোৎস্না রাত্রে এসে লক্ষ্য ভেদ করে গেল। শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণ রোধ করা যায় না। তাই মজবুত সব দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। বোমা কাছাকাছি পড়লেও তার প্রাণঘাতি টুকরো এসে সর্বনাশ না করে। তেমনি সব দেওয়ালে কলকাতা ভরে গিয়েছে। তার নাম ব্যাফল ওয়াল। ঐ সব ব্যাফল ওয়াল তৈরি করে বোমার আক্রমণ প্রতিরোধ করলেও, তার আড়ালে-আড়ালে অন্যান্য সর্বনাশ এসে বাসা বাঁধল। ঐসব ওয়ালের মধ্যে আরও বেশী অন্ধকার। সেই সব গভীর অন্ধকারের মধ্যে-মধ্যে গড়ে উঠল নতুন বিচিত্র জগৎ। সে জগতের নিয়ম-কানুন আচার-অনুষ্ঠান সবই সৃষ্টিছাড়া। তখন দেশ-দেশান্তরের গ্রাম-গঞ্জ থেকে চলে এসেছে মন্বন্তরের মিছিল। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। ঐসব ব্যাফল ওয়ালের পেছনে পেছনে অন্ধকার জগতে বুবুক্ষা নিবারণের নতুন পথ আবিস্কৃত হয়েছে। সেই নতুন পথে চরম মূল্য দিয়েও দুর্ভিক্ষের প্রেতাত্মার খিদে কিন্তু মেটেনি। পেটের খিদে পেটেই থাকল। মাঝখান থেকে খোয়া গেল কৃপণের সম্বল। ব্ল্যাক-আউটের নিকশ কালো অন্ধকার নির্মম হাতে সেই অন্তিম সম্বল ছিনিয়ে নিল।

সেই কতকাল আগে ভারত—যুদ্ধের আরম্ভে যুদ্ধের ভয়াবহ

পরিণামের কথা বলতে গিয়ে অর্জুন বর্ণসংকরের কথা বলেছিলেন। তারপরে হাজার হাজার বছর পার হয়েছে। সব দিকে কত পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু অর্জুন-কথিত সেই ভয়ানক পরিণামের কথা যেমন ছিল, তেমনই আছে। শুধু একটু রূপ-বদল হয়েছে। পেটের খিদেয় কুলস্ত্রীরা পথে বেরিয়ে এসেছে। তারা কলুষিতা হয়েছে। সেইসব মেয়েদের চোখের জলের পিছল পথে বর্ণসংকরের মিছিল একদিন হয়ত জনারণ্যে মিশে যাবে। যুগে যুগে হয়ে এসেছে। পরশুরাম বারবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেছেন। তবুও এক কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ধ্বংশ হবার জন্য অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য-সমাবেশ হয়েছিল। তার সবই প্রায় ক্ষত্রিয়।

ট্রাম থেকে নেমে প্রিয়নাথ এইসব ভাবতে ভাবতে অন্ধকারের মধ্য দিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ আরও অন্ধকারের মধ্য থেকে কে ডেকে উঠল—প্রিয়দা।

প্রিয়নাথ চমকে উঠে তাকিয়ে দেখে, সামনেই হৈম। সে অবাক হয়ে গেল। ও কি সেই অভিশপ্ত ব্যাফল ওয়ালের পেছনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলো নাকি? সে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল: তুই এখানে?

: আপনার সঙ্গে দেখা করব বলে এখানে দাঁড়িয়ে আছি।

: আমার সঙ্গে দেখা করবার এমন বিচিত্র স্থান খুঁজে নিয়েছিস কেন?

: আপনার জন্যে এতক্ষণ বাড়িতে অপেক্ষা করে করে চলেই যাচ্ছিলাম। তাই হঠাৎ এই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

প্রিয় খুব বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল: সে জরুরী কথাটা কী, শুনি?

: আপনি আমাদের বর্ধমানে রেখে আসবেন?

: এ কাজের ভার তোমাকে কে দিয়েছে? বর্ধমানে কে কে যাবে?

: মা জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন। যাব আমি আর মা।

ঃ বর্ধমানে কী কাজ পড়ল।

ঃ কাজ কিছু নয়, আত্মরক্ষা। বোমার ভয়।

ঃ বর্ধমানে কে আছে ?

ঃ অরুদিরা সব পেগু থেকে চলে এসেছে। অরুদি, জামাইবাবু, সতী—সব। ওঁরাই যেতে লিখেছেন। ঐ সতী না ?

সতী সম্বন্ধে কিছু বিস্ময়কর কথা হয়ত হৈমর বলবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সারাদিনের ঝামেলায় সেসব লোভনীয় কথা শোনার মত মানসিক অবস্থা প্রিয়নাথের নয়। তাছাড়া রাস্তার অন্ধকারে ব্যাফল ওয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে একটি যুবতী মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে প্রিয়নাথের সহস্র দ্বিধা। হৈমর সঙ্গে তার সম্বন্ধের কথা সে জানে। কিন্তু রাস্তার লোকের জানবার কথা নয়। বোমার ভয়ে কলকাতা জনবিরল হয়ে এসেছে। তবুও অত রাত্রেও রাস্তায় লোক চলাচল করছে। যাতায়াতে তারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে এক নজর তাদের দেখে যাচ্ছে—তা প্রিয় লক্ষ্য করেছে। যাবার জন্য পা বাড়িয়ে প্রিয় বলল ঃ তা আনন্দকে বল্-না ?

হৈম দুই চোখ কপালে তুলে বেশ উদ্দীপনা নিয়ে বলল ঃ ওমা ! তা জানেন-না বুঝি ? বাড়িতে দেখুন গিয়ে, কী কাণ্ড। বড়দা রেগে আগুন, বড় বৌদির চোখে জল।

এ আবার কী-যন্ত্রণার কথা ? প্রিয়নাথ ফিরে দাঁড়াল। হৈম একেবারে কাছে সরে এসে গোপনীয় কথা বলার মত বলল ঃ সেদিন তো আনন্দর জন্য মেয়ে দেখে এলেন। সে বিয়ে তো একরকম ঠিক। কিন্তু এদিকে আনন্দ একেবারে বেঁকে বসেছে। এ বিয়ে ঠিক করলে নাকি সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। একেবারে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

পুরাণ-ইতিহাসে হৈমবতীর অনুরাগ দেখে প্রিয়নাথ মনে মনে হাসল। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিল ঠিকই এবং তা ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। কিন্তু তার প্রকৃতিটা একটু ভিন্ন ছিল। সে প্রবল উৎসাহে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। আনন্দ বিয়ে করতে রাজি

হয় নি—এতে তার অন্তরে যেন একটা আনন্দের বন্যা। কিন্তু প্রিয়র মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল: রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেসব কথা কী বলব? আমি ভেবে দেখি।

এই কথা বলে হনহন করে এগিয়ে চলল। এগিয়ে যাবার সময় ব্যাফল ওয়ালের পেছনটা এক নজর না দেখে পারল না। কিন্তু হৈমর প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য একবার ফিরেও দেখল না।

বাড়িতে পা দিতেই প্রসন্নবালা ডাকলেন। হৈম ঠিক কথাই বলেছে। বড় বৌদির চোখ দুটিতে জলের চিহ্ন। তিনি বললেন: তোর এত দেরী হোল কেন রে? এদিকে আণ্টুর খবর জানিস?

: এইমাত্র শুনলাম।

: কার কাছে শুনলি?

: হৈম বলল।

: তার সঙ্গে কোথায় দেখা হোল? মাসীমা তাকে নিয়ে তো সেই কোন সন্ধ্যাবেলা চলে গেলেন!

: তা জানি না। এই তো বাড়ির সামনে তার সঙ্গে দেখা।

প্রসন্নবালার মুখে উদ্বেগের ছায়া ফুটে উঠল। তিনি বললেন: সোমত্ত মেয়ে; কোথায় থাকে, কী করে! একটা ছেলে বৌ-পাগল, অন্যটি দেশান্তরী হয়ে গেল। মেয়ের এই ছিরি—মাসীমার যন্ত্রণার শেষ নেই। সে সব থাক। আণ্টু তোকে কিছু বলেছে? ভদ্রলোকদের কথা দেওয়া হয়েছে; এখন এইসব গণ্ডগোল।

প্রিয় বলল: আপনি কিছু ভাববেন না, বড় বৌদি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রসন্নবালার মুখে যেন হাসির রেখা ফুটে উঠল। একটা নির্ভরতার ভাব। তিনি বললেন: তোর কথাই শোনে। দ্যাখ দাদা চেষ্টা করে।

প্রিয়নাথ সরে আসতেই দুলালচন্দ্র দেখতে পেয়ে ডাকলেন। দুলালচন্দ্রের মুখে সর্বদাই হাসির রেখা। কোন বিরূপ পরিস্থিতি

তাকে সহসা বিচলিত করতে পারে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : তোর এত দেরী হল কেন রে ?

প্রিয় বলল : বড়ই গোলমাল। অফিসের পুলিশ ভেরিফিকেশনে সেই অনিলের কথা বেরিয়ে পড়েছে।

দুলালচন্দ্রের মুখখানাতে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন : কতদিন আগেকার কথা! এতদিন পরে তাই নিয়ে টানাটানি? ঠিক আছে। চিন্তার কিছু নেই। আমি কাল অনাথ বন্ধুর কাছে যাব।

প্রিয়নাথ জানে, অনাথবাবু পুলিশের বড়কর্তা, প্রিয়দের আত্মীয়, দেশের লোক। মণি এবং অনিলের ঘটনা যখন ঘটে, তখন মণিদের বাড়িতে পুলিশের নির্যাতন হয়েছিল কিন্তু প্রিয়নাথরা রক্ষা পেয়েছিল। সে ঐ অনাথবাবুর দয়ায়। এখন অনাথবাবু আরও বড় হয়েছেন। তাঁর ক্ষমতা প্রভাব-প্রতিপত্তি আরও বেড়েছে। লোকে বলে, অনাথবাবুরা দেশের শত্রু। যেসব ছেলেরা দেশের কাজে জীবন দিতে এগিয়ে যায়, ঐ অনাথবাবুরা তাদের ধরে ধরে ফাঁসি দেয়। তা অনাথবাবুরা কি চাকরি করতে নিয়ে মনিবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? না-কি অনাথবাবুরা চাকরি ছেড়ে দিলে দেশটা স্বাধীন হয়ে যাবে? আর চাকরি ছাড়া কি এত সহজ? সে সুভাষবাবু পেরেছেন। তা বলে কি সকলেই পারে? তার ক্ষেত্রে অনাথবাবু কতটা কী করতে পারবেন, কে জানে! এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। মিলিটারী সাহেবদের ব্যাপার। তারা কি অনাথবাবুর কথা শুনবে? গ্রেহাম সাহেবের সান্ত্বনার কথা কিছু নয়। পুলিশের লোকেরা নিজেদের কাজ হাসিলের জন্য অমন মিষ্টিমিষ্টি কথা বলে। ওরা মধুর মধুর হেসে হাত দুখানা ধরে আদর করে ফাঁসির মঞ্চে তুলে দিতে পারে। তা তাদের দোষ কী? তাদের কাজই তো এই। যার নিমক খায়, তার গুণ গায়। এতসব সহস্র ঝামেলার মধ্যে ঐ মেয়েটা অন্ধকারের পেট চিরে বেরিয়ে এসে বলে, বর্ধমান নিয়ে

যেতে হবে। আর বর্মা থেকে আসা কোন একটা মেয়ে সতীর কথা বলে। বোধহয় লোভ দেখাতে চায়। নিজের মধ্যে আমার জন্য প্রলোভন বুঝি শেষ হয়ে গেছে বলে মনে করে। তাই সতীর কথা। কিন্তু সতী সুখে থাক, শান্তিতে থাক। তার লোভে আর বর্ধমান ছুটে গিয়ে কাজ নেই। কিন্তু কাজ নেই বললেই, সব শেষ হয়ে যায় না।

* * *

বর্ধমান ষ্টেশনের বাইরে এসে প্রিয়নাথ ঘোড়ার গাড়ির ছাদে জিনিষপত্র তুলে দিয়ে নিজে ভেতরে বসতে গিয়ে দেখে, বিন্দুবাসিনী আর হৈম সামনা-সামনি দুটি আসনে বসে আছে। এক-একটি আসনে দুজনের বসবার জায়গা। বিন্দুবাসিনী তাঁর পাশের জায়গাটিতে একটি পোঁটলা বসিয়ে রেখেছেন। প্রিয়নাথের বসতে হলে হৈমর পাশে বসতে হয়। সে পা-দানিতে পা দিয়ে একটু ইতস্তত করে বলল: পোঁটলাটা ওদিকে রাখুন মাসীমা। আমি ওখানে বসি।

বিন্দুবাসিনী তাড়াতাড়ি বললেন: নারে বাবা! ওর মধ্যে সব ঠুনকো জিনিষ রয়েছে। যত্ন করে আলগোছে ধরে রাখতে হবে। তা না হলে সব ভেঙ্গে যাবে।

বালীগঞ্জের নন্দদুলালের বাসা থেকে একেবারে বর্ধমান ষ্টেশন পর্যন্ত মাসীমা পোঁটলার ভঙ্গুরতা বিষয়ে এতটা সচেতন ছিলেন না। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে এসে বিন্দুবাসিনী পোঁটলা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। প্রিয়নাথ বুঝতে পারল, পোঁটলার বিষয়ে হাজার নিরাপত্তা বিধান করলেও উদ্বেগ দূর হবার নয়। সেই বাড়িঅলার ছেলে যে কথা বলেছিল, সেই পথে এগিয়ে যাবার সোপান তৈরির শেষ চেষ্টা! এরপরে দুইজনের মধ্যে দূরত্ব এসে যাবে। তার আগে যদি কিছু করা যায়।

নিরুপায় হয়ে সে হৈমর পাশে তার জন্য নির্ধারিত স্থানটির দিকে

তাকাল। দুজনের বসবার জায়গা হলেও হৈম বসার পরে যে স্থানটি অবশিষ্ট আছে তা প্রিয়নাথের পক্ষে যথেষ্ট নয়। হৈম অবশ্য গা নাড়াচাড়া দিয়ে নিজের জায়গাটা কমিয়ে নেবার চেষ্টা করল। সে চেষ্টার মধ্যে কোন কপটতাও ছিল না। হৈমর সকল আন্তরিকতা সত্ত্বেও প্রিয়নাথের বসবার জায়গায় বিশেষ কিছু হ্রাসবৃদ্ধি হোল না। হতে পারে না। যে দুজনের দেহের পরিমাপ অনুমান করে আসনখানি তৈরি হয়েছিল, হৈমবতী সে দলের নয়। কিন্তু জায়গার স্বল্পতা নিয়ে অনুযোগ জানাবে কার কাছে? সে নির্দিষ্ট আসনে বসে পড়ল। হৈমর তুলতুলে দেহটার সঙ্গে প্রিয়নাথের শরীরটা একেবারে মিশে গেল। কিন্তু এত ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও প্রিয়নাথ কোন ভাবান্তর অনুভব করেনি। হৈমবতীর কথা আমরা জানি না। তবে প্রিয়নাথের হঠাৎ গঙ্গাজলের শিশির কথা মনে পড়ে হাসি পেল। বাড়িঅলার ছেলের কথামত বিন্দুবাসিনী মেয়েকে প্রিয়নাথের হাতে দিতে চান। কিন্তু এ যে একেবারে পাতে এসে পড়ল। রূপকথার সেই পিঠের গল্প। হাতে-হাতে দাও, পাতে-পাতে খাই। খাওয়া সহজ। গুরুপাক হলে, পরিপাক করা কঠিন।

গাড়োয়ান এসে গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করল। প্রিয়নাথ প্রশ্নটা চিঠির ঠিকানা কেটে রিডাইরেক্ট করার মত মাসীর দিকে এগিয়ে দিল। বিন্দুবাসিনী বললেন: ঐ তো অরুদের বাড়ি।—গাড়োয়ান অরুকে চিনতে পারল না বলে তিনি তার পুরো নাম বললেন—অরুন্ধতী।

এমন অসম্ভব কাণ্ডও সংসারে ঘটে—গাড়োয়ান সেই অরুন্ধতীকেও চেনে না। মাসী বললেন: জামাই-এর নাম সত্যনারায়ণ চৌধুরী।—প্রিয়নাথ ভয়ে ভয়ে গাড়োয়ানের মুখের দিকে তাকাল, দৈবাৎ যদি সে সত্যনারায়ণ চৌধুরীকে চিনতে পারে। কিন্তু গাড়োয়ানের নির্লিপ্ত নিরাসক্ত মুখখানাতে কোন ভাবান্তর না

দেখে বুঝতে পারল, সে বিন্দুবাসিনীর জামাতা বাবাজিকে চেনে না। সে বলল ঃ কোন জায়গা, কোন পাড়া, সেটা অন্তত বলুন।

মাসীমা এমন অসম্ভব ব্যাপার দেখে আকাশ থেকে পড়লেন। আর গন্তব্য স্থানটাকে আরও পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য বললেন ঃ ঐ ত হিমুদের পাশের বাড়ি।

এতক্ষণে প্রিয়নাথ শঙ্কিত হয়ে ভাবল, বোধহয় ফেরৎ গাড়ি ধরে সেই কলকাতাতেই ফিরে যেতে হবে। সে আর বিরক্তি গোপন করতে না পেরে বলল ঃ এবার তাহলে কলকাতায় ফিরে চলুন। কোথায় যাবেন, তাইতো জানেন না।

তখন বিন্দুবাসিনীও শঙ্কিত হয়ে বলতে লাগলেন ঃ ওমা, তা জানব না কেন ? ঐ তো বললাম, অরুদের বাড়ি। এমনি গিয়ে একটু বাঁদিকে গেলে একটা কালী বাড়ি। সেখান দিয়ে একটু এগিয়ে গেলে, একটি পুকুর। সেই পুকুরের ধারধার দিয়ে গেলেই সেই হিমুদের বাড়ি। হিমুদের বাড়ির কাছে দাঁড়ালেই অরুদের বাড়ি দেখা যায়।—এই কথা বলে বিন্দুবাসিনী তাঁর শাঁখাওয়ালা ডান হাত বাঁ হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অরুদের বাড়িটা একেবারে চোখের সামনে দেখিয়ে দিলেন।

এর মধ্যে কালো কোট পরা এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কোথায় যাবেন ?

প্রিয়নাথ বিব্রত হোল। কোথায় যাবে, তাইতো জানে না। সে তাকিয়ে দেখল, কালো কোট পরা ভদ্রলোক নিবিষ্ট মনে হৈমবতীকে দেখছেন। তাঁর বয়স হয়েছে। মাথায় বিরল কাঁচা পাকা চুল, পরনে ময়লা সাদা ট্রাউজার, গায়ে কালো কোট। তার সঙ্গে গলার কাছ থেকে কালো রং-এর দড়ির মত কী একটা ঝুলছে। বোধহয় কোন কালে 'টাই' নামক পাশ্চাত্য পোষাকের গৌরব ছিল। কিন্তু বর্তমানে সে গৌরবের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। প্রিয় বলল ঃ সত্যনারায়ণ চৌধুরী নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে যাব। কিন্তু

তার ঠিকানাপত্র কিছুই জানি না। তিনি স্থানীয় লোকও নন। সদ্য বর্মা থেকে এসেছেন।

কালো কোট পরা ভদ্রলোকের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বললেন : তাঁর একটি বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে বোধহয় ?

হৈম তাড়াতাড়ি বলে উঠল : তার নাম সতা।

ভদ্রলোক বললেন : সতী-অসতী জানি না। আমিও বর্মা থেকে এসেছি কিনা।

বিবাহযোগ্যা কন্যাদের অসামান্য প্রভাবের কথা চিন্তা করে প্রিয়নাথ হতবাক হয়ে গেল। হৈমবতী একজন বিবাহযোগ্যা কন্যা। সে ভদ্রলোককে কাছে টেনে নিয়ে এলো। অন্য এক বিবাহযেগ্যো কন্যা সতী, অকুলে কুল মিলিয়ে দিল। তা সে কন্যারা সমাজের মধ্যে যতই উৎকণ্ঠার কারণ হোক, তাদের ঋণ প্রিয়নাথ জীবনে শোধ করতে পারবে না। তবে সেই অজ্ঞাত এবং জ্ঞাত কন্যারা প্রিয়নাথের জন্য আরও কী কী কর্মসূচী স্থির করে রেখেছে, তা সে জানে না। জানবার দরকারও নেই। যখনকার যা, তখনকার তা।

সেই ভদ্রলোক বললেন : সে জায়গাটা বড়ই নির্জন। আপনারাও নতুন লোক। দিনকাল ভাল নয়। চলুন আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই।

আবার অবিবাহিতা কন্যার প্রভাব অনুমান করে প্রিয়নাথ বলল : তুমি ওদিকে গিয়ে বোস। ভদ্রলোককে এখানে বসতে দাও।

তিনি প্রিয়নাথকে অবাক করে দিয়ে ভিতরে না এসে গাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ডাকাডাকিতেও ভদ্রলোক এলেন না। তাঁর নির্দেশে গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। বিন্দুবাসিনী বললেন : আমি তো আগেই বলেছি বাবা প্রিয়নাথ, আমাদের জামাই-এর খুব নাম-ডাক। সকলেই জানে-শোনে। কোন অসুবিধে হবে না।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক গাড়ি থামিয়ে নিজে নেমে গাড়োয়ানকে বাকি রাস্তার নির্দেশ দিয়ে দিলেন। প্রিয়নাথ নেমে ধন্যবাদ জানাল।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছে গাড়োয়ান জানাল, এ জায়গাটার কথা আগে জানালে সে অনেক সোজা রাস্তায় আসতে পারত। প্রিয়নাথ ভাবল, সোজা রাস্তায় এলে হয়ত ভদ্রলোকের বাড়ির কাছ দিয়ে গাড়িটা আসত না। নিজের বাড়িতে পৌঁছে ভদ্রলোক খারাপ দিনকালের দরুণ, নতুন লোক প্রিয়নাথদের জন্য নির্জন স্থানের বিপদের কথা হয়ত ভুলে গিয়েছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত তিনি আসেননি।

*　　　*　　　*

প্রিয়নাথের মেজদা বৃত্তিতে বৈজ্ঞানিক, পেশায় অধ্যাপক আর বুদ্ধিতে রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মানুষের চরিত্র-বিচার করতে গিয়ে কোন-কোন ক্ষেত্রে বলতেন—নির্লিপ্ত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আরম্ভে অর্জুন যখন যুদ্ধ করব না বলে বেঁকে বসলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ মানুষের কতকগুলো লক্ষণ ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি হোল—দুঃখে উদ্বেগ নেই, সুখে উত্তেজনা নেই, ভয় নেই, আশক্তি নেই। তা সে সব মহাভারতের কালের কথা। প্রিয়নাথ একালেও তেমন একটি পুরুষ দেখতে পেল। তিনি মাসীমা বিন্দুবাসিনীর জামাতা শ্রীসত্যনারায়ণ চৌধুরী।

পেটের শত্রুকে অগ্রবর্তিনী করে আর প্রিয়নাথকে পেছনে নিয়ে তিনি যখন গৃহ-প্রবেশ করলেন তখন জামাতা বাবাজি বসে। লোকগুলো বারান্দায় এসে উঠল, মালপত্র নামাল কিন্তু ভদ্রলোক নির্বিকার। মাসীমা প্রিয়নাথকে বলেছিলেন, জামাই-এর বাড়িতে খুব আপ্যায়ন হবে। অবস্থা বিপরীত দেখে তিনি বিড়ম্বনা বোধ করে বললেন, এই যে বাবা সত্য, আমরা এসেছি।

সত্যনারায়ণ মুখ তুলে তাকালেন। তিনি বোধহয় নস্যি গ্রহণ করেন। কাছেই প্রচলিত আকারের থেকে অনেকটা বড় একটি কৌটো রাখা আছে। তিনি ওপর দিকে তাকাতেই দেখা গেল, তাঁর দুই নাক দিয়ে দুটি ধারা নেমে আসবার চেষ্টা করছে।

তিনি নিঃশ্বাস টেনে টেনে সেই ধারার গতি রোধ করবার চেষ্টা করছেন। সাবধানের মার নেই—সেইকথা মনে রেখেই হয়ত জিভের ডগাটা একটু বের করে রেখেছেন। নিঃশ্বাসের অবরোধ ভেঙ্গে পড়লে, কেবল তখনই জিভের দ্বারা চরম প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা। কিন্তু তার চোখ দুটিতে একেবারে মরা মানুষের দৃষ্টি। কোন কৌতুহল, কোন আহ্বান, কোন বিসর্জনের চিহ্নমাত্র সে দৃষ্টিতে নেই। প্রিয়নাথ ভাবল, এমন পুরুষের কথাই বুঝি তার মেজদা বলেছিলেন। আর এমন চিত্ত না হলে বুঝি বর্মামুলুকে বিরাট বিত্ত সম্ভব নয়।

এমন নিরাসক্ত ব্যবহারে বিন্দুবাসিনীর যখন দিশেহারা অবস্থা, তখন এক ভদ্রমহিলা এসে কলরব করে উঠলেন: ওমা! মাসী, তুমি কখন এলে? এখানে দাঁড়িয়ে কেন?

পেছনে পেছনে একটি তরুণী এসে বলল: বুড়ি, তোমার আক্কেলটা কী? আমরা সারাদিন হাঁ করে বসে, আর উনি এসে এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজনকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে চুপ করল। প্রিয়নাথ না বললেও সকলকে চিনতে পারল। শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ চৌধুরী, শ্রীমতী অরুন্ধতী এবং সেই বিবাহযোগ্যা কন্যা সতী। প্রণামের আদান প্রদান শেষ হোল। সতী প্রিয়নাথকে এক নজর দেখে একটু আরক্ত হয়ে প্রণাম করল। এতক্ষণে সেই নির্লিপ্ত পুরুষের মুখে কথা ফুটল—এদিকে আসুন।

বিন্দুবাসিনী সন্থ নিরাসক্তের বিষাদ পরিত্যাগ করে কিছুটা উত্তেজনা সঞ্চার করেছেন। তার প্রভাবে জামাতা বাবাজির নিমন্ত্রণ শুনতে পান নি। অরুন্ধতী বলল: ওদিকে যাও, মাসী। উনি প্রণাম করবেন।

প্রণাম গ্রহণের জন্য এতখানি ব্যস্ততা সংসারে কেউ কোনদিন দেখেনি। মাসীমা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। জামাতা বাবাজি

হাত দিয়ে নাকের ধারাটি সংযত করে হাতটি বিরল-কেশ মাথায় মুছে, সেই হাতটিই প্রণামের জন্য বাড়িয়ে দিলেন।

সতী চা জলযোগের ব্যবস্থা করতে গেল। তার মা সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। প্রিয় জিজ্ঞাসা করল: আপনাদের আসতে বেশ কষ্ট হয়েছে মনে হয়?

অরু বলল: না ভাই, কষ্ট কিছু হয় নি। আমরা ভাগ্যগুণে প্লেনে জায়গা পেয়েছিলাম।—সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা ম্লান করে বললেন: কিন্তু কালুকে আনতে পারলাম না।

অজ্ঞাত হতভাগ্য কালুর জন্য প্রিয়নাথের মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল! সে জিজ্ঞাসা করল: কেন কালুর কী হোল?

: তাকে আসতে দিল না।

: কে?

: ঐ এরোপ্লেনের লোকেরা।

এরোপ্লেনের লোকদের এই বৈষম্য-মূলক আচরণে প্রিয়নাথ ক্ষুব্ধ হয়ে বলল: মানুষের প্রতি মানুষের এই ব্যবহার ক্ষমা করা যায় না।

অরু তাড়াতাড়ি বলল: কালু মানুষ নয়, ভাই!

প্রিয় বলল: না-হয় অমানুষই হোল; প্লেনে আসতে হলে কি সচ্চরিত্র সার্টিফিকেট দেখাতে হয় নাকি?

অরু বলল: সচ্চরিত্র অসচ্চরিত্রের কথা নয়। কালু মানুষ নয়, ষাঁড়।

শালীনতার কথা ভুলে গিয়ে প্রিয়নাথ হেসে উঠল। অরুন্ধতী বলল: তা ভাই, ষাঁড় হলে কী হবে? স্বভাব-চরিত্র একেবারে মানুষের মত। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকে "মানুষ" করেছি তো! তারপরেই কালুর চরিত্র বর্ণনা করে অরু বলল: জন্মগতভাবে কালু গোজাতীয় হলেও চরিত্র এবং প্রকৃতিতে একেবারে মানুষ। খাদ্য-খাওয়া সবই মানুষের মত। মাছ-মাংসটা তত পছন্দ করে না, কিন্তু ঘি-টি দিয়ে ভাল নিরিমিষ তরকারি করে দাও, পায়েস দাও, পিঠে দাও—

দিব্যি খাবে। একদিন বড় মজা হয়েছিল। বেশ-মিষ্টি-টিষ্টি দিয়ে টমেটোর চাটনী হয়েছে। মেয়ে আমার সরষে ফোড়ন দিতে ভুলে গেছে। আমরা তো কোনও মতে খেয়ে-টেয়ে নিলাম। কিন্তু কালু জিভ দিয়ে চেটেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। কী করব? ষ্টোভ জ্বেলে সরষে ফোড়ন দিই, তবে কালু খেল।

সতী চা নিয়ে উপস্থিত হতেই প্রিয় জিজ্ঞাসা করল: চায়ে সরষে ফোড়ন দিয়েছ তো?—কথাটার মধ্যে একটা অজ্ঞাত রসিকতা অনুমান করে সতীর মুখখানা একটু আরক্ত হয়ে উঠতেই প্রিয়নাথের সে মুখখানা বড় সুন্দর মনে হোল।

* * *

প্রিয়নাথের মনে মনে ইচ্ছে ছিল, মাসীদের জায়গামত পৌঁছে দিয়ে সেই রাত্রেই কলকাতা ফিরে যাবে। বিন্দুবাসিনী তাকে বোধহয় একটু যত্ন-আত্তি করতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রিয়নাথকে রাতটা থাকতে বললেন। সে রাজি হোল না। মেয়েকে দিয়ে বলালেন। তাতে তার ফিরে যাবার ইচ্ছেটা সংকল্পে পরিণত হোল। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পারল না। ছেলেটিকে দেখেই অরুন্ধতীর ভাল লেগেছিল। তিনি মৃদু অনুরোধ করলেন। তাতে প্রিয়নাথ নরম হোল। শেষকালে নরম থেকে একেবারে জল হয়ে গেল। সতী নামে সেই বিবাহযোগ্যা কন্যা সবুজ রং-এর একটি ছাপান বিজ্ঞাপন প্রিয়নাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল: আপনি না নিয়ে গেলে আমার দেখা হবে না। আজকের রাতটা আপনাকে থাকতেই হবে, প্রিয়মামা।

সতীর রূপটি কিছু একটা আহামরি নয়। শ্যামবর্ণা একটি তরুণী। চোখদুটি বড় হলেও টানাটানা নয়। বরং একটু গোল-গালই বলা যায়, তবে ভাসা-ভাসা। মুখখানাও গোলগাল। কপালটাও ছোট নয়। আর শরীরটাও ঢিলেঢালা প্রকৃতির। যৌবনের উগ্রতা নেই। নারীর রূপ বলতে যা বোঝায়, তার কিছুই বড় একটা সতীর অঙ্গে নেই। থাকবার মধ্যে আছে, মাথা থেকে নিতম্ব পর্যন্ত কালো

কোঁকড়ান চুল। মুক্তোর মত সুন্দর দাঁত, মুখে হাসি আর কণ্ঠস্বরে একটা স্নিগ্ধ মাধুর্য।

যার যা সম্বল। সতী তাই নিয়েই মৃদু হেসে বলল : আমি কোন কথা শুনব না। তবে কথা দিচ্ছি প্রিয়মামা, কাল আপনাকে সরষে ফোড়ন দিয়ে চা করে খাওয়াব।

প্রিয়নাথসহ সকলে হেসে উঠল। সেই সঙ্গে সতী এমন মধুর হাসল যে, তারপরে প্রিয়নাথের পক্ষে আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া বিজ্ঞাপনটার মধ্যে প্রিয়নাথেরও আকর্ষণ কম ছিল না। তবুও একবার কাগজখানার দিকে আর একবার সতীর মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখল, কোনটার আকর্ষণ বেশী। ব্যাফল ওয়ালের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে হৈম তাকে সতীর কী কথা বলতে চেয়েছিল, তা প্রিয়নাথ বলতে দেয় নি। হয়ত রূপের কথা বলে তাকে লোভ দেখাতে চেয়েছিল। কিন্তু সতীর তো রূপ নেই। তবুও অপরূপা। তা যত অপরূপাই হোক আর প্রিয়নাথের যত ব্যগ্রতাই থাক, ওর মা অজ্ঞাত অপরিচিত প্রিয়নাথের সঙ্গে তার যুবতী মেয়েকে পাঠাতে রাজী হবে কেন?

তা অরুন্ধতী রাজি হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল, মেয়ের থিয়েটাব দেখাটাই প্রধান। প্রিয়নাথের সান্নিধ্য-কামনায় থিয়েটার দেখার ছলনা নয়। সকাল থেকেই মেয়ে ঐ একটি বিজ্ঞাপন যোগাড় করে ঘ্যান-ঘ্যান আরম্ভ করেছে। মেয়ে বলেছে যে, সেই সুদূর বর্মা থেকে লোকেরা দিলীপ কুমার আব চারুশীলার অভিনয় দেখতে কলকাতায় আসে। সেই দুর্লভ সুযোগ হাতের কাছে এসে পড়েছে। এ সুযোগ সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। সুযোগটা লোভনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সুযোগের কথা চিন্তা করেই অরুন্ধতীর ভয়। হাজার হলেও ঘি আর আগুন নিয়ে কথা। সাবধান না হলে অঘটন ঘটতে কতক্ষণ? অরু প্রথমে বিন্দুবাসিনীকে সঙ্গে যেতে বলেছিল। তিনি রাজী হলেন না। মুখে বললেন, তিনি

বড় ক্লান্ত। কিন্তু প্রকৃত কথা ভিন্ন। তাঁর মেয়ে বলাতে প্রিয় রাতটা থাকতে রাজি হয়নি, কিন্তু সতী বলাতে দিব্যি রাজি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত হৈম সঙ্গে গেল। এই ব্যবস্থাতে সকল পক্ষ প্রসন্ন হোল।

*　　　*　　　*

মাঠের মধ্যে বিরাট প্যাণ্ডেল তৈরী হয়েছে। হাজার হাজার দর্শক অধীর প্রতীক্ষা নিয়ে বসে আছে। একেবারে বাঁদিকে হৈম, তার পরে সতী, তারপরে প্রিয়নাথ নিজে বসে চতুর্থ ব্যক্তির স্পর্শ থেকে দুই নারীর পবিত্রতা রক্ষা করতে লাগল। আস্তে আস্তে যবনিকা উঠল। মঞ্চে নাট্যাচার্যকে দেখা গেল। জাহাঙ্গীরের রূপসজ্জা একটা কালো কাপড়ে ঢেকে তিনি দাঁড়িয়ে। হাজার হাজার করতালি দিয়ে নাট্যাচার্যকে অভিনন্দন জানান হোল। সে যেন আর শেষ হতে চায় না। দর্শকের আকুলতার যেন শেষ নেই। প্রসন্ন হাস্যে নাট্যাচার্য দুই হাত জোড় করে অভিনন্দন গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি বলতে আরম্ভ করলেন: আপনাদের শুভেচ্ছা পেয়ে আমি ধন্য, আমি অভিভূত। কিন্তু ভয়ও আছে। এই ভাঙ্গা দেহমন নিয়ে আমি আপনাদের কতখানি আনন্দ দিতে পারব, তা জানি না। যে উৎসাহ, যে উদ্দীপনা নিয়ে অন্যান্য বৃত্তি ছেড়ে আমি নটজীবন বেছে নিয়েছিলাম, সে উৎসাহ সে উদ্দীপনা আজ আর নেই। তবু সাধ্যমত চেষ্টা করব।

আজকের নাটক—'নূরজাহান'। এটি আমার নির্দিষ্ট নাট্য-তালিকার অন্তর্গত নয়। তবুও এই স্থানটির কথা বিচার করে আমি বিষয় নির্বাচন করেছি। সাড়ে তিনশ বছর আগে এই বর্ধমানে মেহের উন্নিসা নামে একজন রমণী ঘর বেঁধেছিল। তার স্বামী ছিল, সংসার ছিল, একটি কন্যাও ছিল। কিশোরী মেহের উন্নিসার দেহের রূপ একদিন আগ্রায় যুবরাজ সেলিমের অন্তরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সম্রাট আকবর সে-রূপের পিপাসাকে প্রশ্রয় দেননি। শের আফগানের সঙ্গে ঐ কিশোরীর বিয়ে দিয়ে সুদূর

বর্ধমানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সম্রাট আকবর চিরদিন বেঁচে থাকলেন না। সেলিম সম্রাট হয়ে নাম নিলেন 'জাহাঙ্গীর'। তারপর মেহের উন্নিসার স্বামী মরল, সংসার পুড়ল, আরও কিছু হয়েছিল কিনা, জানি না। কিন্তু ভারতেশ্বরী হয়ে সে পেয়েছিল 'নূরজাহান' নাম আর হিন্দুস্থানের সম্রাটের একান্ত আনুগত্য। এ কাহিনী নিয়ে ইতিহাসে বড় গোলমাল। এইসব হারাণ-প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের অন্তরালে মেহের উন্নিসার কোন অবদান ছিল কিনা—তা নিয়ে না-না সন্দেহ। আমি নট। সেসব মতান্তরের কিছু বুঝি না। আমার পক্ষে যদ্দৃষ্টং তৎ কথিতং। যা করেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল। পত্নী-বিয়োগের পরে নারীচরিত্রের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল কিছু একটা অনুভব করেছিলেন। এই নাটকের মধ্যে তাঁর সেই অনুভূতি বোধহয় অনুপ্রবেশ করেছে। নূরজাহান নাটকে তিনি একটি জটিল নারীচরিত্র সৃষ্টি করেছেন। এর রূপায়ণ বড় কঠিন। আপনাদের স্নেহধন্যা চারুশীলা আজ সেই চরিত্রে অভিনয় করবে। রূপে গুণে ক্ষমতায় এবং পূর্বস্বামী শের আফগানের স্মৃতির প্রতি আনুগত্যে এই চরিত্র এক বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু সহজ দাম্পত্য প্রেমের জোয়ারে নূরজাহান ভেসে যায়নি। আবার সেই স্বামীহন্তা জাহাঙ্গীরকে পতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। সমগ্র সাম্রাজ্যের ওপরে অসামান্য প্রভাব আর ক্ষমতা বিস্তার করেছে। কিন্তু গভীর প্রেমের কোন অনুভূতি নেই। এইভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীতে নূরজাহান, একসঙ্গে ক্ষমতা লাভের ব্যগ্রতা আর প্রতিশোধ-কামনা নিয়ে এক অসামান্যা ব্যক্তিত্বময়ী নারীচরিত্র রূপে ফুটে উঠেছে।

"অয়ং আরম্ভং শুভায় ভবতু"

আবার সেই বিলম্বিত করতলধ্বনি। যবনিকা পড়ল আবার উঠল। মঞ্চের ওপরে মেহেরউন্নিসা-রূপিনী চারুশীলা আর শের আফগান-রূপী এক অপরিচিত ভদ্রলোক। সংলাপ আরম্ভ হোল আর সঙ্গে সঙ্গে এক বিচিত্র ব্যাপার। সতী একেবারে প্রিয়নাথের

গায়ের ওপরে হেলে পড়ে ডান হাতখানা বাড়িয়ে প্রিয়নাথকে জড়িয়ে ধরল। এ যেন কিছু একটা ভয় থেকে বাঁচাবার জন্য আশ্রয়ের সন্ধান। প্রিয়নাথ বিব্রত হয়ে পড়ল। সামনে পেছনে হাজার হাজার চক্ষু। হলের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখল, সকলের দৃষ্টি মঞ্চের ওপরে। অন্ধকারের মধ্যে সতীর কাণ্ড কেউ লক্ষ্য করেনি। একমাত্র হৈম হয়ত ব্যতিক্রম হলেও হতে পারে। তার দৃষ্টি কোনদিকে, সেকথা জানেন একমাত্র অন্তর্যামী।

সতীর এই ব্যবহারের নিশ্চয়ই কিছু একটা কারণ আছে। অনুরাগে সিক্ত হয়ে এমন সৃষ্টিছাড়া কাজটি সে করে বসেনি। কিন্তু স্থূল হৈমর অতশত চিন্তার ক্ষমতা নেই, সময়ও নেই। নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি অনুসারে সে কিছু একটা স্থির করবে এবং সে তার সেই সিদ্ধান্ত বর্ধমান থেকে আরম্ভ করে কলকাতা পর্যন্ত প্রচার করবে। প্রিয়নাথ ব্যাকুল হয়ে সতীর কাঁধটা স্পর্শ করতেই তার যেন চৈতন্য ফিরে এলো। ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠার মত সে চোখ দুটি মঞ্চ থেকে সরিয়ে প্রিয়নাথের দিকে তাকাল। তারপরেই মাথাটি নীচু করে বাহুবন্ধন থেকে প্রিয়নাথকে মুক্তি দিয়ে সোজা হয়ে বসল। মুখখানার রং বদল হয়েছিল কিনা তা অন্ধকারে বোঝা গেল না। তারপরে নিজের হাতব্যাগটি খুলে একটা কালো চশমা চোখে লাগিয়ে নিজের মনে বলল—বেশী আলো চোখে বড় লাগে। তারপরে ঠাণ্ডার তীব্রতা না থাকলেও গায়ের চাদরটা টেনে মাথায় ঘোমটার মত করেছিল। মুখে বলল: বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে।—আবার তারা মঞ্চের দিকে নজর দিয়ে অভিনয় দেখতে লাগল।

বিরতির সময়ে যবনিকা পড়লে প্রিয়নাথ বাইরে যাবে মনে করে উঠে এলো। দু-পা এগুতেই এক স্থূলকায় ভদ্রলোক তার সামনে হঠাৎ উপুড় হয়ে তাকে প্রণাম করল। সে একটু চমকে উঠতে না উঠতেই ভদ্রলোক স্যাণ্ডেলের ফাঁক দিয়ে কিছু ধুলো সংগ্রহ করে উঠে দাঁড়ালেন। প্রিয়নাথ দেখে, চৌধুরীবাবু। প্রশ্নের আগেই

চৌধুরী বলতে আরম্ভ করল : আপনি যখন ঢুকলেন, আমি তখনই দেখেছি। মেয়েরা সঙ্গে আছেন বলে আমি কোন কথা বলিনি। কিন্তু অপেক্ষা করে আছি।

প্রিয়নাথ বলল : তা বেশ করেছেন। কিন্তু একটা অনুরোধ, আপনি যখন-তখন প্রণাম করবেন না।

: যখন-তখন তো করিনি। এইতো কতদিন পরে করলাম।

: তাও করবেন না।

: সব নিষেধ কি মান্য করা যায়, প্রিয়দা ? আপনি তো জানেন প্রিয়দা, 'নিমাই সন্ন্যাস' গ্রন্থে বলেছে…

আবার সেই পুরাণ ইতিহাস বেদ বেদান্তের কথা এসে পড়ল দেখে প্রিয়নাথ বিচলিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল : তা আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন কেন ?

: আপনার কথাটা চারুর কানে উঠেছে।

: আমার কথাটা চারুর কানে উঠল কি করে ? বাতাসে নাকি ?

: কী যে বলেন, প্রিয়দা ? বাতাসে উঠবে কেন ? আমিই বলেছি। শুনে সে ঐ নূরজাহানের সাজেই বেরিয়ে আসছিল। আমি ধমকে বসিয়ে দিয়ে বলেছি, আমিই তাঁকে নিয়ে আসব।

: তা হলে নিয়ে যান।

: আপনি না গেলে, কী করে নিয়ে যাব ?

: আমি না গেলে নিয়ে যেতে পারবেন না বুঝি ? তাহলে আপনি যান, আমি যাচ্ছি।

* * *

হৈম এবং সতীকে নিয়ে প্রিয়নাথ থিয়েটার দেখতে বেরিয়ে গেলে বিন্দুবাসিনীর জামাতা সত্যনারায়ণ চৌধুরী নির্লিপ্ততা পরিহার করলেন। স্ত্রী অরুন্ধতীকে শোবার ঘরে ডেকে এনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিছানায় বসে চুপ করে থাকলেন। স্ত্রী বুঝতে পারল,

ঝড়ের আগে স্বামীর পরিচিত নিস্তব্ধতা। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলে যে পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করা যায়, সত্যনারায়ণ শুধু সেই শক্তির ওপরে ভরসা করতে পারলেন না। অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয়ের আশায় তিনি অতিকায় কৌটো থেকে একটু বেশী পরিমাণ নস্যি নিয়ে চক্ষু দুটি বেশ বড় বড় করে দুই নাকে গ্রহণ করলেন। বেশ কাজ হয়েছে মনে হোল। দুটি চক্ষুই বেশ রক্তাভ আর অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তারপর রুমালের অভাবে নিজের পরিধেয় লুঙ্গির প্রান্তভাগ টেনে এনে নাকের নীচেটা পরিষ্কার করলেন। আরক্ত অশ্রুসজল চক্ষে পরীক্ষা করে দেখলেন, লুঙ্গির বিশেষ স্থানটি ভেজা। বেশ যত্ন নিয়ে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে লুঙ্গিটা যথাসম্ভব মালিন্যমুক্ত করে জিজ্ঞাসা করলেন : ও ছোকরা যেতে চেয়েছিল, তা যেতে দিলে না কেন ?

বাড়িতে লোকজন এসেছে। কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে অরুন্ধতী অত্যন্ত বিনয়-নম্রভাবে বলল : ছেলেটা এত কষ্ট করে এলো। একটু আদর যত্ন না করে কী করে ফেরৎ পাঠাই—তুমিই বল না ?

এরপরে কিছুক্ষণ একেবারে চুপচাপ। অরু ভাবল, তার নম্রতায় কাজ হয়েছে। তাই সাহস পেয়ে আবার বলল : তা ও নিয়ে তুমি আর কিছু বলো-টলো না।

সত্যনারায়ণ চোখ বুঁজলেন। তখনও বোধহয় চক্ষুলজ্জাটার কিছু অবশিষ্ট ছিল। সেই নামমাত্র চক্ষুলজ্জার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই তাঁর ঐ সাবধানতা। তারপরে, ধীরে শান্ত গলায় তিনি বললেন : আমার কোন কথা বলার দরকার নেই। শুধু ঐ ছোকরা এলে, কানটা ধরে বার করে দেব।

অরুন্ধতী ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বললেন : সে আবার কী কথা ! তুমি ওর কান ধরতে যাবে কেন ? ওর কী দোষ ?

: ওর দোষ হতে যাবে কেন ? ওর বয়েসটার দোষ।

ঃ বয়সের দোষ হলে বয়সকে কান ধর গিয়ে। ওকে কিছু বোল না।

ঃ তোমাদের শিক্ষা দেবার জন্য ওর কান ধরতে হবে। তোমাদের কোনকালে শিক্ষা হবে না। আবার সেই ভুল? চেনা নেই শোনা নেই, কোথাকার কে এক ছোকরা।—রাতের অন্ধকারে মেয়েটাকে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে? তোমার মনে নেই সেসব কথা?

ঃ তা একজনে দোষ করেছে বলে কি অন্যকে শাস্তি পেতে হবে? মেয়ের রূপ নেই। বিয়ে দিতে পারলাম না। তা মেয়ের একটু সাধ আহ্লাদ থাকবে না।

মেয়ের রূপ না-থাকাটা কার অপরাধ—তা সত্যনারায়ণ ঠিক জানেন না। তাই চুপ করে থাকলেন। কিন্তু রূপ না থাকলে বিয়ে হয় না—একথা তিনি বেশ বুঝেছেন। আবার বেশী রূপ থাকার যন্ত্রণাও তিনি চোখ মেলে দেখেছেন। তিনি হঠাৎ বললেন: বিয়ে না হয় না হবে। কিন্তু রূপ থেকে কাজ নেই।

ঃ রূপ থাকলেও দোষ, না থাকলেও দোষ। তাহলে তারা কী করবে?

ঃ রূপ থাকা না-থাকা মেয়ের ইচ্ছের ওপরে নির্ভর করে না। ওটা বিধাতা ঠিক করে দেয়। তা বিধাতার দয়ায় যা পাওয়া যায়, তা নিয়ে অহঙ্কার কেন?

ঃ তা এ মেয়ের রূপও নেই, অহঙ্কারও নেই। তবে ভয়টা কিসের?

সত্য বললেন: তা মেয়ের অহঙ্কার থাক আর না থাক, আমি ও ছোকরাকে বিদেয় করব।

অরু এবার ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়লেন। তিনি বললেন: আর ও ছোকরা যদি তোমার জামাই হয়?

জোঁকের মাথায় নুন বলে একটা কথা আছে। সত্যনারায়ণের তাই হোল। তিনি বেশ একটা কৌতুহলের দৃষ্টি নিয়ে স্ত্রীর মুখের

দিকে তাকালেন। নিজের মুখখানা অজান্তেই বুঝি একটু প্রসন্ন হয়ে উঠল। ঠোঁটে একটু হাসির রেখাও বুঝি ফুটে উঠেছিল। তিনি অনেকদিন পরে দেহমনে যেন একটু লুপ্ত অনুভূতি ফিরে পেলেন। অনেকদিন আগেকার কথা। তার জন্য অনেক ভাল-মন্দ পাত্রীর প্রস্তাব এসেছিল। অনেক রূপবতী পাত্রীকেও বাতিল করে দিয়ে সত্যনারায়ণ নিজে পছন্দ করে অরুন্ধতীকে বিয়ে করেছিলেন। নতুন বৌ দেখে তাঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলেই পাত্রী নির্বাচনের নিন্দা করেছিল। কোন এক আত্মীয়া মুখের ওপর বলেছিল—এটা তুমি কী করলে সত্য? এ যে একেবারে বস্তির মেয়ের মত দেখতে। সেসব কথা সত্য নীরবে ক্ষমা করেছিল। তারপরে বর্মায় গিয়ে সহায় সম্বলহীন সত্যর সংসারে অরুন্ধতীর সুগৃহিণীপনায় প্রাচুর্য এসেছিল। সত্যনারায়ণ সেদিন আদর করে দুহাতে স্ত্রীর মুখখানা ধরে বলেছিল—আমার রূপহীনা অপরূপা! সেই স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সত্য জিজ্ঞাসা করল : তা ও ছেলেটি কে?

: ও ছেলেটি যেই হোক, তোমার জামাই হবার উপযুক্ত। সৎ ব্রাহ্মণের ছেলে। গোত্রেও আটকাবে না। লেখাপড়া জানে, ভাল চাকরি করে। আর কী চাও?

: এত কথা তুমি এর মধ্যে কী করে সংগ্রহ করলে?

: বিন্দুমাসীর কাছ থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনে নিলাম।—এই কথা বলে বন্ধ দরজাটার দিকে একবার তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল : মাসী সহজে কি বলতে চায়? নিজের মেয়েটি গছাতে চায় বুঝি?

সত্যনারায়ণ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন : তুমিও যেমন? অমন ছেলে তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে কেন? তোমার মেয়ের তো রূপ নেই।

: তোমরা পুরুষ মানুষ ওসব বুঝবে না। সকলেই অমন রূপ চায় না। রূপ ছাড়াও সংসারে কিছু আছে।

: আছে নাকি ?

: আছে কিনা, তা তুমি জান না ?

অধরে হাসির রেখা নিয়ে সত্য বললেন : অহঙ্কারও আছে দেখছি।

: সব অহঙ্কার দোষের নয়। তা আমার একটু অহঙ্কার আছে।

: তা অহঙ্কার না হয় থাকল। কিন্তু প্রতিযোগিতায় মাসীর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে তো ?

অরু বলল : মাসীর মেয়ে তো এক ধুনুচি।

: ধুনুচি নিয়ে তো লোকে নেচে নেচে আরতি করে। সে কাজটাই বা মন্দ কি ?

: দোহাই বাবু, তা আবার করতে যেও না। আমাকে অকুলে ভাসিও না। সম্পর্কটা তো ভাল নয়, শ্যালিকা। লোকে বলতে বলে, গিন্নীর চেয়ে শালী ভাল। পুরুষ মানুষের শুনেছি, বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়।

: আমার ভীমরতিটা বুড়ো বয়সের জন্য অপেক্ষা করেনি। আগেই হয়েছে।

রহস্যটা বুঝতে না পেরে স্বামীর মুখের দিকে তাকাতেই সত্য বলল : ভীমরতি না হলে, এমন ঘেঁটুফুলের মালা কেউ গলায় পরে ?

দরজাটা বন্ধই ছিল, জানা কথা। তবুও সাবধানের মার নেই। তাই সত্য একবার বন্ধ দরজাটা দেখে নিয়ে হাত দুখানা বাড়িয়ে দিলেন। অরুন্ধতীর চোখে-মুখেও একটা আত্মসমর্পণের ভাব ফুটে উঠেছিল। কিন্তু অনভ্যাসের ফোঁটা নাকি কপালে সয় না। তাই ঠিক সেই সময়েই বন্ধ দরজায় করাঘাত।

*　　　*　　　*

নাটকের প্রোগ্রামটা দেখে প্রিয় বুঝে নিল, চারুর কখন বিরতি। তাই বুঝে সে একেবারে সাজঘরে গিয়ে হাজির। সতী আর হৈমকে কিছু একটা অন্য কথা বলে গিয়েছিল।

প্রিয়নাথকে দেখেই নূরজাহানের রূপসজ্জায় চারুশীলা লাফিয়ে উঠে প্রথমে বাঁ হাত কপালে ঠেকিয়ে ডান হাতে একবার মাটি তারপরে কপাল স্পর্শ করে বাদশাহী কায়দায় কুর্নিশ করল। তারপরেই একেবারে হাঁটু মুড়ে বসে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েই বলল: নূরজাহানের সঙ্গে জাহাঙ্গীরের সাক্ষাৎ ঘটাতে নাট্যকার অনেক রক্তপাতের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু চৌধুরী একেবারে শান্তির পথে এই সাক্ষাৎকার ঘটিয়ে দিল।

প্রিয় বলল: যা-সব শারীরিক কৌশল দেখালে, তাতে রক্তপাতটা ঘটা একেবারে অসম্ভব ছিল না।

: কার মুখ দেখে আজ ঘুম থেকে উঠেছিলাম, জানি না। আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছি না। তা অভিনয় কেমন লাগছে?

: ভাল।

: আমার?

: খুব ভাল।

: বড় কর্তার?

: সেটা প্রশ্নের অতীত।

: তরুর?

—ততক্ষণে প্রিয়নাথের মনে পড়ল। পূর্বতন ভারতসম্রাজ্ঞী রেবার চরিত্রে তরু অভিনয় করছে। কার্জন পার্কে চৌধুরীর সঙ্গে তরঙ্গিনীকে দেখেছিল। লালবাঈ নাটকে নাম ভূমিকায় সে প্রিয়র বিপরীতে অভিনয় করতে চেয়েছিল। তা সে নাটকই তো সব গোলমাল হয়ে গেল। উত্তর দিতে দেরি দেখে চারু বলে উঠল: ভাল লাগেনি বুঝি? নতুন তো! তরুকে চেন তো?

: চিনি বোধহয়। চৌধুরীবাবুর ইয়ে—

: ঠিক বলেছ। ইয়ে। আমি যেমন তোমার ইয়ে।

: তুমি আমার কি?

: ঐ যাকে বলে 'এখে দেওয়া', তাই। তুমি আমাকে এখে

দাওনা, প্রিয়দা ? বিয়ে আমার একবার হয়েছে। তারপরে দশটা পুরুষ মানুষের হাত ঘুরেছি। বিয়ে আমার আর হবে না। ঐ এখে দেওয়াই ভরসা।

: তা 'এখে দেওয়া'টা কী জিনিষ ?

: ওমা! 'এখে দেওয়া' জান না ? তবে শোন। মলয় সেন নামে এক ভদ্রলোক ছিল। বাবার ব্যবসার অংশীদারের ছেলে।

প্রিয়নাথের মনে পড়ল, মলয় সেনের নাম। চৌধুরী বলেছিল, কোন এক মলয় সেনের বাড়িতে চারুকে বৌ করে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু চারু সেখানে টিঁকতে পারেনি। বড় কর্তার সঙ্গে ঢলাঢলি করে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। প্রিয় চুপ করে থাকল। চারু বলল : সেই মলয় সেন আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করত। বাজারের এক মেছুনীর দেহ-সৌষ্ঠভ দেখে তার প্রেম-সঞ্চার হোল। একদিন অনেক সব কাপড়-চোপড় জিনিষপত্র কিনে মেছুনীকে বাসায় ডেকে নিয়ে এলো! মেছুনী সব শুনে-টুনে বলল, আমরা উট্‌কো কাজ করি না। এখে দিলে থাকতে পারি।

প্রিয়নাথ বুঝতে পারল, 'এখে দেওয়া' মানে 'রেখে দেওয়া।' তার অর্থ রক্ষিতা করে রাখা।

তারপরেই চারু রসিকতার চরম আনন্দে হোঃ হোঃ করে হাসতে হাসতে কাছে গিয়ে দুই হাত একেবারে প্রিয়নাথের কাঁধের ওপরে রাখল। অস্বাভাবিক প্রগলভতায় প্রিয়নাথের আগেই সন্দেহ হয়েছিল। এইবার ঘনিষ্ঠতায় একটি গন্ধ এসে প্রিয়নাথের নাকে লাগল। স্থির-নিশ্চয় হয়ে প্রিয়নাথ বলল : আর বেশী কথা বলে কাজ নেই। তোমার সিনের সময় হয়ে এলো। একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা কর। তা না হলে সিন খারাপ হয়ে যাবে।

চারুর মুখখানা মলিন হোল। ধরা পড়ে যাবার উদ্বেগ। সে জিজ্ঞাসা করল : বেচাল হয়ে পড়েছি নাকি ?

প্রিয় বলল : যা করছ আর যা বলছ—তাতো স্বাভাবিক নয়।

মুখখানা একেবারে ম্লান করে চারু বলল : তাহলে তুমি চলেই যাও, প্রিয়দা। এখানে আর দাঁড়িও না।

প্রিয় ঘুরে দাঁড়াতেই চারু আবার কাছে সরে এসে বলল : বিশ্বাস কর প্রিয়দা, জীবনে আজ এই প্রথম খেয়েছি। পরিমাণ না বুঝে হয়ত বেশী খেয়ে ফেলেছি।—একটু চুপ করে থেকে প্রিয়র হাত দুখানা দুহাতে ধরে চারু বলল : তুমি রাগ করেছ প্রিয়দা, মদ খেয়েছি বলে ? তোমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আর কোনদিন খাব না।

প্রিয় বলল : আমাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করে কী হবে ? আমি তোমার কে ?

চারু মুখখানা অত্যন্ত বিষণ্ণ করে বলল : নেশা করলেও জ্ঞান হারাই নি। তা হারালে আমার সংলাপ শুনে অত হাততালি পড়ত না। তাই জিজ্ঞাসা করছি, অমন একটি কথা তুমি কী করে বললে ?

: কোন কথা ?

: ঐ যে বললে, তুমি আমার কে ? তুমি আমার কে, তা তুমি জান না ?

এমন সময়ে একজন এসে জানাল, চারুর সিন প্রায় এসে পড়েছে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল : সিন তুলতে বারণ কর। আমি যাচ্ছি।

প্রিয়নাথ যাবার জন্য ফিরে দাঁড়িয়েছিল। চারু বলল : শোন ! কাজের কথাই বলা হোল না। তুমি আজ যাও। কাল সকালে দেখা করবে। আমরা রাজবাড়িতে আছি। আমি আর বড়কর্তা দুজনেই রাজবাড়ির অতিথি। কাল গেলে দুজনের সঙ্গেই দেখা হবে। কাজের কথা কালই বলব।

কোন কথা না বলে প্রিয়নাথ এক পা এগুতেই চারু বড় কান্নার স্বরে বলল : তুমি কথা দিয়ে গেলে না প্রিয়দা ? আমার বড় বিপদ।

প্রিয় উদ্বিগ্ন হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল : কী বিপদ তোমার ?

চারু বলল : তা কালই বলব। আমাকে নিয়ে তোমায় অনেক দূরদেশে যেতে হবে। সে তোমার বিষ্ণুপুর নয়। তোমার রেলের

পাসে বৌ সাজিয়েও নিতে পারবে না। সে জায়গা বড় ভাল ছিল। কিন্তু এখন মৃত্যুকূপ হয়েছে। তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে প্রিয়দা ?

: সে জায়গাটা যদি মৃত্যুকূপ হয়, তবে তোমার সেখানে যাবার দরকার কী ?

: সেখানে না যেতে পারলে, আমি মরে যাব। সেখানে অমার সব।

প্রিয়নাথ ভাবল, অজ্ঞাত সেই মৃত্যুকূপ যেখানেই হোক, চারুর কোন এক প্রিয়জন সেখানে আছে। তাকে উদ্ধার করে না আনতে পারলে চারুর শান্তি নেই। চারুর প্রিয়জন বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা অসম্ভব নয়। নেশার ঘোরে চারুশীলা সেই গোপন রহস্য প্রকাশ করে ফেলল। পেশাগত অভিনয় করে করে এরা আপনজন সৃষ্টির এমন মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। তাই করে করে এরা দিগ্বিদিকে সব আপনজন বসিয়ে রেখেছে। তা রাখুক। তার জন্য প্রিয়নাথের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা কিছু নেই। কিন্তু তাকে উদ্ধারের দায়ভাগ প্রিয়নাথের ওপরে এসে পড়ে কেন ? সংসারের যত বিচিত্র ব্যাপার সবই কি বিধাতা পুরুষ তার জন্য সাজিয়ে রেখেছেন ? তার মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। চুপ করেই থাকল। তখন চারু আবার বলতে আরম্ভ করল : জানলে প্রিয়দা ? সেখানে আমার এক দিদিও আছে। সে দিদির রূপ নেই বলে বিয়ে হোল না। আমার রূপ দেখে সকলে আমাকে নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করল। কিন্তু আমার দিদির বিয়ে হোল না। আমার দিদিকে খুঁজে, পেলে, তুমি তাকে বিয়ে করবে, প্রিয়দা ?

প্রিয়নাথ ভাবল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাতালের অসংলগ্ন প্রলাপ শুনে লাভ নেই। সে আবার ফিরে দাঁড়াল। চারু তার হাতটা ধরে ফেলে বলল : তুমি কিছু না বলে চলে যাচ্ছ যে বড় ?

রাগ সামলাতে না পেরে প্রিয় বলে উঠল : একটু আগে বললে,

তোমাকে রক্ষিতা রাখতে হবে। আবার এখন বলছ, তোমার দিদিকে বিয়ে করতে হবে। কোনটা করব? দুটোই?

প্রায় কেঁদে ফেলার মত হয়ে চারু বলল: আমার দিদির জন্যে আমি সব ছাড়তে পারি। আমার দিদিকে বিয়ে করলে, তোমার ওপরে সব দাবী আমি ছেড়ে দিতে রাজি আছি। আমার দিদির রূপ নেই বলে তার যে বিয়ে হোল না। মেয়ে মানুষের জীবনের সবকিছু আনন্দ তার কাছে অজানা থেকে গেল।

প্রিয়নাথ বলল: তার জন্য দুঃখ কি? নিজের অন্তহীন আনন্দের কিছু ভাগ না হয় দিদিকে দিয়ে দিও।

এতক্ষণে চারুশীলার চোখে জল এসে পড়ল। ছল ছল চোখ দুটি প্রিয়নাথের মুখের ওপরে রেখে চারু বলল: ঠাট্টা কোরনা প্রিয়দা। নিজের মানুষ ঠাট্টা করলে প্রাণে বড় লাগে।

চারুর মুখখানা দেখে আর তার কথা শুনে প্রিয়নাথের বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠল। তার ইচ্ছে হোল, চারুশীলার চোখ দুটি সে রুমাল দিয়ে মুছিয়ে দেয়। সে কী যেন বলতে গিয়ে দরজার সামনে নাট্যাচার্যকে দেখে ভয়ে সরে গেল। নাট্যাচার্য প্রিয়নাথকে দেখেছিলেন কিনা, তা বোঝা গেল না। তাঁর মুখখানায় তখন পরিহাস-প্রিয়তার চিহ্নমাত্র নেই। তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বললেন: আজ তাহলে ড্রপটা ফেলে দিয়ে নাটক শেষ হয়ে গেল বলে ঘোষণা করে দিই?

নাটকের বাকি অংশ অভিনয়ে নূরজাহান চরিত্রে কেবলই ক্রুটি দেখা যেতে লাগল। তা দেখে নাট্যাচার্যের বিরক্তি গোপন থাকল না। রঙ্গমঞ্চের মধ্যেই সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে তিনি না-না কথা মৃদুভাবে বলে চারুশীলাকে সাবধান করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। যে প্রত্যাশাভরা সম্ভাবনা নিয়ে নাটক আরম্ভ হয়েছিল, তা নৈরাশ্যের বেদনায় শেষ হোল। চারুশীলার বিব্রত মুখখানা লক্ষ্য করে করে প্রিয়নাথের মনটা বেদনায় ভরে উঠল। তার

কেবলই মনে হতে লাগল, যাহোক কিছু একটা আশার কথা চারুকে বলে এলেই হোত।

*　　*　　*

রোদন ভরা বেদনার মধ্য দিয়ে নাটক শেষ হল। এই বেদনা শুধু বিয়োগান্ত নাটকের বিচ্ছেদ-বেদনা নয়। তার সঙ্গে ব্যর্থতার যন্ত্রণা। নাটকের শেষ দৃশ্যে নূরজাহানের সংলাপ বড়ই করুণ। সে বলছে—"মেহের উন্নিসা ছিল শের খাঁর স্ত্রী। আর নূরজাহান ছিল জাহাঙ্গীরের স্ত্রী। মেহের উন্নিসা মারলো শেরখাঁকে; নূরজাহান মারলো জাহাঙ্গীরকে। কী দিয়ে মারলো?—রূপ! রূপ!—নৈলে মরতো না।—রূপ নিয়ে সামলাতে পারল না।"—এই সংলাপ বলতে বলতে চারুশীলা অচৈতন্য হয়ে মঞ্চের ওপরে লুটিয়ে পড়ল। যবনিকা পড়ে গেল। শেষ সংলাপ বলা হল না। সতী বড়ই উৎসাহ আর আনন্দ নিয়ে দিলীপকুমার আর চারুশীলার অভিনয় দেখতে এসেছিল। এই অভিনয় দেখবার জন্য প্রিয়নাথকে জোর করে ধরে এনেছিল। কিন্তু নাটক শেষ হয়ে যেতে তার কেবলই মনে হতে লাগল—না-এলেই ভাল হত। দিলীপকুমার আর চারুশীলাকে নিয়ে অন্তরের মধ্যে যে আকাশ-কুসুম সৃষ্টি করে রেখেছিল, তা এমনভাবে ভেঙ্গে চুরমার করে না দিলেই ভাল হোত। কিন্তু যা দেখেছে, তা আর মুছে ফেলবার উপায় নেই।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে প্রিয়নাথ তিনজন লোকের জন্য দু'খানা রিক্স ঠিক করল। একখানাতে সতীকে তুলে দিতেই হৈম দ্বিতীয়-খানাতে উঠে বসল। প্রিয়নাথ বিপাকে পড়ল। দ্বিতীয়খানাতে একলা উঠে হৈমবতীর প্রিয়নাথকে নীরব আমন্ত্রণ কিনা, কে জানে! যদি তাই হয়, তবে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করায় না-না সমস্যা। থিয়েটার দেখতে দেখতে সতী প্রিয়নাথকে অন্ধকারের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিল। তা হয়ত হৈম দেখেছে। কেন ধরেছিল—সেকথা প্রিয়নাথ জানে না। না জানলেও এটা বোঝে—সতী নিশ্চয়ই প্রণয়

নিবেদনের জন্য অমন কাজ করে বসেনি। কিন্তু অজ্ঞতা নিয়ে বসে থাকবার পাত্রী হৈমবতী নয়। সে আপন মনের মাধুরি মিশায়ে কিছু একটা কাব্য-উপন্যাস সৃষ্টি করবে। তাকে সে সুযোগ দিয়ে কিছু লাভ নেই—এই কথা মনে করে, সে হৈমর রিক্সখানার দিকে এগিয়ে গেল। একখানা রিক্সতে হৈম বসলে, দ্বিতীয়জনের বড় একটা বসবার জায়গা থাকে না। তার মধ্যে সে এমন ঢিলেঢালা ভাবে বসে থাকল যে, সেখানে প্রিয়নাথের অনুপ্রবেশ অসম্ভব। প্রিয়নাথ পরিষ্কার বুঝতে পারল—বিন্দুমাসীমার সকল হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করে সে প্রিয়নাথের ঘনিষ্ঠতা পরিহার করল। তার কাছে ব্যাপারটা সাময়িক স্বস্তিদায়ক হলেও মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকেই গেল। সদ্য-ঘটিত ব্যাপারটার প্রতি ইঙ্গিত কি-না, কে জানে! হয়ত সতীর প্রতি অনুকম্পা। হয়ত ঘটনাটাকে আরও এগিয়ে দেবার জন্য প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়। কিম্বা হয়ত প্রিয়নাথের মনের কথা কিছু একটা অনুমান করে নিয়ে অভিমান। তবে হৈমবতী দেনা-পাওনার কারবারে মান-অভিমানের বড় একটা ধার ধারে না। কিন্তু অতশত চিন্তার অবকাশ নেই। সে গিয়ে সতীর পাশে বসে পড়ল। বসে দ্বিতীয় রিক্সখানাকে আগে আগে যেতে বলল। হয়ত দৃষ্টির মধ্যে রাখবার জন্য। অপরিচিত জায়গা। সাবধান থাকাই ভাল। নিরাপত্তার অনুরোধ।

বর্ধমানের আলোরা তখনও টুপি পরে সাহেব সাজেনি। ওখানে তখনও ব্ল্যাকআউটের অশুভ পদসঞ্চার হয়নি। দু'খানা রিক্সই আগে পরে এগিয়ে যেতে লাগল। দূরে-দূরে এক-একটা আলোর নীচে এলেই প্রিয়নাথ একবার করে সতীর মুখখানা দেখে নেয়। রূপ নেই কিন্তু শান্তশ্রী আছে। মুখখানা দেখলে প্রিয়র কেমন যেন মায়া হয়। যৌবন অনেকদিন আগে এসে তার দেহখানাকে আশ্রয় করেছে। কিন্তু এখনও পরিত্যাগ করেনি। তবে প্রথম সমাগমের সে সমারোহ আর নেই। এখন থাকতে হয় তাই আছে। এত

দিনেও বিয়ে হয়নি। হয়ত রূপ নেই বলে। হয়ত বাবার প্রচুর পয়সা নেই বলে। হয়ত সেই সুদূর বর্মা মুলুকে বিয়ের উপযুক্ত সমাজ নেই বলে। কিম্বা হয়ত প্রেমে ব্যর্থতাও হতে পারে। চারু বলল—তার দিদিরও রূপ নেই বলে বিয়ে হয়নি। তবে কি যাদের রূপ নেই, তাদের বিয়ে হয় না! কিন্তু প্রিয়নাথ অনেক রূপহীনা বিবাহিতা গৃহবধূ দেখেছে। তাদের বিয়ে হোল কী করে! কোন মৃত্যুকূপে চারুর রূপহীনা দিদি রূপময় জগতের অনাস্বাদিত হাহাকার নিয়ে বসে আছে, কে জানে! তাকে বিয়ে করলে চারু নাকি প্রিয়নাথের ওপরে সব দাবী, সব অধিকার ছেড়ে দিতে রাজি আছে। প্রিয়নাথের ওপরে এতসব দাবী, এমন অধিকার কবে কী করে আয়ত্ব করেছে, তা সেই জানে। প্রিয়নাথ রূপকথার নায়কের মত বিরাট এক তরবারি হাতে নিয়ে সপ্তসমুদ্রের তলদেশে গিয়ে প্রাণ-ভোমরা সংগ্রহ করে সেই রূপহীনা অভিশপ্তা দিদিকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসে তাকে বিয়ে করলে, তবে চারু তার দাবী ছাড়বে।

কোথায় সে মৃত্যুকূপ আর কোথায় বা তার দিদি! যত সব সৃষ্টিছাড়া চিন্তা। কোথাকার এক থিয়েটারের নটী। মাতাল হয়ে কী বলেছে, তাই নিয়ে যত সব উদ্ভট চিন্তা। এইসব ভাবনা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই সে সতীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল: থিয়েটার দেখতে দেখতে অমন করে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে কেন? ভয় পেয়েছিলে?

সতী মুখ তুলে তাকাল। তার চোখে-মুখে বিড়ম্বনার চিহ্ন। সেই বিড়ম্বনা থেকে তাকে মুক্তি দেবার জন্যই প্রিয়নাথ নিজেই উত্তরটা তৈরি করে দিয়ে বলল: কারও হাতটাত গায়ে লেগেছিল বুঝি?

চারুর চোখে-মুখে মুক্তির স্বস্তি আর কৃতজ্ঞতার আনন্দ। সে বলল: কী করে বুঝলেন? কার যেন একটা হাত আমার পিঠে এসে পড়ল।

প্রিয় মৃদু হেসে বলল : সে হাতখানা হয়ত আমারই ছিল !

: আপনার নয়—আপনার হলে আমি বুঝতে পারতাম।

: আমার স্পর্শের বুঝি আলাদা আস্বাদ ?

সতী পলকের জন্য প্রিয়নাথকে দেখে নিয়ে মাথা নীচু করল। তার মুখের রং বদল হয়েছিল কি-না, সেকথা অন্ধকারে বোঝা গেল না। সতী বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেনি। প্রিয়নাথও কথাটা বলে ফেলে বিব্রত হয়ে পড়েছে।

প্রিয়নাথ সামনের রিক্সখানা এক নজর দেখে নিয়ে কী ভেবে নিজের হাতখানা সতীর পিঠের ওপরে রাখল। এই অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ এগিয়ে যাবার পরে সতী জিজ্ঞাসা করল : আপনি নিজেও তো অভিনয় করেন, শুনলাম।

: ওটা আমার এক নেশা।

: নেশা মানুষের কিছু কিছু মঙ্গলও করে থাকে—শুনেছি।

: মঙ্গলা মঙ্গলের কথা জানি না। নেশার টানে করে যাই।

: মাসী বলছিল—ঐ চারুশীলার সঙ্গেও না-কি আপনি থিয়েটার করেছেন ?

: একেবারে মিথ্যে নয়।

: ওদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন ?

: কাদের সঙ্গে ?

: ঐ দিলীপকুমার-চারুশীলা—এইসব ?

: বিচিত্র তোমার ইচ্ছা। কিন্তু কেন ? অভিনয় করবে না-কি ?

: অভিনয় করব না। আমাদের সামনে ওরা রাজা হয়, রাণী হয়, কত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা, আলাপ-বিলাপ। কত রূপে আমরা ওদের দেখি। কিন্তু সবকিছুর অন্তরালে ওদের নিজস্ব প্রচ্ছন্ন যে রূপটি আছে, আমি তাই কিছু জানতে চাই।

: অদ্ভুত তোমার কৌতূহল।

: হয়ত তাই। এটা হয়ত আমার বিচিত্র বিলাস।

প্রিয়নাথ সতীর মুখখানা দেখবার চেষ্টা করল। কিন্তু দেখা গেল না। একে মাথাটি নীচু হয়ে আছে; তাতে অন্ধকার। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কেমন যেন একটা বেদনার আভাস। নটী জাতীয় স্ত্রীলোকদের প্রতি সতীর এই ভাবান্তরে প্রিয়নাথ বিস্মিত হোল। ডান হাতখানা সতীর পিঠের ওপরেই ছিল। সে হাতখানা পিঠে বুলিয়ে দিতে লাগল। প্রিয়নাথের অন্তরঙ্গ স্পর্শ সতী দেহমন দিয়ে আস্বাদন করতে থাকল। সে হঠাৎ বলে উঠল: দিলীপকুমারের স্ত্রী না-কি আত্মহত্যা করেছিলেন?

প্রিয়নাথ সতীর মুখের দিকে তাকাল। তার মনে পড়ল— সেই দিলীপ কুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা। মনে পড়ল— তাঁর জীবন-দর্শনের বিচিত্র সব কথা। প্রিয়নাথের লেখা নাটক দিলীপকুমার দেখেছিলেন। সে কতদিন আগে। সেই নাটকের মধ্যে নায়ক অর্থাৎ পেশাদার অভিনেতা অন্য নারীতে আসক্ত ছিল বলে তার গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছিল। কতদিন আগে দিলীপকুমার তাই দেখে রেখেছিলেন। তারপরে একদিন সেই নাট্যকার প্রিয়নাথকে সামনে পেয়ে দিলীপকুমার জিজ্ঞাসা করেছিলেন— "নাট্যকার মশায় কি নাটক রচনার আগে এ অধীনের জীবনচর্চা বিষয়ে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন?"—প্রিয়নাথের মুখে সেদিন কথা ছিল না। আজ সতীর প্রশ্নে সংক্ষেপে উত্তর দিল: সেই রকমই শুনেছি।

সতী বলল: দিলীপ কুমারের তাহলে স্ত্রী ছিলেন। তা তিনি আত্মহত্যাই করুন আর যাই করুন। কিন্তু চারুশীলা? তাঁরও স্বামী আছে না-কি?

: স্বামী আছে কি-না জানি না। তবে রঙ্গমঞ্চের বাইরে ভদ্রমহিলা শাঁখা-সিঁদুর ব্যবহার করেন।

: অভিনয়ের সময়ে বুঝি শাঁখা খুলে ফেলেন আর সিঁদুর মুছে ফেলেন?

প্রিয়নাথ হেসে ফেলে বলল: তবে কি তুমি বলতে চাও—নূরজাহান শাঁখা-সিঁদুর পরে এসে হাজির হবে?

কী একটা মানসিক অস্থিরতায় সতী পরিহাসটা উপভোগ করতে পারল না। সে বলল: তা নয়। আমি ভাবছি, ওঁদের জীবন-যন্ত্রণার কথা। কতবার ওঁদের হাতের শাঁখা খুলে ফেলতে হয় আর সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলতে হয়। কিন্তু ও যে বড় অমঙ্গল!

: ওর নাম—অভিনয়। ওতে অমঙ্গল হতে যাবে কেন?

: তা আপনি ওদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন ত?

: সে বন্দোবস্ত আমি না-হয় করতে পারি। কিন্তু তোমার মা-বাবা রাজি হবেন ত?

: মা-বাবাকে জিজ্ঞাসা করে তাঁরা রাজি হলে তবেই যাব। তার আগে নয়। কিন্তু আপনি হাতখানা নামিয়ে নিন। এসে পড়েছি। মাসী নেমে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি হাতখানা নামিয়ে নিয়ে প্রিয়নাথ দেখল—হৈম রিক্স থেকে নেমে অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয় সতীর পিঠে প্রিয়নাথের হাতখানা দেখেই তার এই না-দেখার ভান। সতীর ওপরে প্রিয়নাথের অভিমান হোল—আর একটু আগে সাবধান করলেই ভাল হোত। আবার একটু তৃপ্তিও পেল এইভেবে—সতী হয়ত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার স্পর্শ-সুখ উপভোগের লোভ ছাড়তে পারেনি।

তারপরেই যা দেখল—তাতে প্রিয়নাথের অঙ্গ হিম হয়ে গেল। স্বয়ং সত্যনারায়ণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তিনি স্বচক্ষে দুজনকে রিক্সর মধ্যে বসে থাকতে দেখেছেন। পিঠের ওপরে হাতখানা দেখাও একেবারে অসম্ভব নয়। প্রিয়নাথের একমাত্র ভরসা—হয়ত বৃদ্ধের দৃষ্টিশক্তি অত তীক্ষ্ণ নয়।

তাদের দেখেই সত্যনারায়ণ সেই অতিকায় কৌটো থেকে বুড়ো আঙ্গুল আর তর্জনীর সাহায্যে বেশ আয়েস করে নস্যি তুলে নিয়ে

গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বেশ জোরে জোরে নিঃশ্বাস টেনে দুই নাকে গ্রহণ করে ছলছল আরক্ত দুই আঁখি নিয়ে দুটো-একটা সিঁড়ি নেমে পড়তেই প্রিয়নাথের কাছে জগৎ-সংসার মিথ্যে হয়ে গেল। তার ইচ্ছে হোল—তখনই সে অন্ধকার বনপথে দৌড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু প্রিয়নাথকে অবাক করে দিয়ে সত্যনারায়ণ বললেন: তোমরা ভেতরে যাও। আমি রিক্স বিদায় করছি।

প্রিয়নাথ রজনীর অন্ধকারে পালা-বদলের কথা কিছু জানে না।

* * *

খাওয়া-দাওয়া মিটিয়ে প্রিয়নাথ শুয়ে পড়ল। শীত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একটু একটু গরম ভাব। ঘরে ইলেকট্রিক পাখা নেই। হৈম বিছানায় শিয়রের কাছে বসেছিল। একটু পরে সতী হাতে একখানা পাখা নিয়ে পায়ের কাছে এসে বসল। এ যেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের কাছে দুর্যোধন আর অর্জুনের আগমন। দুর্যোধন আগে ভাগে এসে নিদ্রিত শ্রীকৃষ্ণের শিয়রের স্থানটি অধিকার করেছিল। আপন কৌলীন্যবোধ কি-না, কে-জানে —বসার স্থানটা সে মাথার কাছেই বেছে নিয়েছিল। অর্জুন পরে এসেছিল। বসেছিল পায়ের কাছে। তার স্থান শ্রীচরণে। উভয়েরই উদ্দেশ্য, আসন্ন যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য-প্রার্থনা। মাধব ঘুম ভেঙেই প্রথমে দেখেছিলেন অর্জুনকে। ঘুম ভেঙে তাকালে প্রথমে পায়ের দিকেই নজর যাবে। বসবার স্থান হিসেবে মাথার কাছের জায়গাটার কিছু মর্যাদা থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল হোল না। প্রথম দেখার পুরস্কার হিসেবে শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া দু'টি বিকল্প প্রস্তাবের মধ্যে একটি বেছে নেবার সুযোগ পেল অর্জুন। এ ক্ষেত্রেও তাই হোল। প্রিয়নাথের তন্দ্রা মত এসেছিল। সেটা ভেঙে যেতেই প্রথম কথা বলার সুযোগ পেল পায়ের কাছে বসা সতী। সে বলল: আমাদের এ বাড়ীতে পাখা নেই। কিন্তু গরম

পড়েছে।—এই কথা বলে সে প্রিয়নাথকে পাখা দিয়ে হাওয়া করতে লাগল।

প্রিয়নাথ বিব্রত হয়ে বলল: আমাকে হাওয়া করতে হবে না। এমন কিছু গরম নয়।

সতী মৃদু হেসে বলল: গরম আছে—জানতি পারেন না।

তিনজনে হেসে উঠল। প্রিয় বলল: সেই নাটকটি দেখেছ বুঝি? পরশুরামের চিকিৎসা বিভ্রাট?

হৈম কথা বলার সুযোগ পেল। বিশেষ করে প্রিয়নাথকে খোসামোদের কথা। সে বলল: নাটকের কথা হলে, প্রিয়দার কিছু অজানা নেই।

সতী বলল: যস্মিন দেশে দ্রুমো নাস্তি এরাণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে। জন্মের মধ্যে কর্ম। বাঙ্গালীরা মিলে পেগুতে নাটক করেছিল—চিকিৎসা-বিভ্রাট। সারা বর্মার বাঙ্গালী বুঝি ভেঙ্গে পড়েছিল। অনেক টাকার টিকিট বিক্রী হয়েছিল।

প্রিয় বলল: তুমি পার্ট করেছিলে না-কি?

সতী লজ্জায় লাল হয়ে বলল: করেছিলাম।

প্রিয়: ও বইতে একটিই তো নারী-চরিত্র—"বিপুলা"। তুমি কি তাই করেছিলে?

সতী আর হাসতে-হাসতে কথা বলতে পারে না। সে প্রিয়নাথের পা দুটি ধরে তার মধ্যে মুখ লুকিয়ে কোনরকমে আত্মরক্ষা করল। তাই দেখে হৈমরও হাসির পালা আরম্ভ হোল। আত্মরক্ষার জন্য মুখ লুকোতে হলে একেবারে হাতের কাছে প্রিয়নাথের মুখখানা হাজির। কিন্তু তাতো সম্ভব নয়। সতীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার যতই দরকার থাক, ওভাবে আত্মরক্ষার ভান করা সম্ভব নয়। সে বলল: বিপুলার চরিত্রটা আমাকে খুব ভাল মানাত।

সতী বলল: আমি এত ভাল অভিনয় করেছিলাম যে, মুন্সীবাবু আমাকে মেডেল দিয়েছিলেন। মহেশ মুন্সী, ওখানকার খুব বড়

এ্যাড্ভোকেট। দেখতে ঢিলেঢালা কিন্তু এজলাসে দাঁড়ালে, রায় লিখতে জজ সাহেবের হাত কাঁপত।

প্রিয়নাথ বলল : জানি। তিনি আমাদের আত্মীয়। তাঁর ভাই ভবেশ মুন্সী, আর এক ভাই—তার ডাকনাম ছিল গুগরা। তার এক শালাও ওখানে ছিলেন। তাঁর নাম—সত্য।

প্রিয়নাথ আবার বলল : তোমায় হাওয়া করতে হবে না, সতী। অস্বস্তি লাগে।

আবার হৈমর কথা বলার সুযোগ হোল। সে বলল : প্রিয়দা কারও সেবা নিতে চান না।

সতী দুই চোখ বড় বড় করে বলল : তাই না-কি প্রিয় মামা? কিন্তু সময় থাকতে একটু একটু সেবা-গ্রহণ অভ্যেস করুন। তা-না হলে, তখন মুস্কিলে পড়বেন।

প্রিয় জিজ্ঞাসা করল : কখন?

সতী : একজন যখন সেবাধর্মের অধিকার নিয়ে আসবে। সে নিজের অধিকার ছাড়বে কেন?

সঙ্গে সঙ্গে হৈমর মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল। তা সতীর লক্ষ্য এড়াল না। প্রিয় এবং সতী হেসে উঠল। কিন্তু হৈম হাসল না। তার ভাবখানা এই যে, প্রিয়নাথের সেবাধর্মে তারই অধিকার। সুতরাং লজ্জাবোধ হোক আর না-হোক, সেই ভাবখানা প্রকাশের মধ্যে একটা আত্মশ্লাঘা আছে। স্থূল হলেও, একথাটা সে বুঝতে পেরেছে। হৈমর এই ভাবখানা সতী বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করল।

হাসাহাসির শব্দে কি-না কে জানে, বিন্দুবাসিনী সশরীরে দরজায় দর্শন দিলেন। তিনি বললেন : রাত তো ভোর হয়ে এলো। প্রিয়কে একটু ঘুমোতে দে তোরা। ওকে আবার সাত-সকালে গাড়ী ধরতে হবে।

সতী বলল : কে বলেছে—তোমার প্রিয়কে সাত-সকালে গাড়ী ধরতে হবে? প্রিয় কাল যাবে না।

বিন্দু : ওমা। সে আবার কী কথা। আমি বড় দুলালকে কথা দিয়ে এসেছি। তাছাড়া ওর আফিস আছে-না ?

: কাল ত রবিবার। আফিস কিসের আবার ?

: তা আফিস না থাকলে কী হবে ? প্রিয় না থাকলে বড় দুলালের সংসার অন্ধকার। আমি বলে তাই ওকে আনতে পেরেছি।

: তুমি বুড়ি, অসাধ্য সাধন করতে পার—তা বুঝতে পেরেছি। এইবার তুমি শুয়ে পড়।

: ওমা। আমি কি একলা ঘরে শুয়ে থাকব না-কি ? দরজা খোলা রেখে ?

: একলা শুয়ে থাকবে কেন ? ধ্যানযোগে তোমার সাধুটিকে বদ্রিনারায়ণ থেকে ডেকে নিয়ে এসো।

বিন্দুবাসিনী নাতনীর পরিহাসটা বেশ উপভোগ করলেন। তবুও বয়স্কা মেয়ে রয়েছে, প্রিয়নাথ রয়েছে। তাই ঈষৎ লজ্জায় মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললেন : তুই দিদি পুরুষ মানুষ হলে সেপাই হতিস। কার গলায় যে ঝুলবি, তাই ভাবি।

সতী বলল : তোমার ভাবনাটা কিসের ? তোমার সতীন হব না। ওরে বাব্বা! গোঁফ-দা'ড়িতে ছারপোকা, মাথার জটায় মাকড়সার জাল, গায়ে দুর্গন্ধ। এই কথা বলে সতী নাকে কাপড় দিল।

বিন্দুবাসিনী মুখে আঁচল-চাপা দিয়ে চলে গেলেন। হৈমও পেছনে পেছনে বেরিয়ে গেল। সতীকেও অনুসরণের জন্য নীরব ইঙ্গিত কি-না, কে জানে! কিন্তু কোন ইঙ্গিতই সতী গ্রাহ্য করল না। বিন্দুবাসিনীর গলার কাঁটা হয়ে সে প্রিয়নাথের বিছানায় বসে থাকল। পাশেই সত্যনারায়ণ আর অরুন্ধতীর ঘরের দরজা বন্ধ। তাদের কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে না। বিন্দুবাসিনীর ঘরের দরজা বন্ধ হবার শব্দ পাওয়া গেল। বয়স্থা মেয়েকে নিয়ে দরজা খোলা রেখে শোওয়া

যায় না। সতী এলে দরজা খুলে দেবেন—এই রকম ভেবে রাখলেন। কিন্তু সে মেয়ে সহজে আসবে—এমন মনে হয় না। তার মা-বাবা দিব্যি ঘুমোচ্ছে। এমন সোমত্ত মেয়ে রেখে কী করে চোখে ঘুম আসে, তা ভগবান জানেন। বিন্দুবাসিনী তেমনটি পারেন না। তাই তিনি মেয়েকে সর্বদা চোখে-চোখে রাখেন। তাই সে মেয়ে আনন্দলালের কাছে গঙ্গাজলের শিশি হয়ে উঠেছে। বিবাহযোগ্যা মেয়ের মা হওয়া যে কী আপদ—সে কথা তিনি বুঝতে পেরেছেন। তা পেরেছেন বলেই এতক্ষণ নিজে অন্তরালে থেকে প্রিয়নাথের ঘরে সতী আর হৈমর প্রতিযোগিতা মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছেন। তারপরে অবস্থাটা ঠিক অনুকূল নয় বিবেচনা করেই স্বশরীরে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সতীর সংসর্গ থেকে ছেলেটাকে পৃথক করবার ফন্দী-ফিকির ভাবতে লাগলেন। কিন্তু শেষরক্ষা তো হোলই না, হোল বিপরীত। নিঝুম নিস্তব্ধ রাতে ঘরের মধ্যে প্রিয়নাথ আর সতীকে রেখে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করতে হোল। এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড তিনি জীবনে না-কি দেখেন নি। তা তিনি দেখেন নি, এমন ঘটনা সংসারে ঘটবে না—এ আবার কী কথা!

এদিকে নির্জন ঘরের মধ্যে সতীর মুখখানা দেখে-দেখে প্রিয়নাথের কেবলই মনে হতে লাগল—সেই থিয়েটার দেখতে দেখতে সতীর কোমল হাতখানা তার পিঠের ওপরে এসে পড়েছিল। কার একখানা হাত নাকি অন্ধকারের মধ্যে তার গায়ে এসে লেগেছিল। সে ভয় পেয়ে না-কি তাই প্রিয়নাথকে জড়িয়ে ধরেছিল। প্রিয়নাথের মুখ ফসকে একটা কথা বেরিয়ে গিয়েছিল—"আমার স্পর্শের বুঝি আলাদা আস্বাদ?" স্পর্শের আস্বাদ আছে বৈকি। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের আস্বাদনের জন্যই তো বিধাতা মানুষকে চোখ-কান-নাক-জিভ-ত্বক দিয়েছেন। এই পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে মানুষ সংসারটাকে উপভোগ করে। তবুও প্রিয়নাথ এই কথা বলে ফেলেছিল। আর রিক্সাতে বসে প্রিয়নাথের হাতখানা যখন সতীর পিঠের ওপরে ছিল,

তখন এই আস্বাদনের কথা সতী দেহমন দিয়ে অনুভব করেছিল, উপভোগ করেছিল। নিশুতি রাতের নির্জন ঘরে সতীর অন্তরে সেই স্পর্শ-সুখের কথা কেবলই ঘুরে ফিরে মনে হতে লাগল।

* * *

সকালবেলায় প্রিয়নাথ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলে প্রবল আপত্তি উঠল। এক নম্বর সতী। সে বলল: আমাকে বর্ধমান ঘুরিয়ে দেখাতে হবে। কাল দেখা নাটকের সেই শের আফগানের কবর দেখব, রাজবাড়ি দেখব। আরও কত কী আছে—সব আপনার কাছে শুনব—দেখব।

দুই নম্বর অরুন্ধতী। তিনি বললেন: মেয়েটা এত করে বলছে। আজকের দিনটা থেকেই যাও না, দাদা!—প্রস্তাবগুলোর মধ্যে প্রিয়নাথের জন্য বেশ মাধুর্য আছে। বাধাও বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু সত্যনারায়ণ চৌধুরীর মুখখানা মনে হতেই তার বুকটা কেঁপে উঠল। গতকাল রাত্রে তিনি হাসিমুখে আহ্বান করেছেন। স্নিগ্ধ-বিদায় করেছেন—সবই ঠিক। কিন্তু তারপরে পূরো একটা রাত পার হয়েছে। এক রাত্রের ব্যবধানে সংসারে কত কী ঘটে যায়! এখনও তাঁর সেই ভাবমূর্তি বজায় আছে কিনা, কে জানে! সে বিন্দুবাসিনীর মুখের দিকে তাকাল। সে মুখখানাতে কিছু পাঠ করা গেল না। তিনি কাল রাত্রে বলেছেন, প্রিয় একদিন না থাকলে বড় দুলালের সংসার অন্ধকার। এমন জ্যোতিষ্ককে আবদ্ধ রেখে বড় দুলালের গৃহ অন্ধকার করে রাখা তো আছেই। তারপরে সতীর ঘোষিত সফরসূচিতে তিনি বোধহয় মনে শান্তি পান নি। তা না পেলেও আশ্রয় স্থলের অনুরোধটাকে তিনি উল্টে দিতে পারেন না। তাই চুপ করেই থাকলেন। প্রিয়নাথ হৈমর মুখের দিকে তাকায় নি। তার মতামতের কিছু মূল্য আছে বলে সে মনে করে না। শেষকালে যাঁর মতামতের মূল্য সবচেয়ে বেশী, যার আপ্যায়নের অধিকার সব থেকে বেশী; তিনি এগিয়ে এসে প্রিয়নাথকে অবাক করে দিয়ে

বললেন: এত অনুরোধ উপরোধ ঠেলে চলে যাওয়া ভাল হবে না, ব্রাদার।

প্রিয়নাথ স্তম্ভিত। এই একটি কথায় সে সব দ্বিধা ফেলে দিয়ে সত্যনারায়ণের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল: সব কিছু উপেক্ষা করলেও, আপনার আদেশ আমি অমান্য করতে পারি না। আমি আজ থাকব। যে যা বলেছে—সকলের অনুরোধ রক্ষাও করব। কিন্তু জামাইবাবু, আমি একজনকে কথা দিয়েছি। তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। তা করেই আমি ফিরে আসব।

এই কথা বলে সে বেরিয়ে গেল। যাবার সময়ে সতীর সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় হোল। সতীর মুখে তখন নীরব প্রসন্ন তৃপ্তির স্নিগ্ধতা।

* * *

"নূরজাহান" নাটকের সূচনা দেখে বর্ধমান-বাসীরা সেদিন অনেক কিছু প্রত্যাশা করেছিল। তার যে এমন অশুভ সমাপ্তি হবে, তা কেউ ভাবতে পারে নি। জনসাধারণের ওপরে নাট্যাচার্যের অসামান্য প্রভাবই সেদিন বিরূপ পারণামের হাত থেকে পরিস্থিতিকে রক্ষা করেছে। যারপরনাই ক্ষোভ আর বেদনা নিয়ে দিলীপ কুমার সেদিন রূপসজ্জা খুলে ফেলে একা গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন। চারু শেষ দৃশ্যে অচৈতন্য হয়ে লুটিয়ে পড়েছিল। রূপের কথা বলতে বলতেই সে চৈতন্য হারিয়েছিল। মেহের উন্নিসার রূপ শেরখাঁকে পুড়িয়ে মেরেছিল। নূরজাহানের রূপ জাহাঙ্গীরের জীবনটা শেষ করল। তা সে লুপ্ত চৈতন্য সে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে পেয়েছিল। আর তাই দেখেই দিলীপ কুমার আর তার জন্য অপেক্ষা না করে একাই গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন।

রাজবাড়িতে নিজের জন্য নির্ধারিত ঘরখানার বারান্দায় উঠেই মনটা বিরক্তিতে ভরে উঠল। আধবুড়ো মত একজন লোক বারান্দায় উবু হয়ে বসে আছে। জোড়া করা দুটি হাঁটুর ওপরে মাথাটি নামান।

পাশেই মুখঢাকা একটি হাঁড়ি। দেখলেই বোঝা যায়—তার মধ্যে মিষ্টান্নাদি কিছু আছে। তা অজ্ঞাত উপহারের আনন্দে পুলকিত হবার মত মানসিক অবস্থা দিলীপবাবুর নয়। তিনি একটু অস্বাভাবিক কণ্ঠেই বলে উঠলেন: কে ওখানে?

লোকটি মাথা তুলে তাকাল। সত্যিই আধবুড়ো। মাথায় কাঁচা-পাকা অবিন্যস্ত চুল। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। ঘুমের ভাবটা কাটিয়ে অবস্থাটা মোটামুটি বুঝে নিয়ে লোকটি অপরাধীর মত উঠে দাঁড়াতেই নাট্যাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন: কী চাই?

লোকটি মিষ্টির হাঁড়িটা হাতে তুলে এক পা এগোতেই তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন: আমি কিছু চাইনি। তুমি কী চাও, তাই জিজ্ঞাসা করেছি।

লোকটি আরও এক পা এগিয়ে এলে তিনি আবার বললেন: ওটা থাক্। আমার এখন ভোজন-বিলাসের সময় নয়। কাকে চাও?

লোকটি মাথা নীচু করে বলল: আজ্ঞে, আমি সাবিত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

প্রশ্নকর্তার বিস্ময়ের সীমা নেই। তিনি মনে মনে ভাবলেন, কোন এক সত্যবান সাবিত্রীর খোঁজে দিশেহারা হয়ে অসময়ে অস্থানে এসে পড়েছে। তিনি বললেন: আমরা দু'একজন পাপী-তাপী মানুষ এখানে থাকি। এখানে সাবিত্রী বলে কোন পুণ্যবতী নেই।

লোকটি কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল—নড়ে না। লোকে বলে, বোবার শত্রু নেই। কিন্তু দিলীপ কুমারের শত্রুতা করবার ইচ্ছে হোল। তিনি বললেন: লোকজন ডাকতে হবে, না অমনি যাবে?

লোকটি বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে বলল: আপনি লোকজন ডেকে জিজ্ঞাসা করুননা। সাবিত্রী এখানেই থাকে।

নিরুপায় নাট্যাচার্য বললেন: এখানে কারা থাকে—তা আমি

জানি। তুমি অন্য কোথাও খুঁজে দেখ। সেখানে হয়ত সাবিত্রী, সত্যবানের অপেক্ষায় বসে আছে। ঐ মিষ্টির হাঁড়িটা নিয়ে সেইদিকে শুভযাত্রা করে তুমি আমাকে বাঁচাও। আমি বড় ক্লান্ত।

লোকটি তবু নড়ে না। মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকল। হঠাৎ কী ভেবে সে সচকিত হয়ে উঠে বলল : আজ্ঞে, আপনারা যাকে চারুশীলা বলেন, তার নামই সাবিত্রী।

গভীর রাতে কে যেন একখানা রহস্য উপন্যাসের পাতা নাট্যাচার্যের চোখের সামনে মেলে ধরল। তিনি লোকটির আপাদ-মস্তক ভাল করে দেখলেন। তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন : তা চারুশীলারূপী সাবিত্রীকে তোমার কী দরকার ?

: তিনি আমাকে দেখা করতে বলেছেন।

: তা এখানে তো আয়ান ঘোষ দাঁড়িয়ে। এখানে তার সঙ্গে দেখা করাটা সুবিধের কথা নয়। তারচেয়ে যথাযোগ্য ঠিকানাটা রেখে গেলে আমি যথাসময়ে সাবিত্রীকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেব। এখানে গণ্যমান্য লোক সব তার কৃপাপ্রার্থী। মিষ্টির হাঁড়ি-মাত্র সম্বল করে তোমার মত বিচিত্র পুরুষ তাঁদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

: আজ্ঞে, তার খুব বিপদ।

: তা বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদন মশায়-এর নামটা জানতে পারি কি ? নিবাস কোথায় ?

: আমার নাম—শ্রীঅম্বিকা চরণ গোস্বামী। নিবাস—বিষ্ণুপুরের কাছে এক গ্রামে।—নাট্যাচার্য সারাজীবন নটনটী নিয়ে কারবার করেছেন। তাদের জীবনের সঙ্গে কত যে রহস্য জড়িয়ে থাকে, তার ঠিক নেই। সেসব জটিলতা নিয়ে তিনি কোনদিন বিব্রত হননি। কত মান-অভিমান, কত হানাহানি, কত দল ভাঙ্গাভাঙ্গি, কত হত্যা-আত্মহত্যা পর্যন্ত তিনি দেখেছেন। কিন্তু জীবনের এই অধ্যায়টি তাঁর কাছে নিতান্তই করুণার যোগ্য। এসব গ্রন্থি অথবা জটিলতার

মধ্যে তাঁর কোন প্রশ্রয় নেই। মানুষের রক্তমাংসের দেহটার মধ্যে কিছু খিদে-তেষ্টার মত জৈব প্রয়োজন থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু তার মধ্যে হৃদয় নামক পদার্থটিকে নিয়ে টানাটানি করলে তা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তিনি দেখলেন, রহস্যের জট খুলতে গেলে রাতের বাকি অংশ শেষ হয়ে যাবে। তিনি বললেন: তা বিষ্ণুপুরের কাছে কোন এক গ্রাম-নিবাসী বিপদভঞ্জন শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ গোস্বামী মশায়, কিছুক্ষণ দয়া করে এখানে অপেক্ষা করলে পুণ্যবতী সাবিত্রীর দেখা পাওয়া যেতে পারে। এ অধীনকে দয়া করে মুক্তি দিলে, আমি দরজা বন্ধ করি।

এই কথা বলে তিনি ঘরের দিকে এগিয়ে যেতেই অম্বিকা চরণ তাড়াতাড়ি মিষ্টির হাঁড়িটা আবার এগিয়ে দিল।

নাট্যাচার্য মৃদু হেসে বললেন: এই করুণার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু বেনাবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই। ইতরজনে মিষ্টান্ন বিতরণ করে কী হবে? যথাসময়ে যোগ্যস্থানে এর সদ্ব্যবহার করো।

এই কথা বলে তিনি সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

* * *

চারুশীলার না-কি বড় বিপদ। সেই বিপদের কথা বলবার জন্যই সে প্রিয়নাথকে পরের দিন রাজবাড়ীর অতিথিশালায় দেখা করতে বলেছিল। প্রিয় দেখা করবার কথা না দিয়েই যখন চলে আসছিল, তখন চারু বড় মিনতির সুরে বলেছিল—কিছু না বলেই চলে যাচ্ছ যে বড়! চারু থিয়েটারের নটী। কত পুরুষের সঙ্গ করে। প্রিয়নাথ হয়ত তাদের মধ্যে একজন। তবুও সে চারুর কিছু একটা মিনতির কথা শুনলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিছু একটা কথা বলবার জন্য সে ফিরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সাজঘরের দরজায় নাট্যাচার্যকে দেখে ভয়ে সরে এসেছিল। কিন্তু চারুর কথাটা তার মনের মধ্যে অম্লান হয়েছিল। এদিকে থাকল সতী। তাকে বর্ধমান শহরটা ঘুরে দেখাতে হবে। তার জন্যই সেদিনটা সে থাকতে রাজি হয়েছে।

হৈম আবার সঙ্গ ধরবে কি-না কে জানে। যদি ধরে, তবে দু'খানা রিক্সা নিতে হবে। তা নিলে সে দুজনের মধ্যে কাকে সঙ্গদান করবে? তা সঙ্গদান করবার জন্য সে থাকেনি। দুজন যদি একান্তই সঙ্গ নেয়, তবে সে বিচার তখন।

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে প্রিয় রাজবাড়ীর অতিথিশালায় এসে হাজির হোল। তা রাজকীয় আতিথ্যই বটে। মস্ত বড় একখানা ঘরের দুই দিকে দু'টি মূল্যবান পুরণো দিনের পালংক। তার ওপরে যথাযোগ্য সুরচিত শয্যা। তারই একখানার ওপরে দিলীপবাবু শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছেন। প্রিয়নাথকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসে বইটি মুড়ে বললেন: এসো নাট্যকার! তোমার প্রতীক্ষাতেই বসে আছি।

দেখলেই বোঝা যায়, অন্য শয্যাটি চারুশীলার। সেটি কিন্তু শূন্য। প্রিয়নাথ এগিয়ে গিয়ে নাট্যাচার্যের পায়ের ধুলো নিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: পেয়েছ?

প্রিয়নাথ অবাক হয়ে বলল: কী?

: চরণধুলো? যা নেই, তার জন্যই লোকের যত ব্যাকুলতা। শ্রীচরণে যখন ধুলো থাকে না, তখন তারজন্য কাড়াকাড়ি। কিন্তু যখন যথেষ্ট ধুলো জমে যায়, তখন কেউ সেদিকে তাকিয়ে দেখে না।

: এসব আপনার কাছে তামাসা হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে নয়।

: তামাসা হতে যাবে কেন! রীতিমত সিরিয়াস ব্যাপার। এবার তোমাদের মত ভক্তদের দানযোগ্য চরণধুলোর আর অভাব হবে না। তোমাদেরই দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়াতে হবে। চরণধুলো দেবার জন্য নয়। দু'মুঠো অন্নের জন্য।

পরিহাস-প্রিয় নাট্যাচার্যের রসিকতা মনে করে প্রিয়নাথ একটু হাসল। তখন দিলীপবাবু বললেন: হাসির কথা নয়, নাট্যকার। সেই তোমার লেখা নাটক দেখেছিলাম; তার বাকি অংশ লেখার রোমাঞ্চকর তথ্য একেবারে তোমার হাতের কাছে উপস্থিত।

মাথা নীচু করে প্রিয় বলল: নাট্যকার ছাড়া কি আমার আর কিছু পরিচয় নেই?

: ঐ পরিচয়টাই আমার কাছে অক্ষয় হয়ে থাক। শেষ দৃশ্য লিখবে না?

প্রিয়নাথ বিব্রত হয়ে বলল: কী কুক্ষণে আমি নাটকখানা লিখেছিলাম! আমার দুর্ভাগ্য—আপনি আজও তা ভুলতে পারলেন না।

: ভুলব কেন? তোমার সেই নাটক আমার অবশিষ্ট জীবনের দুর্দিনের সম্বল। তার মধ্যে আমার প্রতি তোমার প্রাণের স্পর্শ অনুভব করেছি।

: কিন্তু প্রথম দিনের সাক্ষাৎকারে মনে হয়েছিল—আপনি বিরক্ত হয়েছেন।

: তা মানুষের মন কি চিরদিন একরকম থাকে, নাট্যকার? সেদিন আর আজকের দিনে অনেক প্রভেদ। সেদিন আমার সব ছিল। আজ আমার কিছু নেই। এ সর্বহারার বিলাপ। সেদিন ঈশ্বর-চিন্তাকে বিলাসিতা মনে করতাম। কিন্তু আজ মনে হয়—ইফ্ আই কুড হ্যাভ বিলিভড্।

নাট্যাচার্য চিরদিনই রহস্যময় কথা বলেন। কিন্তু এ কথাগুলো যেন তাঁর কোন এক অন্তরের নিভৃত বেদনার উৎস থেকে অশ্রুর মত ফোঁটা-ফোঁটা ঝরে পড়ছে। প্রিয়নাথ বেদনাভরা বিস্ময়ে নাট্যাচার্যের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তিনি আবার বললেন: তুমি বলেছিলে, তোমাদের বাড়ীতে আমার মস্ত বড় ফটো আছে। তা ফটো দেখে আর আনন্দ করতে হবে না। হয়ত আশ্রয়ের সন্ধানে একদিন তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হব।

: আমিত বলেছি—সে আমাদের সৌভাগ্য।

: তাহলে সেই সৌভাগ্যের জন্য তৈরি হও। আমার আর যাবার জায়গা নেই। মঞ্চ থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রিয়নাথ যেন আর্তনাদ করে উঠল: একথা কি সত্যি? না পরিহাস?

নাট্যাচার্য গম্ভীর হয়ে বললেন: অভ্রান্ত সত্যি।

: এও কি সম্ভব?

: সম্ভব নয় কেন? আমি মঞ্চের ভাড়া দিতে পারি না। ধার-দেনায় ডুবে আছি। ওরা বলছে—আমি না-কি মদ খেয়ে সব উড়িয়েছি! কিন্তু ওরা জানেনা, আমি মদ্যপান একেবারে ছেড়ে দিয়েছি।

: আমি সেকথা শুনেছি। কিন্তু মদ খেলেও মানুষ কত মদ খেতে পারে। তাতে কত পয়সা লাগে? আপনার মঞ্চের আয়তো দুটো-চারটে পয়সা ছিল না!

নাট্যচার্য গম্ভীর হয়ে বললেন: নাট্যকার, লক্ষ-লক্ষ টাকা আমি রোজগার করেছি। দেশের মানুষ অকৃপণ ভাবে আমাকে টাকা ঢেলে দিয়েছে। তবুও অর্থাভাবে আমি বারবার ব্যর্থ হয়ে গেলাম। আমার নিজের চালচুলো কিছু নেই। কত পয়সার মদ আমি খেয়েছি! তা নয়। বিরাট একটা পরিবারের অনেকগুলো মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে হাঁ করে থাকে। তাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে হয়। অনেকের মুখে আবার মদও ঢেলে দিতে হয়।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললেন: দোষ দেব কাকে? থিয়েটার বাড়ীর ভাড়া বাকি পড়তে লাগল। একটার পর একটা নাটক ফ্লপ করতে লাগল। দেহতো আর চিরদিন জীবন-যৌবনকে ধরে রাখতে পারে না!

প্রিয়নাথ অনেক উত্তাপ নিয়ে এসেছিল। চারুর সঙ্গে দেখা করবে। চারু তাকে আপনজন ভেবে বিপদের কথা শোনাবে বলে আসতে বলেছে। সেই চারুশীলার সঙ্গে দেখাই হোল না এখনও। তার আগেই এ কী বিচিত্র মর্মান্তিক সংবাদ। তবে কি চারু এই বিপদের কথাই বলবে ভেবেছিল। কিন্তু কলকাতার রঙ্গজগৎ যে

রাতারাতি রাস্তায় এসে দাঁড়াল। থিয়েটার বাড়ীর ভাড়াটাই সংসারে সব থেকে বড় কথা হোল ?

সে বলল : আমার মনে হয়—আবার কোন অর্থবান লোক আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে। এমন তো আগেও হয়েছে—শুনেছি।

: আর তা হবে না। হবে কী করে ? "বাইরে এই অদ্ভুত মনীষা দেখছ। কিন্তু আমার হৃদয় চিরে দেখ বন্ধু। এ এক শুষ্ক মরুভূমি—এক কণা করুণা নেই, স্নেহ নেই, বিশ্বাস নেই, শাঁস নেই, খোসা নিয়ে কি করব ?"

প্রিয়নাথ বুঝতে পারল—"চন্দ্রগুপ্ত" নাটকের সেই সর্ব পরিচিত চাণক্যের সংলাপ। অপহৃতা কন্যাকে ফিরে পাবার আগে চাণক্য অধীর হয়ে উঠেছিল। নাট্যাচার্যও কিছুর একটা অভাবে ভেঙ্গে পড়েছেন। এত মান যশঃ প্রতিষ্ঠা কিছুই তাকে তৃপ্ত করতে পারেনি। হৃদয়ের মধ্যে এতদিনে একটা হাহাকার এসে হাজির হয়েছে। প্রিয়নাথের মনটাও যার পর নাই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। দিলীপবাবু বললেন : ইচ্ছে হয়, বাঁ হাত দিয়ে ইস্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডের মত অতীত জীবনের আঁকিজুকি সব মুছে দিয়ে আসি। আচ্ছা তুমি কি মনে কর, আমি আবার উঠতে পারব ?

এবার কিন্তু প্রিয়নাথ আর মিথ্যে ভরসা না দিতে পেরে মাথা নীচু করল। দিলীপবাবু বললেন : থ্যাঙ্ক ইউ, নাট্যকার। এই সত্য ভাষণের জন্যই তোমাকে শ্রদ্ধা করি।

প্রিয় বলল : আমাকে অপরাধী করবেন না।

: তা না হয় না করলাম। কিন্তু একটা কথা বল। আমি ব্যর্থ হলাম কেন ? কিছুই করে যেতে পারলাম না। না নিজের জন্য, না দেশের জন্য।

: নিজের জন্য কী করেছেন না-করেছেন, তা বলতে পারব না। কিন্তু দেশকে যা দিয়েছেন, দেশবাসী তা চিরদিন মনে রাখবে।

: তাই কি থাকবে মনে কর? কিছুই থাকবে না। নিজের চোখের সামনে চরম ব্যতিক্রম দেখেও সহ্য করতে হয়েছে। তা কোনদিন দেখনি?

: দেখোছ। কালও দেখেছি।

: আমার সব শিক্ষা সব উপদেশকে অবহেলা করে নিজের মনের মাধুরী দিয়ে আপন প্রতিভা বিকাশ করতে লাগল। তাতেই হাততালি, তাতেই অভিনন্দন। এইসব দেখেই রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন—তোমরা আগে দর্শক তৈরি কর।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য প্রিয়নাথ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল: অপরাধ না নিলে একটা কথা জানতে বড় ইচ্ছে করে। জীবনব্যাপী এত কাব্য, এত নাটক, এত সাহিত্য নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন—সে কথা সকলেই জানে। কিন্তু একটা কথা কেউ জানে না—আপনি কোনদিন ভালবেসেছেন কি-না।

নাট্যাচার্য বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বললেন: বিচিত্র হলেও প্রশ্নটি কৌতুকপ্রদ। রবীন্দ্রনাথ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, ভালবাসা ছাড়া আর্ট হয় না। সেইদিন থেকে আমি ভালবাসা খুঁজতে লাগলাম।

প্রিয়নাথ মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল: তা খুঁজে পেলেন?

: পেয়েছিলাম। তা না পেলে এতবড় আর্ট সৃষ্টি হোল কী করে! রবীন্দ্রনাথের কথা কি মিথ্যে হবে? আমি ভালবাসলাম। কিন্তু সে ভালবাসার সঙ্গে নারীর কোন সম্পর্ক নেই। আমি শিল্পকলাকে ভালবাসলাম। স্ত্রীলোক বিষয়ে কিছু একটা প্রয়োজন-বোধ থাকলেও কোন গভীর অনুরাগ আমি কোনদিন বোধ করিনি। ওটা দেহের প্রয়োজন, মনের নয়।

: কোনও দিনই নয়? যৌবনেও নয়?

নাট্যাচার্য মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন: আবার এ অধীনের বিষয়ে নতুন কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছ না-কি?—এই কথা বলেই

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মৃদু হেসে বলতে আরম্ভ করলেন: তখন আমার খুব নাম-ডাক। দেশের ইতর-ভদ্র সকলে আমার নট-প্রতিভায় মুগ্ধ। প্রশস্তি করে ছ'চারখানা চিঠিও পেতাম। তার মধ্যে স্ত্রীলোকের চিঠিও থাকত।

: তারই মধ্যে একখানা বুঝি বিশেষ প্রকৃতির ছিল?

: সত্যি তাই। চিঠিখানিতে অনেক প্রশস্তির অবগুণ্ঠনে একটি কামনার ছবি ফুটে উঠেছিল।

: তার পরে?

: থিয়েটার দেখার নাম করে এসে একদিন সেই গৃহবধূ ছলছুতো করে আমাকে দর্শন দিয়ে গেল। দেখলাম—অপূর্ব রূপবতী নারী। প্রখর বুদ্ধি। সংবাদ নিয়ে জানলাম, বিত্তশালী পরিবারের বৌ। তখন আমি বাজারের নটী নিয়ে অভিনয় করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ধরা দিলাম।

: তার গার্হস্থ্য জীবন বাধা দিল না?

: দিল না—দেখলাম। বোধহয় বহু নারী সম্ভোগে ক্লান্ত স্বামীর কাছে এ এক নতুন জগতের হাতছানি।

: তখনও চারুশীলা আসেনি, মনে হয়?

: সেই নারীই চারুশীলা।

প্রিয়নাথের মনে পড়ল, চৌধুরী বলেছিল—সে চারুকে সেনেদের বাড়ীতে বৌ করে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বাজি পুড়িয়ে, আলো জ্বেলে, পুরুতের মন্ত্র বলিয়ে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু চারু বড় কর্তার সঙ্গে ঢলাঢলি করে সেনেদের বাড়ীর সকল অবরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল। প্রিয়নাথ শুনতে চায়নি। তবু চৌধুরীবাবু চারুর চরিত্র বোঝাতে গিয়ে সেই বিষ্ণুপুরের হোটেলে বসে বসে এইসব কথা বলেছিল। চাওয়া আর পাওয়া এক জিনিষ নয়। একদিন মানুষ যা চায় না, অন্যদিন তাই আবার কান পেতে শুনতে হয়।

নাট্যাচার্য আবার আরম্ভ করলেন: চারু যখন চলে এলো, তখন

তার হাতে ঝকঝকে শাঁখা আর সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—যার দুয়ার ভেঙ্গে চলে এলে, তারই পতাকা বয়ে বেড়াতে থাকলে যে!—তা চারু, সে কথার উত্তর দেয়নি। আমার মনে হয় ওর অন্যত্র কোথাও অন্য কিছু দুর্বলতা ছিল। তারই চিহ্ন ও দেহ থেকে কোনদিনই সরিয়ে দিতে পারেনি।

এতক্ষণেও চারু এলো না দেখে প্রিয়নাথ অবাক হয়েছিল। এমন সময়ে একজন দাসী জাতীয় স্ত্রীলোক এসে শ্বেত পাথরের মেজেটা জল ছিটিয়ে হাত দিয়ে মুছে একটি মূল্যবান আসন পেতে দিল। তারপরে অন্য একজন একটি রূপোর থালায় না-না প্রকার মিষ্টান্ন এনে আসনের সামনে রাখল। একটি রূপোর গ্লাসে জল দিল। প্রিয়নাথ ভাবল—রাজকীয় আতিথ্যের মর্যাদাই বটে। তারপরে ভদ্রলোকজাতীয় একজন এসে হাতজোড় করে বলল: একটু জলযোগ করুন।

প্রিয়নাথ সেইসব আয়োজনের দিকে তাকিয়ে চারুশীলার নিষ্ঠা দেখে অবাক হয়ে গেল। এতক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা না করে তার সেবাতেই মগ্ন হয়ে আছে। নারীজাতির এ বুঝি সহজাত নিষ্ঠা। সে বলল: চারু বুঝি এতক্ষণ এইসব নিয়েই ব্যস্ত হয়ে আছে?

নাট্যাচার্য অবাক হয়ে বললেন: চারু? চারু কোথায়? তুমি জান-না?

প্রিয়নাথ আকাশ থেকে পড়ল। সে কোন কথা বলতে পারল না। শুধু বিস্ফারিত চোখ দু'টি মেলে নাট্যাচার্যের দিকে তাকিয়ে থাকল।

নাট্যাচার্য বললেন: আমি ভেবেছিলাম—তুমি সব জান!

অনেক কষ্টে প্রিয়নাথ বলল: আমি কিছুই জানি না। আমি তো তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। তার না-কি খুব বিপদ। সে আমাকে আজ সকালে দেখা করতে বলেছিল।

নাট্যাচার্য বিমর্ষভাবে বললেন : চারুতো নেই।

এ আবার কী বিচিত্র কথা! 'নেই' কথাটার কত অর্থ হয়। "চারু নেই" কথাটার অর্থ কী—তা জিজ্ঞাসা করবার শক্তি প্রিয়নাথের নেই। কাল সে মঞ্চের ওপরে সংলাপ বলতে বলতে লুটিয়ে পড়েছিল। তারপরে প্রিয়নাথ কোন সংবাদ নেয়নি। তারপরেই এই কথা। চারুর অস্তিত্ব যদি পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে থাকে, তবে সে কথা প্রিয়নাথের জেনে আর কাজ নেই। সে শুষ্ক চোখদুটি দিয়ে নাট্যাচার্যের মুখখানা দেখতে লাগল। সে দৃষ্টি যে প্রাণহীন। মরা-মানুষের তাকানর মত।

* * *

সৌর জগতে গ্রহ উপগ্রহ নিজ নিজ কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। কে তাদের কবে সৃষ্টি করেছিল, কে তাদের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চার করেছিল, কবে তাদের আবর্তন আরম্ভ হয়েছিল—সেসব কথা প্রিয়নাথ জানে না। ভাবতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু কূল-কিনারা পায়নি। তা না পেলেও এ কথাটা জানে—সেইসব গ্রহ উপগ্রহদের একটির সঙ্গে আর একটির নাকি প্রবল আকর্ষণ আছে। তা থাকলেও একে অন্যের একান্ত সান্নিধ্যে যায় না। ব্যবধান বজায় রাখে। তা না রাখলে ঠোকাঠুকি হয়ে সৃষ্টি কোনকালে রসাতলে চলে যেত। এ সৃষ্টিকর্তার বিধান। তাঁর সাধের সৃষ্টিরক্ষার উপায়। শুধু গ্রহ-উপগ্রহ নয়। মানুষের ক্ষেত্রেও বুঝি বিধাতার একই বিধান মেনে চলতে হয়। না মানলে অমঙ্গল। চারুশীলাকে না পেয়ে সেই ব্যর্থতার মধ্যে প্রিয়নাথ মঙ্গলময়ের এই বিধান আবিষ্কার করে বসল।

বর্ধমানের রাজবাড়ীর অতিথিশালায় প্রিয়নাথ যখন হাঁ করে বোকার মত নাট্যাচার্যের মুখের দিকে তাকিয়েছিল, তখন তিনি চারুশীলার প্রস্থান-কাহিনী বলেছিলেন। দিলীপবাবু নাটক করে-করে নাট্যাচার্য হয়েছেন। প্রিয়নাথ নিজেও সখের থিয়েটার করে। চমকপ্রদ প্রবেশ-প্রস্থান তাদের অজানা নয়। কিন্তু চারুশীলার

প্রস্থানপর্ব যেমন আকস্মিক তেমনই চমকপ্রদ। এতদিন পরে সেই অম্বিকাদা কোত্থেকে মিষ্টির হাঁড়ি হাতে নিয়ে গভীর রাত্রে বর্ধমানের রাজবাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সে হাঁড়ির মধ্যে কী মিষ্টি ছিল কে জানে! চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের সন্দেশ আর নারকেলনাড়ুই ছিল বোধহয়। কিংবা অন্য কিছু-সময়ের ব্যবধানে মিষ্টির চরিত্র। বদল অসম্ভব নয়। গড়পার রোডের সেই মেসবাড়ীতে যখন সোমবারে সোমবারে অম্বিকাদা মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে আসতেন, তারপরে কতকাল গত হয়েছে। কোথায় চলে গিয়েছিলেন অম্বিকাদা। তারপরে চারুর বিপদের দিনে এসে হাজির হয়েছেন। চারুর আপনজনেরা বর্মায় আটকা পড়েছে। বর্মা মৃত্যুকূপ হয়ে উঠেছে। সেখান থেকে কাতারে কাতারে লোক প্রাণের দায়ে প্লেনে জাহাজে পায়ে হেঁটে—যে যেভাবে পারে চলে আসছে। সত্যনারায়ণ চৌধুরী তাঁর স্ত্রী আর মেয়ে সতীকে নিয়ে চলে এসেছেন। সেই মৃত্যুকূপে চারুর এক দিদি রয়েছে। সেই দিদির রূপ নেই বলে বিয়ে হোল না। সেই রূপহীনা দিদিকে বিয়ে করলে চারু প্রিয়নাথের ওপরে সব দাবী ছেড়ে দেবে। নিজের মনেই চারুশীলা প্রিয়নাথের ওপরে নিজের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে।

দিলীপবাবু বলেছিলেন, অম্বিকা নামে সেই লোকটি চারুকে নিয়ে বর্মায় গিয়ে তার দিদিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। বর্মায় যাওয়া সহজ কথা নয়। ঘোরতর যুদ্ধ চলছে। যাতায়াত বন্ধ। চারু অম্বিকাকে বলে দিয়েছিল মলয় সেনের কথা! যে মলয় সেনের দুয়ার ভেঙ্গে সে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সেই মলয় সেনই নাকি অম্বিকাকে ভরসা দিয়েছে যে, সে বর্মা যাবার ব্যবস্থা করে দেবে। তার অনেক টাকা। অনেক প্রতিপত্তি। বড় বড় মিলিটারী সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা। যুদ্ধের কেনাবেচা করে আরও টাকা হয়েছে। মলয় সেনের চরেরা ব্যাফল ওয়ালের পেছনে অন্ধকারে ঘোরাঘুরি করে আর মলয় সেন নিজে বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে

মেলামেশা করে। দিনরাত্রি ভেদাভেদ নেই। রাতে ব্ল্যাকআউটের অন্ধকার যত গভীর হতে থাকে, মলয় সেনের অন্তরঙ্গতা তত গভীর হয়। অমন কত মলয় সেন কলকাতায় জন্ম নিয়েছে। যুদ্ধ একদিন মিটে যাবে। সেদিন মলয় সেনের বংশধরেরা সত্যযুগের ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতাপ নিয়ে বিরাজ করতে থাকবে। তারা দিনকে রাত আর রাতকে দিন করতে পারে। সেই মলয় সেন বর্মা যাবার ব্যবস্থা করে দেবে—এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। হয়ত তারজন্য কিছু মূল্য দিতে হবে। তা চারুশীলা অনেক সম্পদ নিয়ে বসে আছে। কড়ায়-গণ্ডায় দাম মিটিয়ে দেবে।

নাট্যাচার্য অম্বিকাকেও জানেন না, মলয় সেনকেও চেনেন না। তিনি যা শুনেছেন তা আপন মনে প্রিয়নাথকে বলেছেন। যাবার আগে তারা না-কি সেই অম্বিকার দেশের বাড়ীতেও একবার যেতে পারে। বিষ্ণুপুরের কাছে কোন এক গ্রামে না-কি অম্বিকার বাড়ী। নাট্যাচার্য জানেন না যে, ঐ অম্বিকার ঘরের মধ্যে মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন অম্বিকা-চারুর ফটো আছে। সেই ঘরেরই বারান্দায় শোওয়া চৌধুরীকে গভীর রাত্রে ডেকে তুলে নিয়ে চারুশীলা ঘর ছেড়েছিল। তার পরে দুইজনে মলয় সেনের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হয়েছিল। সেসব কথা প্রিয়নাথ জানে। চৌধুরী বলেছিল। প্রিয়নাথ শুনতে চায়নি। তবুও চৌধুরী বলেছিল। অনেকদিনের অনেক কাটা-ছেঁড়া কথার মধ্য থেকে প্রিয়নাথ সেইসব কথা জানতে পেরেছে। কে জানত, সেই ইতিহাসের সঙ্গে প্রিয়নাথের ভবিতব্য এমনভাবে জড়িয়ে যাবে।

বর্ধমানের রাজবাড়ী থেকে বেরিয়েই সে সোজা স্টেশনে গিয়ে বিষ্ণুপুরের দিকে যাবার ট্রেন ধরেছিল। সতীকে কথা দিয়েছিল বর্ধমান দেখাবে। সে যে কী দুর্বিসহ প্রতীক্ষা নিয়ে বসে থাকল— তা প্রিয়নাথ জানত। কিন্তু সে বড় অসহায়। পাঠান-মোগল-ইংরেজের কত ইতিহাস বুকে নিয়ে বর্ধমান পড়ে থাকল; অতৃপ্ত

কামনা-বাসনা বুকে নিয়ে মাটির নীচে শের আফগানের কবর পড়ে থাকল; একটা অবজ্ঞাত কোণে সতীও পড়ে থাকল। প্রিয়নাথ সকলের অজ্ঞাতে রওনা হোল বিষ্ণুপুরের পথে। যদি চারুশীলার দেখা পাওয়া যায়। সেই থিয়েটারের নটী চারুশীলা—যাকে বৌ সাজিয়ে সে বিষ্ণুপুরে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রিয়নাথ যখন শ্রান্তক্লান্ত হয়ে অম্বিকার বাড়ীটাতে উপস্থিত হোল, তখন প্রদোষের প্রায়ান্ধকার। তালা-লাগান ঘরটি দেখে প্রিয়নাথ বুঝতে পারল, কিছুদিনের মধ্যে সেখানে মানুষের পায়ের চিহ্ন পড়েনি। অপরিচিত পাড়া-গাঁ জায়গা। সেই কবে একদিন এসেছিল। সেদিন তাকে দেখে অম্বিকা বড় বিরক্ত হয়েছিল। বলেছিল—তোদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। না-বলে না-কয়ে এসে হাজির হয়েছিস কেন? সেদিন প্রিয়নাথ কী বিপদে যে পড়েছিল—তার ঠিক নেই। বৌদির হাতের মিষ্টান্ন খেয়ে খেয়ে বৌদিকে একবার চোখের দেখা দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু সে কী বিপত্তি, বৌদিকে দেখতে পায়নি। কিন্তু ঘরের মধ্যে মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন অম্বিকা-চারুশীলার ফটো দেখেছিল। সেদিন প্রিয়নাথ চারুকে জানত না। তারপর একদিন অভিনেত্রীরূপে চারুকে সশরীরে দেখে চমকে উঠেছিল। সেই চারু তাকে এমন বিপাকে ফেলবে—তা সে ভাবতে পারেনি। তার থিয়েটার-জীবনে কত অভিনেত্রী এসেছে—গেছে। কিন্তু একী!

জানা নেই, চেনা নেই—অপরিচিত জায়গা। ওদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে লাগল। জিজ্ঞাসা করবে—এমন একটা লোকও নেই। নাট্যাচার্য বলেছিলেন, বর্মা দেশে রওনা হবার আগে তারা হয়ত একবার অম্বিকার দেশের বাড়ীতে যেতে পারে। তাই সে এখানে ছুটে এসেছে। কেন এসেছে—তাও সে ভাল জানে না। একটা মাতালের অবস্থা। চারুই বা কে আর অম্বিকাই বা কে। তারা যদি বর্মায় যায় তবে যাকনা। তাতে প্রিয়নাথের কী এসে

যায়। কিন্তু কিছু এসে যায় না—একথা মুখে বললে সবকিছু মিটে যায় না। তাই সে আবার বিষ্ণুপুর স্টেশনে এসে হাজির হোল।

আহার নেই, নিদ্রা নেই। প্রায় অচল দেহটা নিয়ে সে গড়পার রোডের মেসে, জাহাজ ঘাটে—কোন জায়গাতেই অম্বিকা বা চারুশীলার কোন সন্ধান পেল না। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হোল, অম্বিকা আর চারুশীলা বর্মার পথে পাড়ি দিয়েছে। সে পথের ব্যবস্থা করে দিয়েছে কোন এক মলয় সেন। সে ব্যবস্থার মূল্য হয়ত চারুকেই দিতে হয়েছে। কী সে মূল্য তা প্রিয় জানে না। সে মলয় সেনকেও চেনে না।

অচল দেহটা টানতে টানতে প্রিয়নাথ যখন বাড়ী ফিরে সিঁড়ি ভেঙ্গে তিনতলায় পৌঁছাল, তখন প্রসন্নবালা রেকাবিতে পূজোর প্রসাদ নিয়ে ছাদের ঠাকুরঘর থেকে নেমে আসছেন। প্রিয়নাথকে দেখে তিনি চমকে উঠে বললেন: হ্যারে প্রিয়, তুই কোথায় ছিলি? শনিবার রাত্রেই ফিরে আসবে ছেলে, সেই ছেলের আর খোঁজ নেই! এদিকে অফিস থেকে লোক এসে হাজির। তাকেই বা কী বলি, আর নিজেই বা কী বুঝি!

প্রিয়নাথ ততক্ষণে মাথাটি নীচু করে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে সিঁড়ির রেলিং-এ অক্ষর পরিচয়ের লেখা অভ্যেস করতে আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ প্রসন্নবালার মুখে বিরক্তির বদলে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তিনি প্রসাদের রেকাবিটা বাঁ হাতে নিয়ে ডান হাত প্রিয়নাথের কপালে রেখে উদ্বেগের কণ্ঠে বলে উঠলেন: একি! ছেলের গা যে পুড়ে যাচ্ছে!

প্রিয়নাথ ততক্ষণে মাতৃসমা বড় বৌদির বুকের ওপরে ঢলে পড়েছে।

* * *

প্রসন্নবালা বলেছিলেন যে, প্রিয়নাথের গা পুড়ে যাচ্ছে। তা

পুড়ে না গেলেও তার দেহখানা ঝলসে গেছে। সে ঝলসান শরীরটা নিয়ে প্রিয়নাথ একদিন অফিসে গিয়ে হাজির হোল। করিডর দিয়ে ক্লান্ত চরণে এগিয়ে যেতেই যুক্তিপ্রসাদ তাড়াতাড়ি টুল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতের তর্জনীটা কপালে ঠেকিয়ে বলল: বড়া সাব আপকা লিয়ে পাগলা হো গিয়া।

প্রিয়নাথের শরীর সম্বন্ধে যুক্তিপ্রসাদ হয়ত কিছু দরদমাখা কথা বলত। কিন্তু তার অবসর না দিয়ে প্রিয়নাথ দরজা ঠেলে ব্রিগেডিয়ার ফাউলারের ঘরে ঢুকে পড়ল। সাহেব মাথা নীচু করে ফাইলে কী লিখছিলেন। না দেখেই কী করে প্রিয়নাথ বলে বুঝতে পারলেন কে জানে। মাথা নীচু করেই লিখতে লিখতে জিজ্ঞাসা করলেন: হোয়াট হ্যাপেনস উইথ ইউ?

প্রিয়নাথ কিছু না বলে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। এতক্ষণে প্রিয়নাথের মুখের দিকে তাকিয়ে সাহেব উদ্বেগের কণ্ঠে বললেন: আর ইউ ষ্টীল সিক? বেটার টেক ফারদার লীভ।—এই কথা বলেই সাহেব আবার কাজে মন দিলেন। ফাইলের মধ্যে হয়ত প্রিয়নাথের সিকনেস অপেক্ষা গুরুতর বিপর্যয়ের কথা আছে। প্রিয়নাথ চলে আসছিল। সাহেব আবার মুখ না তুলেই অনেকটা আপন মনে বললেন: ইউ মে হ্যাভ টু প্যাক আপ।—প্রিয়নাথ একথার কিছু অর্থ খুঁজে পেল না। কিছু না বুঝেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সাহেবের সব কথা সব সময় বোঝা যায় না। জিজ্ঞাসাও করা যায় না। ক্রমে অন্যভাবে সেকথা অন্য সময়ে পরিষ্কার হয়ে যায়।

প্রিয়নাথ সেকসনে ঢুকতেই অনেকেই আস্তে আস্তে নিজ-নিজ জায়গা ছেড়ে উঠে তার কাছে চলে এলো। মধুসূদন মল্লিক, সুধীন দাসগুপ্ত, অনন্ত স্বামী, শম্ভু কর্মকার, অজিত সিংহ, অনিল চক্রবর্তী, ধীরেন দে—এরা সকলেই। থিয়েটারের কর্তাব্যক্তিরাও এলো। পৃথ্বীশ গাঙ্গুলী, অমল ঘোষ, মথুরা চট্টোপাধ্যায়, যতীশ মিত্র, অনিল নন্দী

এই সব। সকলেরই চোখে-মুখে উদ্বেগ। তার অসুস্থতার কথা সকলেই শুনেছে। চেহারাতেও সে চিহ্ন প্রকট হয়ে আছে। সকলেই উদ্বিগ্ন। প্রিয়নাথ সকলকে সহানুভূতির জন্য বিনয়নম্র কথায় ধন্যবাদ জানাল। একে একে সকলে সরে গেলে সুধীন, অজিত আর ধীরেন থাকল। প্রিয়নাথ বুঝতে পারল—কিছু একটা গোপনীয় কথা আছে। তা কথাটা যেমন গোপনীয় তেমনই চিন্তার বিষয়। এ আবার কী আপদ! প্রিয়নাথকে না-কি এলাহাবাদে বদলী করেছে। খুব গোপন সংবাদ। তার কোন এক আত্মীয় নাকি সন্ত্রাসবাদীদের দলে ছিল। তারই পরিণাম। সুধীন বলল: ঐ শালা গ্রেহাম সাহেব হারামীর বাচ্চা। ও আপনার চাকরি তো খেতই, জেলেও দিতে পারত। এখন যুদ্ধ চলছে। কে আটকাবে?

ধীরেন বলল: গ্রেনার সাহেব, হাম্বারস্টোন সাহেব, ঝা সাহেব, মুখার্জী সাহেব—সকলেই আপনার চাকরি খাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। গ্রেহাম সাহেব তো পারলে তখনই আপনাকে গারদে পুরে ফেলে আর কি!

অজিত তাড়াতাড়ি বলল: কিন্তু সকলের সকল আনন্দ নিমেষে অন্তর্ধান করল। ফাউলার সাহেবের এক ধমকে সকলে একেবারে কাপড়ে-চোপড়ে।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করল: তা এতসব গোপনীয় কথা তোমরা কী করে জানলে?

ধীরেন আর অজিত ফিস-ফিস করে একসঙ্গে বলল: এসব সুধীনদার কাজ। মিস ব্রাউডির কাছ থেকে শুনেছে।

প্রিয়নাথ সুধীনের দিকে তাকাল। মিস ব্রাউডির সঙ্গে সুধীনের এতখানি অন্তরঙ্গতা হোল্ল কবে? সেই যে মিস ব্রাউডি দেহে যৌবন-তরঙ্গ তুলে প্রিয়নাথকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, সেই তো প্রথম দু'জনের দূর থেকে দেখা। সুধীনের নয়ন-বিমোহন চেহারাখানাই তাহলে মিস ব্রাউডির সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সোপান তৈরি করে দিয়েছে।

প্রিয়নাথের এক আত্মীয়—নাম, অনিল কুমার ভাদুড়ি টেররিষ্ট দলে নাম লিখিয়ে কোন ভারত-বিদেশীকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই আত্মহত্যা করেছিল। তার চিহ্ন পর্যন্ত সেই কবে দেশের ধূলোমাটি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবু সেই প্রতিশোধের খড়্গ অসহায় প্রিয়নাথের ওপরে এসে পড়েছে। অনিলের ভূতটা যেন প্রিয়নাথের ওপরে ভর করে ভারতে ব্রিটিশের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে। সাহেবদের তাই নিয়ে শঙ্কার শেষ নেই। এমন কি ঝা সাহেব, মুখার্জী সাহেবের ভয়টা যেন আরও বেশী। ভয় নেই ব্রিগেডিয়ার ফাউলার সাহেবের। তাঁর এক ধমকে সকলের ভূতের ভয় ছেড়ে গেছে। তা স্বয়ং সেই ফাউলার সাহেবই বললেন—ইউ মে হ্যাভ টু প্যাক আপ। মাষ্ট শব্দটি তিনি ব্যবহার করেননি। হয়ত প্রিয়নাথের রোগক্লিষ্ট মুখখানা দেখে তাঁর দয়া হয়েছিল। তা মুখে রোগের ছাপ তো চিরদিন লেগে থাকবে না। একদিন প্রিয়নাথ স্বাভাবিক হয়ে উঠবে। সে এলাহাবাদে চলে গেলে ব্রিটিশ সরকারের রাতের অনিদ্রা দূর হবে। সন্ত্রাসবাদীরা শেষ হয়ে যাবে, হিটলার রণে ভঙ্গ দেবে, জাপানীরা বর্মা থেকে পালিয়ে যাবে। ভারতে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় হবে। সবকিছু অপেক্ষা করে আছে একমাত্র প্রিয়নাথের এলাহাবাদ চলে যাবার প্রতীক্ষায়। সুতরাং তার শুভযাত্রা রোধ করবে কে? কেউ নেই। তা না থাক। প্রিয়নাথের মনে হতে লাগল, এলাহাবাদ কেন—সে যে কোন অন্ধতম রসাতলে চলে গেলেও তাকে ধরে রাখবার ব্যাকুলতায় টানাটানি করবার কেউ নেই আর।

*　　　*　　　*

প্রিয়নাথের স্বাস্থ্যের জন্যই হোক অথবা যে কারণেই হোক, তার বদলীটা কিছুদিন স্থগিত ছিল। বোধহয় ব্রিগেডিয়ার ফাউলার সাহেবের দয়া। মুখে তো কিছু বলেন না। যা করেন—নীরবে। প্রিয়নাথ বুঝতে পারে, সাহেবের মনে কিসের একটা যন্ত্রণা। ঘোরতর

যুদ্ধ চলছে। ব্রিটিশের নাভিশ্বাস উঠেছে। কথা প্রসঙ্গে সাহেব মাঝে মাঝে বলে ওঠেন : আই অ্যাম এ্যাফ্রেড, দি ওয়ার ইজ অন।—শেষ পর্যন্ত দিনঃস্থির হয়ে গেল। সাহেব বললেন, তিনিও নাকি হোমে চলে যাচ্ছেন। আর অফিসে কলম পেষা নয়। একেবারে যুদ্ধক্ষেত্রে।

সাহেব দেশে চলে গেলেন। এদিকে প্রিয়নাথেরও রওনা হবার পথে অন্তরায় বড় কিছু একটা নেই। আনন্দলালের বিয়ে হয়ে গেল। যে মেয়ে প্রিয়নাথরা দেখে এসেছিল, সেই মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে। কিন্তু আনন্দ তার পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী গৃহত্যাগ করেনি। চারুশীলার ব্যাপার মিটেছে। সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। অম্বিকাদাও তাই। সতীকে বর্ধমান দেখাবে বলে আশা দিয়ে বসিয়ে রেখে এসেছিল। তার সঙ্গে আর দেখাটাও হোল না। রাণী বৌদি অখণ্ড প্রতাপে সংসার চালিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের বাজারে নন্দদুলাল বিরাট চাকরি যোগাড় করেছে। প্রসন্নবালা নতুন পুত্রবধূ নিয়ে সংসারে নতুন আস্বাদন লাভ করেছেন। দুলালচন্দ্রের বৈঠকখানায় বরুণবাবু কানের পেছনে হাত রেখে যুদ্ধের কথা শুনে শুনে মনটা ভারাক্রান্ত করে তোলেন। হরিপদবাবু নিত্য নতুন সত্যি-মিথ্যে সংবাদ নিয়ে আসেন। সব থেকে বড় খবর হৈমবতীর বিয়ে হয়েছে। বিন্দুবাসিনী কন্যা দানের জন্য প্রিয়নাথের হাত ধরে আর টানাটানি করবেন না। প্রিয়নাথের এখন একেবারে শান্তি। আর কোন বিপাক-বিড়ম্বনা নেই। এখন সে নিশ্চিন্ত হয়ে এলাহাবাদের পথে পাড়ি দেবে।

এর মধ্যেই একদিন প্রসন্নবালা প্রসন্ন হেসে প্রিয়নাথকে জিজ্ঞাসা করলেন : হ্যারে প্রিয়, সতীকে বিয়ে করবি ?

কথাটি শুনে প্রিয়নাথ সর্বশরীরে একটা শিহরণ বোধ করল। সে সতীকে জীবন-সঙ্গিনী কল্পনা করে অভিভূত হয়ে পড়ল। আরক্ত হয়ে অতি কষ্টে সে বলল : সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন, বড় বৌদি ?

ঃ মাসীমা চিঠি লিখেছেন। নাতনীর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

প্রিয়নাথের খুব ইচ্ছে হোল, জিজ্ঞাসা করে—বিন্দুমাসীমার চিঠিতে তার নাম প্রস্তাব করা হয়েছে কি-না। কিন্তু সে কথা সে কিছুতেই বলতে পারল না। কিন্তু তার মনে হোল, সংসারের জটিলতা মানুষের সুন্দর ভাবনা-চিন্তার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যতদিন বিন্দুবাসিনীর নিজের কন্যাদায় ছিল, ততদিন তিনি অস্বাভাবিক আচরণ করেছেন। কন্যাদায় মুক্ত হয়েই তিনি নাতনীর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। হৃদয়ের সরস বৃত্তিগুলো জেগে উঠেছে। সে যাইহোক, প্রসন্নবালার প্রশ্নের কিছু জবাব না দিয়ে, সে সলজ্জ হয়ে সরে এলো। বড় বৌদি বেশ উপভোগ করলেন। দেবরের সমর্থন বুঝে নিলেন।

আনন্দলাল অন্তরাল থেকে কথাবার্তা শুনছিল। প্রিয়নাথ সরে আসতেই সে বলল ঃ ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে রেখে এলি কেন? ফস্কে যেতে কতক্ষণ? পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ রেখে লাভ কী?

ঃ আমার পেটের ক্ষিদের কথা তোকে কে বলেছে?

ঃ বলেছে আমার গুপ্তচর—গ্রেটাগার্বো।

ঃ কী বলেছে?

ঃ বলেছে—সতীর জন্য তোর হা-হুতাশের কথা। সতী সামনে এলেই না-কি তোর চোখ-মুখ কী রকম হয়ে উঠত। সতী নাকি অন্য কথা বলে টলে তোকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখত। তারপর তুই নাকি কী সব কথাটথা বলে চলে এসেছিলি? আর ফিরে যাসনি। তাই নিয়ে নাকি সতীর কান্নাকাটি—কেলেঙ্কারী কাণ্ড।

অনেকদিন আগেকার সেই কথা এবং তার সঙ্গে সতীর চোখের জলের কথা শুনে প্রিয়নাথের মনটা বড়ই বিষণ্ণ হয়ে উঠল। সে বলল ঃ তোর গ্রেটাগার্বো আর কী বলেছে?

: তা বলে তুই কেঁদে ফেল্লি কেন? আত্মহত্যার কথাটথা কিছু বলেনি। শুধু ঐ একটু অভিমান।

: তা আমি যেতে না পারলে কী করব?

: কিছুই যদি না পারবি, শুধু ভণ্ডামিটা ছাড়লেই পারতিস। মাকে বললেই পারতিস—হ্যাঁ, আমি সতীকে বিয়ে করব। তুইজনে ঘরের মধ্যে না-কি সারারাত ফষ্টিনষ্টি করেছিস?

প্রিয়নাথ একটু বিরক্ত হয়ে বলল: তোর গ্রেটাগার্বোর ঐ হচ্ছে হিংসের কারণ। যদি থাকতেই হয়, তবে কি ঘরে না থেকে রাস্তায় থাকব না কি? তাই নিয়ে আলোচনা হয়েছে না-কি?

: আলোচনা হয়ে থাকলে তাতে ভয়ের কথা কি আছে? তাতে সকলেই হয়ত আশার আলো দেখতে পেয়েছে। একমাত্র বিন্দুঠাকুমার কাছে ব্যাপারটা খারাপ লাগলেও লেগে থাকতে পারে।

: তোমার গ্রেটাগার্বোর সব জ্বলুনির শেষ হয়েছে।

: তুই রেগে যাচ্ছিস কেন? এতো ভাল কথা—শুভ সংবাদ। সেও পাত্রী ভাল, তুইও পাত্র ভাল।

: এত ভালমন্দের কথা তুই জানলি কী করে? সব জেনে ফেলেছিস না-কি? তোর দৃষ্টি পড়লে তো ভয়ের কথা।

আনন্দ হেসে বলল: অমন পাপ-কথা ভুলেও মুখে আনিস না। আমার পরম পূজনীয়া প্রসপেকটিভ খুড়িমাতা ঠাকুরাণীকে আমি প্রণাম জানাই।

তুইজনে হেসে উঠল।

* * *

এলাহাবাদ রওনা হবার আগে প্রিয়নাথ রাণী-বৌদির সঙ্গে একবার দেখা করবে। সে অফিস থেকে ফেরবার পথে নন্দতুলালের বালীগঞ্জের বাসায় গিয়ে হাজির হোল। কিন্তু সেখানে গিয়ে একেবারে হতভম্ব। বারান্দায় অনেক লোকের ভীড়। প্রিয়নাথ

দ্বিধা নিয়ে এগিয়ে যেতেই দেখে, বাড়ীতে ঢোকবার দরজাটা বন্ধ। একটা জানালা খোলা আছে। সেইখানেই সকলে ভীড় করেছে। প্রিয়নাথ অবাক হয়ে দেখে, তার ডাক্তার দাদা অবনীভূষণ সেই ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

প্রিয়নাথ পেছনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, নন্দদুলাল বিছানায় শুয়ে আছে। রাণী-বৌদি সেবাকার্যে ভয়ানক ব্যস্ত। সেবাধর্মের চরিত্রে প্রিয়নাথ হতবাক। নন্দদুলালের হঠাৎ কী এমন অসুখ হোল কে জানে! যে অসুখই হোক, রাণী-বৌদির স্বামীসেবা যে-কোন পতিব্রতার পক্ষে চরম ঈর্ষার বস্তু। মাথার ওপরে জোরে পাখা ঘুরছে। তা সত্বেও রাণী-বৌদি একখানা পাখা হাতে নিয়ে হাওয়া করছে। মাথায় আইসব্যাগ দেওয়া আছে। তবুও রাণী-বৌদি স্বামীর কপালে জলপটি লাগিয়ে দিয়েছে। বোধহয় সেবাকাজ সব শেষ হয়ে গিয়েছে; করণীয় আর কিছু নেই। তাই সেবাধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ঐসব প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজগুলো করতে হচ্ছে। আর্তের সেবা করা নারীজাতির ধর্ম। সেই আর্ত যদি স্বামী হয়, তবেতো কথাই নেই। কিন্তু সব জিনিষেরই একটা সীমারেখা আছে। সেই সীমা লঙ্ঘন করলে সুকোমল বৃত্তির মর্যাদা নষ্ট হয়। স্বামীর বেলাতেও সে নষ্ট ইষ্ট হয় না। কিন্তু রাণী-বৌদি সেই সীমারেখাকে পদদলিত করে কিসের সাধনায় ব্যস্ত, তা তিনিই জানেন।

রাণী-বৌদি দু'একবার খোলা জানালার দিকে তাকাচ্ছে। প্রিয়নাথের সঙ্গে একবার বেশ ভালভাবে দৃষ্টি বিনিময় হোল। কিন্তু তার চোখেমুখে কোনই ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। প্রিয়নাথকে দেখে ভাবান্তর হলে স্বামীসেবার মর্যাদা বুঝি ক্ষুণ্ণ হবে—এই ভয়ে।

প্রিয়নাথ তার দাদা অবনীভূষণকে হাত দিয়ে ঠেলে ডেকে দু'জনে বাইরে চলে এলো। বয়সের ব্যবধান সামান্য হলেও, দাদা। সুতরাং প্রণম্য। সে কাজটি সেরে জিজ্ঞাসা করল: কখন এলে?

: আজ দুপুরে এসেই শুনি—নন্দদার এ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়েছে। একটা প্রাইভেট কার না-কি ওঁকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। তাই শুনেই দেখতে এসেছি।

: তুমি একাই এসেছ ?

: না, তোর বৌদিও এসেছে। কমলা-ভাগ্নীও আমার সঙ্গে এসেছে। মোহিনীবাবুও এসেছেন।

: তবে তো ভালই। কিন্তু ডাক্তার মানুষ হয়ে তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?

: আমাদের মত ডাক্তারের ওখানে দরকার নেই। বড় বড় সব ডাক্তার এসেছে।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করল : তা রাণী-বৌদি তোমাকে দেখেছে ?

: দেখেছে বৈকি ! কিন্তু চিনতে পেরেছে বলে মনে হোল না।

প্রিয়নাথ মনে মনে ভাবল, নন্দদা এই সোহাগী স্ত্রীর প্রভাবে মাকে গৃহছাড়া করেছে, বোনকে নির্যাতন করেছে। অবস্থা দেখে মনে হয়েছে যে, স্ত্রী একদিকে আর গোটা সংসারটা অন্য দিকে। নন্দদার ভাইটাও একদিন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এতবড় ঋণ রাণী-বৌদি এইবার সুদে-আসলে শোধ না করে ছাড়বে না। সে জিজ্ঞাসা করল : রোগীর বোধহয় বিশ্রাম দরকার। তা নন্দদা অত চীৎকার করছে কেন ?

: এ এক রকমের বিকার বলতে পার। যে গাড়ীচাপা দিয়েছে সেই অজ্ঞাত লোককে গালাগাল দিচ্ছে।

: কিন্তু রাণী-বৌদিরও বিকার হয়েছে নাকি ?

: তার বিকার হতে যাবে কেন ?

: বিকার ছাড়া কি ? গায়ে জামা নেই, শাড়ীর নীচে সায়া নেই, মাথায় চিরুণী নেই।

: শরৎবাবুর বইতে আছে, সেবায় মগ্ন হলে অমন হয়। বোধহয় রাজলক্ষ্মীর হয়েছিল। সেইসব পড়েছে-টড়েছে বোধহয়।

: কিন্তু সেবার পরিমাণটা যে বড় বেশী হয়ে যাচ্ছে।

অবনী একটু হেসে বলল: আঘাতটা কাটিয়ে উঠতে পারলেও, সেবাধর্মের ধকলটা কাটাতে পারলে বাঁচি।

দুইজনে হেসে উঠে বাড়ীর দিকে রওনা হোল। বাড়ীতে পা দিতেই কমলা বলল সার্কাস দেখাতে হবে। প্রিয়নাথকে নিয়ে যেতে হবে। দুলালচন্দ্র বয়সে প্রৌঢ় হলেও চরিত্রে ছেলেমানুষ। তিনি প্রিয়নাথকে শিখিয়ে দিলেন, বাড়ীর সকলকে কমলা সার্কাস দেখাতে রাজি হলে তবেই প্রিয়নাথ নিয়ে যাবে। কমলার অর্থ না থাকলেও প্রাণসম্পদ ছিল। সেই কমলার অর্থানুকূল্যে সেদিন বাড়ীর সকলে সার্কাস দেখে এলো। দুলালচন্দ্রও বাদ গেলেন না। মোহিনীবাবুও সঙ্গে গেলেন। প্রসন্নবালা তো গেলেনই। ঐ প্রসন্নবালার স্বামী দুলালচন্দ্রের এত অর্থ, এত সম্পদ। আশ্রিত পরিজনেরা সেই প্রাচুর্য্যের অংশীদার। কিন্তু প্রসন্নবালার সেই একখানা পোষাকী শান্তিপুরী মিহিশাড়ী। সেইখানা পরে সার্কাস দেখতে গেলেন। সে বিলেতী সার্কাস। তাতে সব সাহেবরা খেলা দেখায়। তখন চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যুতে সার্কাসের তাঁবু পড়ত। প্রিয়নাথরা দেখল, গ্রেট ইষ্টার্ণ সার্কাস। কামানের মধ্যে মানুষ ভরে তোপ দাগা হোল। সেই মানুষটা কামানের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে অনেকটা দূরে জালের ওপরে পড়ল। তাই দেখে প্রিয়নাথের মনে হোল—সে নিজেও বুঝি একটা কামানের গোলা হয়ে কোথায় ছুটে চলেছে।

* * *

এলাহাবাদে প্রিয়নাথের প্রবাসজীবন বড় একঘেঁয়ে বড় বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়ল। সংসারে তার নিজের বলতে যা কিছু ছিল, সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এ যেন তার নির্বাসিত জীবন। বেঁচে থাকার আনন্দ যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। জটিলতা না থাকলে জীবনে কোন বৈচিত্র্য থাকে না, আনন্দ থাকে না। কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে জীবনকে আস্বাদন করতে

হয়। প্রিয়নাথ এতদিন তাই করেছে। একেবারে কৈশোরে সেই প্রিয়বালার প্রবাসী স্বামীকে চিঠি লিখে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে পরপর ছোট-বড় কত কী যে ঘটেছে তার জীবনে, তার শেষ নেই। কিন্তু এইবার বুঝি সব শেষ হয়েছে। আর কোন জটিলতা নেই। একেবারে সহজ সরল জীবনযাত্রা।

ঘটনার পরে ঘটনার সমারোহ। সেই ১৯৩৮ সালে ইউরোপে মিউনিক চুক্তি হোল। সেই চুক্তি সই করে ফিরে এসে মস্ত বড় একটা ছাতা মাথায় দিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব অপেক্ষ্যমান হাজার হাজার বিলেতী মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কৃতিত্ব ঘোষণা করে হাত নেড়ে বললেন, তিনি যুদ্ধের সম্ভাবনার অবসান করে দিয়ে এলেন। ওদিকে সোভিয়েট-জার্মানী অনাক্রমণ চুক্তি হোল। সেসব কোথায় পড়ে থাকল। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। নিয়তির এমন নিষ্ঠুর বিচার—ঐ চেম্বারলেন সাহেবই ক'দিন পরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মুসলিম লীগ পাকিস্থান দাবী করে বসল। সুভাষচন্দ্র গোপনে ভারত ত্যাগ করলেন। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়ান হোল। সারা পৃথিবীকে অবাক করে দিয়ে জাপান পার্লহারবার আক্রমণ করে বসল। তারপরই তারা বায়ু বেগে এগিয়ে এসে বর্মায় হাজির হোল। সেখানে মৃত্যুকূপ তৈরি করল। শেষকালে কলকাতার বুকেও বোমা পড়ল। ভারতব্যাপী "ভারতছাড়" আন্দোলন হোল। পঞ্চাশের মন্বন্তরে ছন্দ মিলিয়ে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মরে গেল। নেতাজী সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে একেবারে ভারত-সীমান্তে এসে হাজির হলেন। দুলালবাবুর বৈঠকখানায় তখন কেবল ফিসফিস আলোচনা। ইতিমধ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের দেহরক্ষা হোল। তারপরে ১৯৪৫ সালের ৭ই মে সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। জার্মানী আত্মসমর্পণ করল। সেদিন দুলালবাবুর বৈঠকখানায় বরুণবাবুর বড় উচ্চ কণ্ঠ। হরিপদবাবু অনুপস্থিত। ওদিকে জাপানও অতিরিক্ত

আহারের পরিণামে উদরাময়ে আক্রান্ত হোল। এইভাবে শত্রুপক্ষ যখন একেবারে নাজেহাল, তখন আমেরিকা জাপানের হিরোসিমা আর নাগাসাকি শহরের ওপরে পরমাণু বোমা ফেলে কয়েক লক্ষ লোককে যমালয়ে পাঠিয়ে দিল; আর কয়েক লক্ষকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করে রেখে দিল। যে নেতাজীর কথা ব্রিটিশ সরকার ক্রমাগত অস্বীকার করে এসেছে, তারাই সেই নেতাজীর লোকান্তর সংবাদ ঘোষণা করল। রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনী নিজের মৃত্যুদ্বারা তার অস্তিত্ব প্রমাণ করেছিল। নেতাজীর লোকান্তর-সংবাদে কী প্রমাণিত হোল, তা জানেন ইংরেজ সরকার। কিন্তু লোকচিত্তে তা চির-রহস্য হয়েঁ থাকল।

তা রহস্যই হোক আর যাই হোক, সে সব মিটেছে। সব চুকেবুকে গিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে যেন অখণ্ড নীরবতা। ঝড়ের পরে শান্ত প্রকৃতির মত। প্রিয়নাথের জীবনেও একটা নিস্তব্ধতা। চারুশীলাকে নিয়ে অম্বিকাদা কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। কোথায় গেল তার সেই দিদি! যে দিদির রূপ ছিল না বলে বিয়ে হোল না। যে দিদির বিয়ে হোল না, তাকে প্রিয়নাথ বিয়ে করলে চারু তার সব দাবী ছেড়ে দিতে রাজি ছিল। সকলের অজ্ঞাতে চারু প্রিয়নাথের ওপরে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। যে মলয় সেনের দুয়ার ভেঙ্গে চারু একদিন পথে বেরিয়ে এসেছিল, সেই মলয় সেনই না-কি তাদের বর্মা যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। যে অম্বিকাদার বারান্দা থেকে চৌধুরীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে চারু তার ঘর ভেঙ্গেছিল, সেই অম্বিকাদাই শেষকালে তাকে বর্মায় নিয়ে গেল। মৃত্যুকূপ থেকে তার দিদিকে উদ্ধার করবে বলে। চৌধুরী কোথায় চলে গেল, কেউ জানে না। তার ভাবনা কী? যতদিন সংসারে মেয়েমানুষ আছে আর সেই মেয়েমানুষের জন্য পুরুষমানুষের লোলুপতা আছে, ততদিন চৌধুরীদের ভাবনা নেই। তারপরে যে নাট্যাচার্যের সঙ্গে চারু ঢলাঢলি করেছিল, সেই দিলীপবাবুও শুধু

মঞ্চ থেকে নয়, একেবারে সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন। এ সংবাদ প্রিয়নাথ খবরের কাগজে দেখেছে। যাঁরা মঞ্চ থেকে নাট্যাচার্যকে তাড়িয়েছিল, তাঁরাই রাশি-রাশি ফুল নিয়ে গিয়ে চোখের জলে তাঁর শেষকৃত্য করেছে। নাট্যাচার্য আর কোনদিন মদ খাবেন না, কোনদিন মঞ্চের ভাড়া বাকি রাখবেন না। সকলের সব হিসেব তিনি কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিয়েছেন। তিনি জীবনরঙ্গের মঞ্চ থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন। তাঁর মস্ত বড় ক্ষোভ, তিনি কিছু করে যেতে পারলেন না। না নিজের জন্য, না দেশের জন্য। নাট্যাচার্যের নশ্বর দেহ কাশিপুরের মহাশ্মশানে দাহ করা হয়েছে। এ সংবাদে প্রিয়নাথ বড় তৃপ্তি পেয়েছে। ঐখানেই পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যলীলা সাঙ্গ হয়েছে। নাট্যাচার্যের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তবে কি সঙ্গোপনে কিছু একটা আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ছিল! তাঁর মুখের কথা তবে কি অন্তরের কথা নয়! তিনি মুখে বলতেন, তিনি নাকি আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধে একেবারে নির্বিকার। সেকথা বুঝি সত্য নয়। তা না হলে ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী অভেদানন্দ, শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তর দেহ যেখানে লয় হয়েছে; সেইখানেই নাট্যাচার্যের স্থান হোল কী করে! ওদিকে হৈমবতী না-কি বিলেতে সুখে স্বামীর ঘর করছে। নন্দদুলাল যখন বোনের জন্য বিনি পয়সায় যে-কোন একটা দোজবর তেজবর খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন হৈম নিজেই এই অসাধ্য সাধন করে স্বয়ম্বরা হয়েছে। বিন্দুবাসিনী মেয়ের জন্য কতজনের হাত নিয়ে টানাটানি করেছেন। সেসব দিন শেষ হয়েছে। আনন্দলালের বিয়ে হয়েছে। সে প্রিয়নাথের বিয়ের জন্য বড়ই ব্যাকুল। আনন্দলাল প্রিয়নাথের মনের কথা কী করে অনুমান করেছিল তা সেই জানে। কিন্তু তার কোন চেষ্টাতেই কাজ হয়নি। প্রিয়নাথের সঙ্গে সতীর বিয়ের ব্যবস্থা সে করতে পারেনি। অনেক দুঃখ করে, অনেক সান্ত্বনা দিয়ে আনন্দ প্রিয়কে চিঠি লিখে তার এই ব্যর্থতার কথা জানিয়েছিল। সতীর না-কি খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছে। সে না-কি খুব সুখে

আছে। আনন্দে আছে। সুখে থাক, আনন্দে থাক—ভাল কথা। প্রিয়নাথ শুধু ভাবে, তবে তাকে নিয়ে টানাটানি হয়েছিল কেন। বর্ধমানে থিয়েটার দেখা নিয়ে অত ঢং করবারই বা কী দরকার ছিল। রূপহীনা নারীর যেমন-তেমন একটি বর সংগ্রহের চেষ্টা বোধহয়। প্রসন্নবালা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সে সতীকে বিয়ে করবে কিনা। সে তো মৌন থেকে সম্মতিই জানিয়েছিল। সম্মতির কথা নয়। অর্থের প্রতিযোগিতায় প্রিয়নাথ হেরে গেল। বিত্ত দিয়ে, অর্থ দিয়ে পাত্রের যোগ্যতা বিচার হয়। সে বিচারে প্রিয়নাথের পরাজয় হয়েছে। এইসব চিন্তা নিয়ে সে একেবারে শান্ত স্থির হয়েছিল। জীবনে যেন আর কিছু চঞ্চলতা নেই। এর মধ্যেই সে ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠল। আনন্দলালের টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত। সে টেলিগ্রামের সংবাদ যেমন আকস্মিক, তেমনই মর্মান্তিক। প্রিয়নাথের চোখের সামনে জগৎ-সংসারটা অন্ধকার হয়ে গেল।

*　　*　　*

প্রিয়নাথ এসে দুলালচন্দ্রকে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু তখন তাঁর জ্ঞান-চৈতন্য নেই। রাস্তায় যেতে যেতে গাড়ীর ধাক্কা লেগে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়েছিলেন। সে জ্ঞান আর ফিরে আসেনি। যিনি সংসারের কোন জটিলতাকে গ্রাহ্য করতেন না, তিনিই জটিলতম অবস্থার সৃষ্টি করে চলে গেলেন। আনন্দ হাউ-মাউ করে কেঁদে প্রিয়নাথকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞাসা করল: একটা মানুষকে হাত-পা বেঁধে জলের মধ্যে ফেলে দিলে তার কেমন অবস্থা হয়, খুড়ো?—প্রিয়নাথ কোন উত্তর দিতে পারেনি। হাত-পা বেঁধে জলের মধ্যে ফেলে দিলে কেমন হয়—সেকথা সে অনুভব না করলেও অনুমান করতে পারে। কিন্তু বলতে পারেনি। বলবে কী করে? নিজের কণ্ঠের ভাষা যে হারিয়ে গেছে! প্রসন্নবালার হাতে তখনও শাঁখা, সিঁথিতে তখনও সিঁদুর। সবই আছে। নেই শুধু মুখে সেই প্রসন্ন হাসি। যে হাসিমাখা মুখে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তুই সতীকে

বিয়ে করবি ? সে হাসি বোধহয় ও মুখখানা থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিল। তিনি তুলালচন্দ্রের প্রাণহীন দেহখানা ত্ব'হাতে জড়িয়ে ধরে হাহাকার ভরা গলায় বললেন : তুমি আমার কী সর্বনাশ করে গেলে।—তা তুলালচন্দ্র সে-কথার কোন উত্তর দেননি। তিনি উত্তর না দিলেও ভাগ্যবিধাতা তার কাজ করলেন। ভবিতব্য তার বিধান রচনা করে ফেললেন। সে বিধান বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর। প্রিয়নাথ সেসব কথা কিছু জানতে পারল না। সে শুধু দেখতে পেল কাল-বোশেখির প্রচণ্ড ঝড়ে একটা বটবৃক্ষ ভেঙ্গে পড়ল। একদিন ঐ বৃক্ষের ছায়ায় বসে পথিক বিশ্রাম করেছে, পাখিরা আশ্রয় নিয়েছে। সে বৃক্ষ পড়ে গেল। প্রিয়নাথের মনে হতে লাগল, প্রসন্নবালার জীবনসংশয় নিয়েই তো তুলালচন্দ্র অস্থির ছিলেন। গ্রহাচার্য ভাগ্য গণনা করে বলেছিল, প্রসন্নবালার মৃত্যুযোগ আছে। কিন্তু যোগ-বিয়োগের অংক গোলমাল হয়ে গেল। জীবন-দেবতা অলক্ষ্যে হেসে প্রসন্নবালাকে ছেড়ে তুলালচন্দ্রকে ধরলেন। দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশে প্রসন্নবালার বুঝি বাকি-বকেয়া ছিল। সেইসব মেটাবার জন্য তাঁকে থাকতে হোল। হিসেব মিলেছিল। কিন্তু তা অনেক কাণ্ড-কারখানার পরে। সেসব কথা পরে।

এলাহাবাদ ফিরে যাবার আগে প্রিয়নাথ রাণীবৌদির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। নন্দত্বলালের তুর্ঘটনার সময়ে সে রাণী-বৌদির বিচিত্র স্বামীসেবা দেখে হতবাক হয়ে ফিরে এসেছিল। সেবাধর্মের চরিত্রটা সেদিন ভাল বুঝতে পারেনি। শুধু এইটুকু বুঝেছিল, স্বামীর সোহাগের বিনিময়ে সেবা দিয়ে ঋণ শোধের চেষ্টা। তার মধ্যে আন্তরিকতার পরিমাণটা সে পরিমাপ করতে পারেনি। খোলা জানালা দিয়ে প্রিয়নাথকে দেখেও সেবাপরায়ণা রাণী-বৌদি না-দেখার ভান করেছে। পরিষ্কার অবজ্ঞা। তবুও তার সঙ্গে দেখা না করে সে এলাহাবাদে ফিরে যেতে পারল না। কিসের আকর্ষণ কে জানে। আনন্দকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলেছিল, নন্দত্বলাল

বিদেশে। হয় বিলেতে না হয় আমেরিকায়। যাবার আগে নিজে একখানা বাড়ী করে মাকে তাড়িয়ে বৌকে সেখানে রেখে গেছে। বোনের তো বিয়েই হয়ে গেছে। ভাই পালিয়ে গিয়ে নিজেও বেঁচেছে, দাদাকেও রক্ষা করেছে। অত দুঃখের মধ্যেও আনন্দলাল একটু রহস্যের লোভ সংবরণ করতে পারল না। সে বলল: অখণ্ড প্রতাপে তোমার রাণী-বৌদি এখন মক্ষিরাণী হয়ে বসে আছে। অন্য কেউ বড় একটা যায় না। তবে প্রিয়-ঠাকুরপোর আপ্যায়নে কিছু ত্রুটি হবে বলে মনে হয় না।

নতুন ঠিকানায় পৌঁছে প্রিয়নাথ দেখল, বাড়ীর সামনে একটু মাঠ আছে। সেই ছোট মাঠটির মধ্যে একটি গাছের নীচে কয়েকটি যুবক বসে আছে। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, কথাবার্তা ইত্যাদি দেখে শুনে প্রিয়নাথের মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। একবার ভাবল—ফিরেই যাবে। কিন্তু তা হোল না। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল: এইটে কি নন্দদুলাল বাবুর বাড়ী?

সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে সেই যুবকটি উল্টো জিজ্ঞাসা করল: আপনি কে?

অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে প্রিয়নাথ বলল: নন্দদুলালবাবু আমার দাদা।

সেই ছেলেটি বলল: ভদ্রলোকের একটি ভাই আছে জানি। তাকে দেখেছি। বিলেতে থাকে, মেম বিয়ে করেছে।

অন্য একটি ছেলে মুখে একটা অশ্লীল শব্দ করে নিজের বুকে একটা চড় মেরে বলল: মাইরি বলছি, দাদা—খুব ভাল জিনিষ পেয়েছে।

প্রথম ছেলেটি তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলল: কিন্তু আপনাকে তো দেখিনি?

মরিয়া হয়ে প্রিয় বলল: আমি তার মাসতুত ভাই।

তখন বাকী ছেলেরা একে অন্যের ওপর ঢলে পড়ে বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠল:

ওরে, তোরা করছিস কি! তু তো-ঠাকুরপোকে পৌঁছে দিয়ে আয়।

রাগে ঘৃণায় দুঃখে লজ্জায় প্রিয়নাথের মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হোল। প্রতিবাদের ক্ষমতা নেই তার। ফিরে যেতে ইচ্ছে হোল। কিন্তু মনুষ্যদেহে এইসব চরিত্র তাকে নিরাপদে ফিরে যেতে দেবে বলে মনে হোল না। তবুও সে ফিরে দাঁড়াল। এমন সময়ে পেছন থেকে নারী কণ্ঠে বলে উঠল: প্রিয় ঠাকুরপো না-কি?

প্রিয়নাথ তাকিয়ে দেখল, ছাদের ওপরে রাণী-বৌদি দাঁড়িয়ে। কণ্ঠ নিরাসক্ত। চোখে-মুখে কোন ভাবান্তর নেই। সেই রাণী-বৌদি। সে ভেবেছিল, তার কথাটার কদর্য প্রতিধ্বনি হবে। কিন্তু তা হোল না। রাণী ছাদের ওপর থেকে জিজ্ঞাসা করল: ওপরে আসবে না-কি?

এ আবার কি বিচিত্র প্রশ্ন? সেই রাণী-বৌদি! প্রিয়নাথ গেলেই যে বলত—গরীবের বাড়ীতে হাতীর পা। যে রাণী-বৌদির ধবধবে দু'খানা সুডৌল ভেজা হাতে সে শাড়ী তুলে দিয়েছিল। তারপরে অন্ধকার ঘরের মধ্যে আলো জ্বালার প্রতীক্ষায় বসেছিল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। প্রিয়নাথের মনটা বিতৃষ্ণায় ভরা। সে বলল: ওপরে যাবার দরকার নেই। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তা তো হয়েই গেল। এবার যাই।—এই কথা বলে সে ফিরে দাঁড়াল।

রাণী-বৌদি একটিও কথা না বলে দাঁড়িয়ে থাকল। যে ছোকরা প্রথমে কথা বলেছিল, সেই আবার বলল: তা হয় না। আপনি আমাদের অতিথি। শুধু মুখে ফিরে যেতে দেব না—এই কথা বলে সে প্রিয়নাথের হাত ধরল।

প্রিয়নাথ ভাবল, রাণী-বৌদির সঙ্গে দেখা করতে এসে আজ কপালে কী আছে কে জানে। ছেলেটি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলল: কৈ বৌদি, ঠাকুরপোকে ঘরে তুলুন।

রাণী-বৌদি এসে দরজা খুলে দিল। তার মুখে সে স্নিগ্ধ হাসি আর নেই। সে নীরস কণ্ঠে বলল: এসো প্রিয় ঠাকুরপো।

প্রিয়নাথ তাকিয়ে দেখল—যে ছেলেটি তাকে নিয়ে এসেছিল, সে আর নেই। সে রাণী-বৌদির পেছনে পেছনে গিয়ে একটি ঘরে ঢুকল। রাণী-বৌদির সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা কিছুই যেন আর হতে চায় না। রাণী বলল: বড় ঠাকুরের কাজে এসেছ বুঝি? তাঁকে দেখতে পেয়েছ?

: আমি এসে অজ্ঞান অবস্থায় দেখেছি। কিন্তু কাজের দিন আপনাকে দেখতে পেলাম না তো?—রাণী একটু হাসল। তার অর্থ অনেক কিছু হতে পারে।

তারপরে রাণী বলল: তুমি একটু বোস, প্রিয় ঠাকুরপো। আমি চা করে নিয়ে আসি।—এই কথা বলে সে আবার একটু হাসল। এই হাসিতেই সেই দাগওয়ালা দাঁতটি দেখা গেল। রাণী-বৌদির সারা অঙ্গের মধ্যে ঐ দাগওয়ালা দাঁতটি দেখলে প্রিয়নাথের মনটা কেমন হয়ে যেত।

*　　　　*　　　　*

প্রবাসে প্রিয়নাথের ভারাক্রান্ত দিনগুলো কোনও ভাবে কেটে যাচ্ছিল। এর মধ্যেই দেশটা একদিন স্বাধীন হয়ে গেল। ব্রিগেডিয়ার ফাউলার সাহেব তো সেই কোনকালে বিদায় নিয়েছিলেন। গ্রেহাম সাহেবের কী হয়েছিল—তা প্রিয়নাথ জানে না। ঐ গ্রেহাম সাহেব বলেছিল, ইণ্ডিয়াতে তার জন্ম। সুতরাং ইণ্ডিয়ার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সে বোঝে। যে মর্মবেদনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অনিল ভাদুড়ি ভারতবিদ্বেশী বিদেশীকে হত্যা করতে যায়, সে যন্ত্রণার কথা সে বোঝে। তাই সে প্রিয়নাথকে চাকরি থেকে সরাতে চেয়েছিল, তাকে কয়েদ করতে চেয়েছিল। শুধু ফাউলার সাহেবের জন্য পেরে ওঠেনি। তা সেই ভারতবন্ধু গ্রেহাম সাহেবের খবর প্রিয়নাথ জানে না। তা না জানলেও সাহেবরা সকলে একে একে বিদায় নিল।

তার জায়গায় শ্রীবাস্তব সাহেব, সিনহা সাহেব, ভট্টাচার্য সাহেবরা এসে স্থলাভিসিক্ত হোলেন। প্রিয়নাথদের জীবনেও স্বাধীনতার দরুণ পরিবর্তন এসেছে। ওপরওয়ালাদের কাছে দরখাস্ত করতে হলে আর "ইউর মোষ্ট অবিডিয়েন্ট সারভেন্ট" লিখতে হবে না। তার বদলে "ইওরস ফেইথফুলী" লিখলেই হবে। এখন আর প্যান্ট-সার্ট-টাই পরা বাধ্যতামূলক নয়। যে কোন পদের লোক ধূতী-পাঞ্জাবী পরে আফিসে যেতে পারবে। এইসব নিত্য-নতুন চমকপ্রদ স্বাধীনতার ফল সকলে মিলে আস্বাদন করে ধন্য-ধন্য করতে লাগল। আগে চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখে নিরাপদ মনে করলে ক্ষীণকণ্ঠে একবার "বন্দেমাতরম" বলা হোত। এখন যে কোন উৎসবে-ব্যসনে—এমন কি বড় সাহেব রামলিঙ্গমের জন্ম দিনেও—বড় বড় ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ঘাড়ে করে গগনভেদী চিৎকারে আফিসের মধ্যে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি দিতে দিতে নিজেরাই খুসীমত আফিস ছুটি করে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়া যায়। স্বাধীনতার এমন প্রভাবে সকলের একেবারে দিশেহারা অবস্থা। মিহি ধবধবে ইস্ত্রি করা খদ্দরের ধূতী-পাঞ্জাবী পরে কেউ এলে ঐসব সোডি আর রামলিঙ্গম সাহেবরা চার হাত-পা তুলে লাফাতে থাকেন।

এইসব আনন্দযজ্ঞে যখন সকলে একেবারে মত্ত হয়ে উঠেছে তখনও প্রিয়নাথ একেবারে রিক্ত, নিঃস্ব। এলাহাবাদে তাদের একখানা পৈতৃক বাড়ী ছিল। প্রিয়নাথের ঠাকুরদা সেই কোন আদ্যিকালে তৈরি করিয়েছিলেন। তা সে ঠাকুরদা কোথায় চলে গেলেন। পড়ে থাকল তাঁর সেই সাধের বাড়ী। বাস করবার কেউ নেই। সেখানে থাকেন তার এক বৃদ্ধা জ্যাঠাইমা। বাড়ীখানার মতই তাঁর জরাজীর্ণ অবস্থা। সেই বাড়িতেই প্রিয়নাথ আশ্রয় নিয়েছে। তার বাড়ী ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়। রাতের আহারটা দেবার জন্য রোজ সে বৃদ্ধার পক্ষে বসে থাকা সম্ভব হয় না। সে ভারটা পড়েছে জোৎস্নাদের মায়ের ওপরে। জোৎস্নাদের জন্মের কিছুদিন

পরেই তার বাবা ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। কোথাকার কে ভোম্বল। তার মায়ের আশ্রয় মিলেছিল ঐ বাড়ীতে। আস্তে আস্তে প্রিয়নাথের সকল পরিচর্যার ভার এসে পড়ল ঐ ভোম্বলের মায়ের ওপরে। অনেক রাত্রে প্রিয়নাথ যখন বাড়ী ফিরত, তখন তার জ্যাঠাইমা নিদ্রায় কাতর। ভোম্বলের অবস্থাও তাই। অনেকরাত্রে প্রিয়নাথ খেতে বসলে ভোম্বলের মা নিদ্রিত ভোম্বলকে উপলক্ষ্য করে স্বল্পাহারের জন্য অনুযোগ জানাত। ভোম্বলের তখন মামাকে বলবার মত অবস্থা নয়। আর দরকারও নেই। কারণ মামা নিজেই সব পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে। ভোম্বলের মা একেবারে কাছেই বসে বলত: ওরে ভোম্বল, তোর মামাকে বল্—আজ একেবারে কিছুই খেলেন না কেন?—প্রিয়নাথ ভাতের থালার দিকে মুখ করে নীচু গলায় বলত: আমি ঠিকই খেয়েছি। আজ ভাতের পরিমাণ বেশী ছিল।

অভিযোগ খণ্ডনের জন্য ছেলেকে ডাকাডাকি করতেই প্রিয়নাথ উঠে পড়ত। তারপর অন্তরাল থেকে লক্ষ্য করত, পাতে থাকা ভাত কটা ভোম্বলের মা তৃপ্তিভরে খেয়ে নিত। এই উচ্ছিষ্ট গ্রহণের রীতিটা প্রিয়নাথের ভাল লাগত না। এতো ইচ্ছে করে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী অন্ন পরিবেশন করে সাধ করে উচ্ছিষ্ট রাখা। আমিশ আহারেও তার আপত্তি ছিল না। বিধবার সংস্কারকে সে জয় করেছে। এই জয়-পরাজয়ের সীমা কোথায় তাও প্রিয়নাথ জানে না।

এমনিভাবেই একদিন রাত্রে প্রিয়নাথ খেতে বসবে, এমন সময় ভোম্বলের মা নিদ্রিত ছেলেকে সম্বোধন করে বলল: তোর মামাকে চিঠিখানা দে।

ঘুম থেকে উঠে ছেলেকে আসতে হোল না। প্রিয়নাথ হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিল। একটা খবরের মত খবর পাঠিয়েছে আনন্দলাল। কোন হাতেলেখা চিঠি নয়। ছাপান চিঠি। নিমন্ত্রণ পত্র। ওপরে "গঙ্গা" ছাপান। নীচে "ভাগ্যহীন" বলে আনন্দ

আর তার ভাইদের নাম ছাপান। প্রসন্নবালা দেবীর লোকান্তর হয়েছে। তাঁরই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ। প্রিয়নাথ আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। কোন এক অজ্ঞাত অপরাধের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে ভোম্বলের মা হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকল। এ আবার কী হোল। প্রিয়নাথ নিজের যন্ত্রণার কথা ভুলে অসহায় নিরপরাধ রমণীকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল।

ভোম্বলের মার দুই চোখের কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে এলো। সে জলের ধারা কী কারণে কে জানে! মৃতার শোকে অথবা প্রিয়নাথের সমবেদনায় তা বোঝা গেল না। প্রিয়নাথের কিন্তু একবার মনে হোল অসহায় স্ত্রীলোকটিকে সান্ত্বনা দিতে চোখের জলটা মুছিয়ে দিলে মানবধর্মের কাজ হোত। কিন্তু সে সরে এলো। মানবধর্ম মাথায় থাক।

* * *

কলকাতার দিকে ধেয়ে চলা তুফান এক্সপ্রেসের একটি কামরায় মধ্যে বসে বসে প্রিয়নাথ ভাবতে লাগল সকলের মিলিত প্রার্থনায় ভগবান কান দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত প্রসন্নবালার লোকান্তর হোল। কিন্তু হোলই যদি, আগে হলেই পারত। যখন গ্রহাচার্য গণনা করে বলেছিলেন যে, প্রসন্নবালার মৃত্যুযোগ আছে—তখন তাঁর মৃত্যু হলে এমন দুর্ভোগ হোত না। তখন মৃত্যু হলে দুলালচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে ছেলেরা, আশ্রিত পরিজনেরা সকলে মিলে কত চোখের জল ফেলত। কিন্তু সেদিন তিনি কৃপণের মত জীবনটা ধরে রাখলেন। লাভ কী হোল? সেই মৃত্যু হোল। মৃত্যুকে কেউ কোনদিন রোধ করতে পারে না। প্রসন্নবালাও পারলেন না। কৃপণের ধন রক্ষা পেল না। দেহটার প্রতি মানুষের এত মমতা! পেটে অন্ন নেই, পরিধানে বসন নেই, শয়নে শয্যা নেই। তবুও জীবনটা যায় না। দেখে মনে হোত—সংসারে বুঝি মৃত্যু নেই। তাঁর আপনজনেরা যে দেখেছে, সেই তাঁর মৃত্যু-কামনা করেছে। এর থেকে তারজন্য

মঙ্গল কামনা আর কিছু ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে কৃতান্তের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছিলেন। দেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। তবুও সে সংগ্রামের বিরাম নেই। যে প্রসন্নবালা বিছানার চাদরটি টানটান না হলে শুতে যেতেন না, সেই ভদ্রমহিলা একটা ছেঁড়া কাঁথার ওপরে শুয়ে রাতের পর রাত কাটিয়ে দিলেন। লোকে বলে, অন্নদান করলে নাকি সেই অন্ন জমা থাকে। তবে শত্রু-মিত্র আপন-পর সকলকে নিজের হাতে এত অন্ন পরিবেশন করে নিজের পেট অন্নহীন হয়ে উঠল কেন! কেন হয়ে উঠল—সে কথার উত্তর দেবার কেউ নেই। সে এক রহস্য। হিসেব মেলে না। দেনা-পাওনার অংকে গরমিল থেকে যায়। কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাবে, বাকি থাকবে তিন শূন্য—এমন হয় না।

ভালবাসার মানুষকে দেখলে মানুষের অবরুদ্ধ যন্ত্রণা প্রকাশের সুযোগ পায়। প্রিয়কে দেখে আনন্দ হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠে বলল: সব শেষ হয়ে গেল। ভাইয়েরা আলাদা আলাদা করে মুখাগ্নি করল। তাতে না-কি সম্পত্তির ওপরে অধিকার হয়। শ্রাদ্ধও না-কি আলাদা করে করবে।

এতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। এ যে সেই প্রসন্নবালা দেবী! যার মুখভার দেখলে সমস্ত বাড়ী থমথম করত। তাঁর লোকান্তর! কিন্তু বাড়ীতে তেমন পরিবেশ কিছু নেই।

অবনী এসেছে, তার স্ত্রী এসেছে, ছেলেমেয়েরা এসেছে। একটি মহিলা এগিয়ে এসে বলল: চিনতে পারেন, প্রিয়দা?

সত্যিই চেনা যায় না। প্রিয়নাথ কতদিন আগে দেখেছে। তখন ঐ মহিলা কিশোরী ছিল। কবে যে তরুণী হয়েছে, বিয়ে হয়েছে, যুবতী হয়েছে, ছেলেমেয়ে হয়েছে—প্রিয়নাথ সে সংবাদ রাখেনি। দুজনের মধ্যে পরিচয়ের অন্তরঙ্গতাও ছিল না। স্বাভাবিক একটা লজ্জাবোধের প্রাচীর দুইজনের মধ্যে সহজ ব্যবহারের অন্তরায় ছিল। এতদিন পরে সময়ের ব্যবধানে সে প্রাচীর ভেঙ্গেছে। সব অন্তরায় দূর হয়েছে। এখন সে সহজভাবে কথা বলতে পারে।

প্রিয়নাথ তাকে চিনতে পেরেছে। মহিলার নাম—বলাকা। অবনীর শ্যালিকা। বোমার ভয়ে অবনীর শ্বশুর মশায় যখন এলাহাবাদে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন ঐ বলাকা অবিবাহিতা কিশোরী ছিল। প্রিয়নাথের বৌদিও সেই সঙ্গে ছিলেন। বলাকার অন্য ভাইয়েরাও ছিল। একদিন রাত্রে কোন এক আত্মীয়ের শব নিয়ে শ্মশানে যেতে হয়েছিল অবনীর শ্বশুর মশায়কে। বাড়ীতে রেখে গিয়েছিলেন প্রিয়নাথকে। সেদিন সারারাত ধরে প্রিয়নাথ তার বৌদি আর তার অন্যান্য ভাইবোনদের সঙ্গে গল্প-গুজব হৈ হট্টগোল করে কাটিয়ে দিয়েছিল। তার সেই কথা মনে পড়ল। সে বলল: চিনতে পেরেছি বই কি! অসুবিধে হলেও চিনতে পেরেছি। এলাহাবাদের সেই রাত্রিবাসের কথা আমার খুব মনে আছে। কিন্তু গিন্নীবান্নী মানুষ। কী বলে ডাকব—তাই ভাবছি।

বলাকা তাড়াতাড়ি বলে উঠল: এর মধ্যে এত ভাবনার কথা কী আছে? আপনি "বলাকা" বলে ডাকবেন, প্রিয়দা।

সহজ ব্যবহারে প্রিয়নাথ খুসী হোল। বলাকা আবার জিজ্ঞাসা করল: আপনি সেই এলাহাবাদেই থেকে গেলেন। সেই কতদিনের কথা!

প্রিয় বলল: আর দু'এক বছর থাকতে পারলে হিন্দুস্থানী হয়ে যাব।

বলাকার স্বামী মৃদুলবাবু এতক্ষণ বেশ উপভোগ করছিলেন। তিনি বললেন: আর দু'এক বছর পরে তাহলে আপনি হিন্দী ইস্কুলের হেডমাস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসতে পারবেন।—সকলে মিলে হেসে উঠল। বাড়ীটার অবরুদ্ধ বাতাস যেন একটু মুক্তির পথ দেখতে পেল।

শ্রাদ্ধটা শেষ পর্যন্ত ছেলেরা সব একসঙ্গে মিলেমিশেই করল।

এ বাড়ীর সঙ্গে প্রিয়নাথের যোগাযোগ হয়ত চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবে। সবই গেল। থাকল শুধু আনন্দ আর তার স্ত্রী হেমময়ী। আশ্রিত পরিজনেরা বিদায় নিয়েছে। আর যারা এ

বাড়ীতে থাকল, তারা প্রিয়নাথকেও আশ্রিত বলে মনে করত। ভবিষ্যতেও হয়ত করবে। করবে কি করবেনা—সেকথা আর প্রিয়নাথের পরীক্ষা করবার ইচ্ছে নেই। এ বাড়ীর সঙ্গে রক্ত-মাংসের বন্ধনটা কোন নির্দয় কশাই নিষ্ঠুর হাতে ছিন্নভিন্ন করে দিল। আনন্দ থাকল আর থাকল হেমময়ী। তাদের সঙ্গে প্রিয়নাথ বড় বেশী জড়িয়ে পড়েছে। ঐ হেমময়ীকে প্রিয়নাথও পাত্রী হিসেবে দেখতে গিয়েছিল। তার বড় ভাল লেগেছিল। সে বড়দা দুলালচন্দ্র আর বড় বৌদি প্রসন্নবালাকে বড়মুখ করে বলেছিল—এ মেয়ে ভাল হবে। তা মেয়েটি বৌ হয়ে ভালই হয়েছিল। দুলালচন্দ্রের বড় আদরের পুত্রবধূ। আদর করে "হেম" বলে ডাকতেন। নিজের মেয়ের মত "তুই" বলতেন। প্রিয়নাথও বড়দার মত "হেম" বলে ডাকত আর "তুই" বলত। তা সে সবই পড়ে থাকল। এইবার প্রিয়নাথের বিদায়ের পালা। এই বাড়ীটাতে ফিরে আসবার মত কোন সম্ভাবনাই সে খুঁজে পেল না।

প্রিয়নাথ অবনীকে নন্দদুলালের কথা জিজ্ঞাসা করল। অবনী বলল: নন্দদা বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে। বিরাট বাড়ী করেছে। তবে সংসারে শান্তি নেই। মাসীমা বিতাড়িত। কোথায় আছেন কে জানে! আবার বৌদির না-কি কী এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে।

প্রিনাথের মনটা কেমন করে উঠল। সে যে অনেকদিনের অনেক ভাল-মন্দ কথা। অতীত দিনের কিছু কিছু বিরূপ ব্যবহারের কথা ভুলে গিয়ে প্রিয়নাথ একদিন নন্দদুলালের বাড়ীতে গিয়ে হাজির। সে মাঠ নেই। সেখানে বিরাট বাড়ী উঠেছে। সে গাছও নেই—যে গাছের নীচে বসে পাড়ার ছেলেরা প্রিয়নাথকে উত্যক্ত করেছিল।

দরজার কড়া নাড়তেই একজন দাসী জাতীয় স্ত্রীলোক এসে দরজা খুলে দিল। সে প্রিয়নাথকে ওপরে নিয়ে গেল। রাণী-বৌদি বিছানায় শুয়ে আছে। প্রিয়নাথকে দেখে তার চোখে প্রায় জল এসে

গেল। সে বলল: এসো, প্রিয় ঠাকুরপো। বড়দির কাজে এসেছ বুঝি?

প্রিয়নাথ একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে যাচ্ছিল। রাণী-বৌদি তাড়াতাড়ি বলল: ওখানে নয়, ওখানে নয়। তুমি এইখানে বোস, প্রিয় ঠাকুরপো। এই বিছানায়, আমার কাছটিতে বোস।—এই কথা বলে রাণী-বৌদি ফ্যালফ্যাল করে প্রিয়নাথের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

তারপর কান্নাভেজা গলায় বলল: আরতো কেউ আসে না। তুমি এসেছ কেন, প্রিয় ঠাকুরপো?

প্রিয় বলল: আপনাকে দেখতে এলাম।

রাণী বেশ কষ্ট করে বলল: আমার মধ্যে দেখবার মত আর কিছু নেই। আর এসো না। তোমাদের দেখলে বাঁচতে সাধ হয়।

: আপনি কি মৃত্যু চেয়েছিলেন, রাণী-বৌদি?

রাণী তাড়াতাড়ি প্রিয়নাথের একখানা হাত নিজের মুঠিতে শক্ত করে ধরে বলল: হ্যাঁ প্রিয় ঠাকুরপো! আমি মরতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওরা আমাকে মরতে দিল না। বেঁচে থাকতেও দেবে না, মরতেও দেবে না। তাহলে আমি কী করব প্রিয় ঠাকুরপো?—এই কথা বলে রাণী-বৌদি মুঠিতে ধরা প্রিয়নাথের হাতখানা নিজের বুকের ওপরে রেখে হু-হু করে কেঁদে উঠল।

প্রিয়নাথ নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে নীরবে রাণী-বৌদির চোখদুটি মুছিয়ে দিল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করল: আপনার কী হয়েছে?

রাণী-বৌদির কান্না থেমে গেল। মুখখানা একটু কঠিন হয়ে উঠল। বলল: দেখবে, কী হয়েছে?—এই কথা বলে নিজ দেহের শিথিল বস্ত্রের বাঁধন খুলে দিয়ে মধ্যাঙ্গ একেবারে অনাবৃত করে ফেলল। লাজলজ্জার চিহ্নমাত্র নেই। অথচ এই রাণী-বৌদিই একদিন বাথরুমের ভাঙা দরজা দিয়ে তার নিরাবণ দেহখানার

বিন্দুমাত্র যদি দেখা যায়—এই ভয়ে সাবধান বাণী ঘোষণা করেছিল—এদিকে এসো না কিন্তু প্রিয় ঠাকুরপো!

তাই বুঝি হয়। মানুষ নারীকে বসনে-ভূষণে সাজায়। সাজিয়ে তার প্রতি লোভ আর মোহ সৃষ্টি করে। তারপরে আবার বসনের আবরণে সেই লোভাতুর দৃষ্টিকে প্রতিহত করে। কিন্তু যেদিন দেহখানার দিকে কেউ আর ফিরে তাকায়ও না, সেদিন তার বসনের প্রয়োজন কমে যায়। পলকের জন্য প্রিয়নাথ তাকিয়ে দেখল, রাণী-বৌদির সারা তলপেটটা জুড়ে পোড়া ঘা। একেবারে উরুদেশ পর্যন্ত। সে তাড়াতাড়ি আঁচলখানা টেনে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল: কী করে হোল?

রাণী ম্লান হেসে বলল: সে কথা আগেই বলেছি।

তারপরে রাণী চোখ বুজে পড়ে থাকল। আর একটি কথা নয়। প্রিয়নাথ হাতখানা রাণী-বৌদির কপালে রেখে বলল: আমি আসি রাণী-বৌদি!

চোখ মেলে উত্তর হোল: এসো, প্রিয় ঠাকুরপো।

প্রিয়নাথ উঠে দাঁড়াল। যাবার জন্য পা বাড়িয়ে একটি কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: "গরীবের বাড়ীতে হাতীর পা"—এ কথাত বললেনা রাণী-বৌদি?

রাণীর ম্লান মুখখানাতে স্নিগ্ধ হাসি ফুটে উঠল। ছোট দাগওয়ালা সেই দাঁতটি বেরিয়ে পড়ল। সেই প্রিয়নাথের বড় প্রিয় দাঁতটি। রাণী বলল: কতদিন তোমাকে অনুরোধ করেছি--আমাকে 'তুমি' বলতে। তুমি রাজি হওনি। আজ তোমার মুখে 'তুমি' শুনে বড় আনন্দ হচ্ছে। তুমি বয়সে আমার চেয়ে একটু ছোট। আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার মঙ্গল হোক।

প্রিয়নাথ আর স্থির থাকতে পারল না। চাদরটি সরিয়ে নিজের কপালটি রাণী-বৌদির পায়ের ওপরে রাখল। সে মুখ আর তুলতে পারে না। চোখের কোল বেয়ে দরদর করে জল নেমে এসে রাণী-বৌদির পা দুখানা ভিজে যেতে লাগল।

*　　　*　　　*

বড়ই বিষণ্ণ মন নিয়ে ধীর পায়ে প্রিয়নাথ যখন একেবারে গেটের কাছে চলে এসেছে, তখন সেই স্ত্রীলোকটি আবার এসে উপস্থিত। সে বলল: আপনাকে ডাকছেন।

রাণী বৌদি ডাকছেন মনে করে প্রিয়নাথ যেই উপরের দিকে উঠতে যাবে, তখন স্ত্রীলোকটি বলল: ওদিকে নয়। এদিকে আসুন।

প্রিয়নাথ বিস্মিত হয়ে সেইদিকে এগিয়ে যেতেই একজন মহিলাকে দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মুখে একটা কথা নেই।

চারুশীলা বলল: অমন করে তাকিয়ে থাকলে কেন? এসো।

প্রিয়নাথের পায়ের তলায় তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভূমিকম্পে দুলতে আরম্ভ করেছে। অতি সাবধানে পা বাড়িয়ে একেবারে চারুশীলার মুখোমুখি দাঁড়াল। কিন্তু মুখে একটাও কথা নেই।

চারু মৃদু হেসে বলল: আমি ভূত নই, মানুষ। আমি তোমার সেই চারু।

স্বপ্নের মধ্যে কথা বলার মত প্রিয়নাথ ফিসফিস করে বলল: তুমি আমার সেই চারু, এখানে কী করে এলে?

চারুশীলা তাড়াতাড়ি প্রিয়নাথের হাত দুখানা ধরে ভেতরে নিয়ে নিজের বিছানায় বসাল। তারপরে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল: তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে—এমন আশা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। তোমার আফিসে গিয়ে জেনেছিলাম—তুমি এলাহাবাদে চলে গিয়েছ। বড়কর্তা ঠাকুর দেবতা বিশ্বাস করতেন না। আমাকেও বিশ্বাস করতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু আমি দিনরাত বলেছি, ঠাকুর! প্রিয়দার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দাও। তা তিনি মুখ তুলে চেয়েছেন।

প্রিয় জিজ্ঞাসা করল: তুমি এখানে কী করে এলে?

: নন্দবাবুদের আফিসে থিয়েটার টিয়েটার করতাম। তার থেকেই পরিচয়। তিনিই আমাকে এই চাকরিটা দিয়েছেন।

: এটা তোমার কিসের চাকরি ?

: শুধু তোমারাই বুঝি চাকরি করতে পার ? আমরা পারি না মনে কর ?

: এমন কথা আমি মনে করতে যাব কেন ? কিসের চাকরি, তাই জিজ্ঞাসা করেছি।

: বাড়ীর কাজকর্ম করি—এই আর কি। ভদ্রলোকের পাড়ায় তো রক্ষিতা রাখবার রীতি নেই! তাই ঝি পরিচয়ে থাকতে হয়।

প্রিয় অবাক বিস্ময়ে চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। জিজ্ঞাসা করল : তুমি বর্মা দেশে যাও নি ?

: না, আমার যাওয়া হোল না। আমি গেলে, দেনা শোধ করবে কে ? আমি এখানে থেকে অম্বিকাবাবুর বর্মা যাবার দেনা শোধ করতে থাকলাম। তা মলয় কড়ায়-গণ্ডায় তার পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে তবে আমাকে মুক্তি দিয়েছে।

এই কথা বলতে বলতে চারুর মুখখানা বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। সে বলল : ঋণ শোধের এত ফন্দীও মলয়ের জানা ছিল—তা আগে বুঝতে পারি নি।

প্রিয় বলল : তোমার দিদির সন্ধান পেয়েছ ?

: না, পাইনি।

: অম্বিকাদার ?

: পেয়েছি—তিনি বেঁচে নেই। জাপানী বোমাতে তিনি শেষ হয়েছেন। সে কথাও এই কিছুদিন আগে মাত্র জানতে পেরেছি।

প্রিয়নাথ চারুকে বেশ ভাল করে দেখল। তার হাতে শাঁখা নেই আর সিঁথিতে সিঁদুর নেই। সে বুঝল— অম্বিকাদার সঙ্গে সঙ্গে তার শাঁখা-সিঁদুর ঘুচেছে। বড়কর্তা একদিন বলেছিলেন, মলয় সেন ছাড়াও চারুর শাঁখা-সিঁদুরের অন্যত্র কিছু একটা বন্ধন আছে।

প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করল : তোমার শাঁখা খুলে ফেলেছ, সিঁদুর

মুছে ফেলেছ। কিন্তু কেন? চারু খিলখিল করে হেসে উঠে বলল: রক্ষিতার আবার শাঁখা-সিঁদুর থাকে নাকি? কী ঘেন্নার কথা! লোকে বলবে কী?

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল: তুমি বুঝি ভাবছ—যখন আমার শাঁখা-সিঁদুর ছিল, তখন আমি কার কুলবধূ ছিলাম?

: সেতো বলেছিলে—বড়কর্তার সখ।

: মিথ্যে কথা বলেছিলাম। বড়কর্তা ওসবের ধার ধারতেন না। সত্যি কথা শুনবে?

: সে সত্যি ইতিহাস শুনে কী হবে?

: তোমার না হলেও আমার হবে। শোন—তারপর চারু দীর্ঘ ইতিহাস বলেছিল।

পেগুতে থাকতে চারুর রূপহীনা দিদির কিছুতেই বিয়ে হয় না। দিদির বিয়ে না হলে তারও বিয়ে হবে না—এই আশঙ্কায় চারু অস্থির হয়ে পড়েছিল। এদিকে নিজের রূপ নিয়ে সে পাগল হয়ে উঠল। এমন সময়ে তার বাবার ব্যবসার অংশীদারের ছেলে হঠাৎ পেগুতে গিয়ে হাজির। তার নাম মলয় সেন। সে নিজে ব্রাহ্মণের মেয়ে। মলয় সেন ভিন্ন সম্প্রদায়। নিষিদ্ধ প্রেমের একমাত্র পথ—পলায়ন। তাই করে তারা কলকাতায় চলে এলো। ত্যজ্যপুত্র হবার ভয়ে মলয় তাকে নিজের বাড়ীতে তুলল না। গড়পার রোডের একটা ভাড়া বাড়ীতে রাখল। কিছুদিনের মধ্যেই সেই ভাড়া বাড়ীতে মলয় সেনের যাতায়াত অনিয়মিত হতে হতে একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। পাশেই একটা মেস বাড়ী ছিল। চারু কৌশল করে একদিন সেই মেসবাড়ী থেকে এক ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এলো। সেই ভদ্রলোকের নাম—অম্বিকাচরণ গোস্বামী। নিতান্ত ভালমানুষ অম্বিকাবাবু খোঁজখবর করে মলয় সেনের সন্ধান পেলেন না। তারপরে একদিন তিনি চারুকে কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে শাস্ত্রমতে বিয়ে করে শাঁখা-সিঁদুর পরিয়ে দিলেন। তিনি চারুকে নিয়ে

বিষ্ণুপুরের কাছে একটা গাঁয়ে দেশের বাড়ীতে গেলেন। যাবার আগে চারু দুইজনের একটা ফটো তুলে নিয়েছিল। বিয়ের দলিল হিসেবেই ফটোখানি তুলেছিল। কিছুদিন সেই গ্রামে থেকে চারুর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। সে অম্বিকাবাবুকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারে, কিছুটা ভালও বাসতে পারে। কিন্তু দাম্পত্য-জীবনের সাধ-আনন্দ অম্বিকাবাবুর কাছে প্রত্যাশা করে না। একজন দরিদ্র আধবুড়ো লোকের স্ত্রী হয়ে ভাঙা ঘরে বসে লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়বার জন্য এতরূপ নিয়ে সে সংসারে আসে নি। একদিন গভীর রাতে বারান্দায় শোওয়া চৌধুরীর ঘুম ভাঙিয়ে দুজনে পথে নামল। তারপরে অনেক খোঁজাখুঁজি করে মলয় সেনের সন্ধান পেয়ে তার সংসারে ঢুকে পড়েছিল।

এই পর্যন্ত শুনে প্রিয়নাথ বলল : এর পরের ইতিহাস আমি জানি।

তারপরে খুব গম্ভীর হয়ে চারু বলল : তোমার ওপরে সব দাবী আমি ছেড়েছিলাম, প্রিয়দা। আমার দিদির বন্ধন থেকেও তোমাকে আজ মুক্তি দিলাম। আমার দিদি নেই। আমার মা-বাবাও নেই। তারা সব জাপানী বোমায় শেষ হয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রিয় জিজ্ঞাসা করল : নন্দদা কোথায় ?

সে কথার উত্তর না দিয়ে চারু জিজ্ঞাসা করল : উনি তোমার দাদা ?

: দূর সম্পর্কের।

তারপরে চারু বলল : হলামই বা রক্ষিতা। সব দাবী ছেড়ে দিয়েও একটা সম্পর্ক তাহলে এখনও থাকল। সেই দাবী নিয়েই তোমাকে একটা অনুরোধ করব। আমার কাছে ছোট একখানা ফটো আছে। সেই ফটোখানা তুমি এনলার্জ করে বাঁধিয়ে দেবে ?

: আমি তো দু'একদিনের মধ্যেই এলাহাবাদে চলে যাচ্ছি।

: তবে আর কী করবে ?

চারুশীলার বিষণ্ণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথের মমতা হোল। সে বলল : তা দাও না-হয় ফটোখানা।

চারুর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে ট্রাঙ্ক খুলে ছোট্ট একখানা ফটো নিয়ে এসে প্রিয়নাথের হাতে দিল। ফটোখানি অনেকদিন আগে তোলা। প্রায় ধূসর বর্ণ। প্রিয়নাথ সকলকেই চিনতে পারল।

পরিচিত কয়েকটি মুখ দেখে ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে শুকনো পাতার মত প্রিয়নাথের মনটা ঘুরপাক খেতে লাগল। সমস্ত ভূত ভবিষ্যত বর্তমান একাকার হয়ে গেল। ফটোতে সত্যনারায়ণ চৌধুরী আর অরুন্ধতী দেবী চেয়ারে বসে আছেন। একদিকে সতী অন্যদিকে চারুশীলা দাঁড়িয়ে। নাট্যাচার্য অম্বিকার মুখ থেকে শুনেছিলেন যে, চারুশীলার নামই সাবিত্রী।

প্রিয় স্তব্ধ বিস্ময়ে চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার মনে পড়ল, মঞ্চের ওপরে মেহের উন্নিসারূপী চারুশীলাকে দেখে সতী তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। প্রিয় সেদিন কত কথা ভেবেছিল। কে জানত—দুই বোন সেদিন মুখোমুখি হয়েছিল। প্রায় কাছাকাছি।

প্রিয়নাথ নির্বাক হয়ে চারুর মুখের দিকে তাকিয়েই থাকল।

চারু জিজ্ঞাসা করল : অমন করে মুখের দিকে চেয়ে আছ কেন ?

প্রিয়নাথ কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে বলল : দেখছি—তোমার কতরূপ!

রূপের কথায় মুগ্ধ হবার দিন চারুর আর নেই। সে বলল : এখনও সেই রূপের কথা! একদিন রূপ ছিল। সেই রূপের আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয়েছি। এরপরে একদিন ছাই হয়ে যাব।

নির্বাক প্রিয়নাথ চারুর মুখের দিকে তাকিয়েই থাকল। চারু ঠোঁটের কোণে কেমন যেন একটা মর্মান্তিক হাসির রেখা টেনে এনে বলল : তুমি তোমার সেই দূর দেশেই চলে যাও, প্রিয়দা! আমার সেই ছাই হয়ে যাওয়া তুমি না-হয় না-ই দেখলে!

একটা যন্ত্রের মত প্রিয়নাথ ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

—: সমাপ্ত :—